পূজাবার্ষিকী ১৪১৯

আনন্দলোক



গ্ল্যামারাস অষ্টমী

অষ্টমীর জন্য মৌনীর পছন্দ এই সিল্ক শাড়িটি। এর প্রিন্টে রয়েছে নীল, কমলা এবং মরচে রংয়ের জিওমেট্রিকাল ও ফ্লোরাল মোটিফের অদ্ভুত কম্বিনেশন! শাড়ির উপরে পরেছেন মরচে লাল রংয়ের লং, ফুলস্লিভ কোটটি। কোটের এমব্রয়ডারিতেও নীল-কমলার ছোঁয়া আছে। চুল সফ্‌ট কার্লস করে খোলা, সঙ্গে অক্সিডাইজ়ড সিলভারের একটি পেনডেন্ট মাঙ্গটিকা করে...মৌনী সত্যিই ট্র্যাডিশনাল, কিন্তু মর্ডান।





শাড়ি: আনন্দ
লং কোট: সৌমিত্র মণ্ডল
মডেল: মৌনী রায়
ফোটো: অম্লান দত্ত

এক্সপেরিমেন্টাল নবমী



নবমীর জন্য স্কার্ট বর্ডারের পোচমপল্লী স্টাইলের ইক্কত শাড়িটি পছন্দ করেছেন মৌনী। এবার তাঁর এক্সপেরিমেন্ট শাড়ির ড্রেপিং নিয়ে। অফ হোয়াইট জমির শাড়িটির পাড় জুড়ে মেরুন, সবুজ এবং গোল্ডেন ইয়েলো রংয়ের মাখামাখি। পাড়টিকে আরও ফুটিয়ে তুলতে শাড়িটিকে একটু খাটো করে পরেছেন তিনি। আঁচলটি ধরেছেন একেবারেই অন্যরকম করে। মেরুন সিল্কের স্লিভলেস ব্লাউজ, কালো সোয়েডের হাই খোলা চুল হাওয়ায় উড়ছে... সাহসিনী তো একেই বলে!



শাড়ি: আনন্দ
ব্লাউজ: দেবশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়
ইয়াররিং: নারায়ণ সিন্‌হা
মডেল: মৌনী রায়
ফোটো: অম্লান দত্ত

গর্জাস নবমী



শাড়ি এবং লহঙ্গার জমাটি কম্বিনেশন, এটাই নবমীর জন্য মুগ্ধার সাজ! পার্পল ক্রেপ বেনারসিটি তিনি পরেছেন অফ হোয়াইট লিনেন লহঙ্গা-চোলির সঙ্গে। সারা শাড়িটি জুড়ে বেজ় এবং অলিভ গ্রিনের ফ্লোরাল মোটিফ, ভারী কাজের আঁচল। লহঙ্গাটিতে কপার সিকুইন এবং তামাটে সুতোর কাজ। মুগ্ধার বিনুনিতে শোলার ফুল! গলায়-হাতে মুক্তো-সোনার মিশেলে ভারী কাজের গয়না। এই সাজকে সনাতনী বলবেন, নাকি আধুনিক, সে ভার আপনার!

শাড়ি: আনন্দ
লহঙ্গা-চোলি: সৌমিত্র মণ্ডল
গয়না: শ্রী গণেশ জুয়েলার্স নরিম্যান পয়েন্ট, মুম্বই
মডেল: মুগ্ধা গডসে
ফোটো: অম্লান দত্ত



বোল্ড দশমী

স্ট্রাইকিং রেড পাড় এবং অফ হোয়াইট জমির ইক্কত শাড়িটি দশমীর জন্য মৌনীর পছন্দ। সারা শাড়িটি জুড়ে লাল, সবুজ ও চকোলেট ব্রাউন লিফ অ্যান্ড ট্রি মোটিফ। সঙ্গে কালো লিনেন ফুলস্লিভ জ্যাকেট। মানানসই হেভি নেকলেস। পায়ে ব্ল্যাক পিপ টো হাই হিল। শাড়ির সঙ্গে তাল মিলিয়ে মৌনীর ঠোঁটেও স্ট্রাইকিং রেডের ছোঁয়া!



শাড়ি: আনন্দ
মডেল: মৌনী রায়
জুয়েলারি: ইমেজেস অ্যান্ড স্টাইল, গড়িয়াহাট
ফোটো: অম্লান দত্ত



অলংকরণ: দেবাশিস দেব

উপন্যাস

অপারেশন সিংহদুয়ার

প্রচেত গুপ্ত

সুদর্শন জোয়ারদারের অবাক লাগছে। এরকম একটা ভুল পরিকল্পনা তিনি কীভাবে করলেন! দ্বৈপায়নকে বলার সময় তিনি কি অন্যমনস্ক ছিলেন? সম্ভবত তাই। নইলে এই ভুল তাকে মানায় না।

যে কোনও ব্যস্ত ও সফল মানুষের জীবনে পরিকল্পনাই সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। কাজ থেকে বিশ্রাম, সবই আগাম চিন্তা-ভাবনা করা। সেখানে ছোটখাটো গোলমাল মানেই সমস্যা। এই ধরনের মানুষের হাতে টাকাপয়সা,

ক্ষমতা অঢেল থাকে, সময় থাকে সব চেয়ে কম। পরিকল্পনায় গোলমালের মানে, সময় নিয়ে টানাটানি। এঁরা সামান্য এদিক-ওদিক হলেই বিচলিত বোধ করেন। কখনও অল্প, কখনও বেশি।

খানিকক্ষণ আগে সুদর্শন জোয়ারদারের পরিকল্পনায় গোলমাল হয়েছে। মুম্বই থেকে কলকাতায় আসার ফ্লাইট লেট করছে। হিসেবমতো সামান্য হলেও সুদর্শন জোয়ারদারের বিচলিত হওয়ার কথা। অথচ তিনি স্বস্তি বোধ করছেন। কারণ, এখন তাঁর মনে হচ্ছে, পরিকল্পনাটাই ভুল হয়েছে। দ্বৈপায়নের সঙ্গে যেভাবে মিটিংটা করার কথা তিনি ভেবেছিলেন, সেটা ঠিক হয়নি। এই মিটিং গাড়িতে যেতে-যেতে করা যায় না। গাড়ির চালক অচেনা হলেও নয়।

সাধারণভাবে দমদম এয়ারপোর্টে নেমেই সুদর্শন সোজা ফ্যাক্টরিতে যান। এয়ারপোর্ট থেকে ফ্যাক্টরি পৌঁছতে সময় লাগে। দমদম থেকে বজবজ, পথ কম নয়। জ্যাম থাকলে সময় লাগে আরও বেশি। ইদানীং কলকাতায় জ্যাম কমেছে। নতুন রাস্তা, নতুন ফ্লাইওভার হয়েছে। নিউটাউন-রাজারহাটের ভিতর দিয়ে বিনা বাধায় হু হু করে অনেকটা ছোটা যায়। কাজ সেরে কলকাতায় ফিরতে রাত। নিজের ফ্ল্যাটে ফেরেন না সুদর্শন। হোটেলে ওঠেন। ফ্ল্যাট বাইপাসের ধারে বারো তলার উপর। বড় এবং খোলামেলা। অলকা আর রিয়া অনেক ঘোরাঘুরি করে পছন্দ করেছিল। অলকার পছন্দ ছিল পূর্বদিক। সকালের আলো আসে। তার ইউনিভার্সিটিতে পড়া মেয়ে বেঁকে বসে দক্ষিণের জন্য। তার দক্ষিণের বাতাস চাই। সুদর্শন মজা করে বলেছিলেন, "দুটো আলাদা ফ্ল্যাট নিলেই তো হয়। ইস্ট আর সাউথ ফেসিং। সকালে একটায় থাকবে, বিকেলে আর একটায়।" শেষ পর্যন্ত ফ্ল্যাট পাওয়া গেল। একই সঙ্গে পূর্ব এবং দক্ষিণ খোলা। সেই ফ্ল্যাট এখন বন্ধ থাকে। কলকাতায় এলেও সুদর্শনের ওখানে উঠতে ভাল লাগে না। কয়েকবার চেষ্টা করেছিলেন। রাতে ঠিকমতো ঘুম হয়নি। ঘুমটা বড় কথা নয়, অস্বস্তি হয়। মনে হয়, তার সঙ্গে অলকাও আছে। কখনও টিভি দেখছে, কখনও রান্নাঘরে গিয়ে চা তৈরি করছে, কখনও বাথরুমে স্নান করতে ঢুকে গুনগুন করে গান গাইছে। হ্যালুসিনেশন হিসেবে এই অনুভূতি খুবই অপরিণত। পুরনো জায়গায় মৃত মানুষের অস্তিত্ব অনুভব এক ধরনের ছেলেমানুষিসুলভ দুর্বলতা। মনে সামান্য জোর এনে নিজেই ঠিক করে ফেলা যায়। সুদর্শন করেননি। তিনি হোটেলে ওঠেন। অবশ্য রিয়াকে এসব বলেননি। বলেছেন, "এক-দু'দিনের জন্য সংসার চালু করার কোনও মানে হয় না। কতক্ষণই বা থাকি? ফ্যাক্টরি, অফিসে সময় কেটে যায়। তুই এলে দু'জনে মিলে থাকব।" রিয়া মেনে নিয়েছে। তবে সেও কলকাতায় এসে ফ্ল্যাটে উঠতে চায় না। পছন্দের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুদের বাড়ি ঘুরে বেড়ায়। ক'টা দিন বাবার কাছে মুম্বইতে কাটায়। তবে কিছুদিন হল, তার কলকাতার জন্য একটা অতিরিক্ত টান তৈরি হয়েছে। সুদর্শন জানেন, এটা অর্পণ নামে এক তরুণের জন্য।

বজবজ যাতায়াতের সময়ে সুদর্শনের সঙ্গে কেউ না কেউ থাকে। অ্যাকাউন্টস, মার্কেটিং বা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ম্যানেজাররা। তারা কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে জরুরি কথা সারে। যার যখন প্রয়োজন। আবার সুদর্শন নিজের ইচ্ছেমতোও ডেকে নেন। কোন ধরনের রিপোর্ট দেখতে চান, আসার আগেই খবর পাঠান। সেই মতো কাগজপত্র নিয়ে তারা এয়ারপোর্টে পৌঁছে যায়। এতে দুটো জিনিস হয়। দীর্ঘ পথ একা চলার একঘেয়েমি থাকে না। সময়টাও কাজে লাগে। দু'নম্বরটাই বেশি জরুরি।

আজও সেই পরিকল্পনা ছিল। ঠিক ছিল, দ্বৈপায়ন এয়ারপোর্টে আসবে। দ্বৈপায়ন মুখোপাধ্যায়। বুদ্ধিমান ছেলে। অল্প বয়সে কেরিয়ারে অনেকটা উন্নতি করেছে। ইস্টার্ন জোনের পুরো বাজারটা দেখছে। উন্নতির পিছনে সুদর্শন জোয়ারদার আছেন। তিনি জানেন, চেষ্টা করলে দ্বৈপায়ন অনেক দূর যাবে। সেই দ্বৈপায়নেরই আজ আসার কথা। দু'জনে একসঙ্গে বজবজ যেতে যেতে পথে কথা হবে। ফ্লাইট লেট করায় সেই পরিকল্পনা বাতিল করতে হল। করে স্বস্তি বোধ করছেন সুদর্শন। দ্বৈপায়নের সঙ্গে আজ তাঁর যে বিষয় নিয়ে কথা হবে, সেটা গাড়িতে বসে করা যায় না। গাড়িতে ড্রাইভার থাকবে। এটা আগে বোঝা উচিত ছিল। সান্তাক্রুজ এয়ারপোর্ট থেকে সুদর্শন দ্বৈপায়নকে ফোনে ধরলেন।

"দ্বৈপায়ন, আমার ফ্লাইট লেট করছে।"

দ্বৈপায়ন ব্যস্ত হয়ে বলল, "জানি স্যার, খবর নিয়েছি। আমি ঠিক সময়ে পৌঁছে যাব।"

"শোনো দ্বৈপায়ন, তোমাকে এয়ারপোর্টে আসতে হবে না। আজ আর আমি ফ্যাক্টরি যাচ্ছি না। অত দূর গেলে ফিরতে অনেক রাত হয়ে যাবে, আমি সরাসরি হোটেলে ঢুকব।"

দ্বৈপায়ন একটু থমকে বলল, "ঠিক আছে স্যার। আমি আপনার সঙ্গে হোটেল পর্যন্ত যাব।"

সুদর্শন একটু ভেবে বললেন, "না, তারও দরকার নেই। তোমাকে এয়ারপোর্টে আসতে হবে না। শুধু গাড়িটা পাঠিয়ে দাও। তুমি বরং রাতে হোটেলে এসো। আমার সঙ্গে ডিনার করবে। তখন মুখোমুখি কথা বলব। রাত হলে তোমার সমস্যা নেই তো?"

দ্বৈপায়নের বুক ধক করে উঠল, বসের সঙ্গে আজই ডিনার করতে হবে! সর্বনাশ! আজ বুবাইয়ের জন্মদিন। সে দশ বছরে পড়ল। এমনিতেই ছোটদের কাছে জন্মদিন খুব গুরুত্বপূর্ণ, তার মধ্যে দশ বছরটায় আছে বাড়তি মজা। ডবল ফিগারের শুরু বলে কথা! বিকেলে উপাসনা বাড়িতে ছোটোখাটো পার্টির ব্যবস্থা করেছে। একটু পর থেকে বুবাইয়ের স্কুল আর ফ্ল্যাটের বন্ধুরা আসতে শুরু করবে। উপাসনা চেয়েছিল, রাতে খাওয়াতে, কিন্তু সন্ধেবেলা অনেকের টিউশন রয়েছে। আজকাল বাবা-মায়েরা চট করে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার রুটিন নষ্ট করে না। সেই কারণে পার্টি বিকেলে। ফলে খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারটা বেশি কিছু করা যায়নি। মূলত স্ন্যাক্স। দ্বৈপায়ন আগেই বলে রেখেছিল, "জিএম" কলকাতায় আসছে, সুতরাং বিকেলে সে থাকতে পারবে না। তবে বাড়ি ফিরবে তাড়াতাড়ি। তারপর তিনজনে মিলে বাইরে কোথাও ডিনার করবে।

পার্টিতে বাবা থাকতে পারবে না শুনে বুবাই প্রথমটায় মনখারাপ করেছিল। দ্বৈপায়ন ছেলেকে বুঝিয়ে বলেছে,"দুঃখ করে না। আমি তো আটটার মধ্যেই ফিরে আসছি। খুব বেশি হলে সাড়ে আটটা। তারপর খেতে চলে যাব। উপরেও উঠব না। নীচে গাড়িতে বসেই তোমাদের ফোন করব। মাকে নিয়ে তুমি সঙ্গে-সঙ্গে ফ্ল্যাট থেকে নেমে আসবে। একটা কাজ করো বুবাই, তুমি মায়ের সঙ্গে কথা বলে একটা রেস্তঁরা ঠিক করে রাখ।"

বাবার কথা শুনে বুবাই খুশি হয়েছিল। উপাসনা আড়ালে গিয়ে থমথমে গলায় বলেছে, "প্লিজ়, ছেলেকে এসব বোলো না। আমাকে প্রবলেমে পড়তে হয়। গতবার একই ভাবে বাইরে ডিনারের কথা বলেছিলে। তারপর বিকেলে আমদাবাদ চলে গেলে। বুবাইয়ের কান্নাকাটি থামাতে আমাকে অনেক কসরত করতে হয়েছিল। আশা করি, ঘটনাটা তোমার মনে আছে।"

দ্বৈপায়নের অবশ্যই মনে আছে। গত বছর ব্যাপারটা সত্যি বাজে হয়েছিল। দ্বৈপায়ন বলেছিল, "হঠাৎ এমার্জেন্সি মিটিং পড়লে কী করব উপা? অফিসে তো বলা যায় না, ছেলের জন্মদিন আমি ট্যুরে যাব না।"

উপাসনা ঠান্ডা গলায় বলেছে, "এবারও এমার্জেন্সি মিটিং পড়বে। আবার তোমাকে যেতে হবে।"

দ্বৈপায়ন উপাসনার থুতনি স্পর্শ করে হেসে বলেছিল, "না, এবার যেতে হবে না। বস এবার কলকাতায় আসছে। দেখো, আমি ঠিক চলে আসব। তাছাড়া...।"

কিছু একটা বলতে গিয়ে দ্বৈপায়ন চুপ করে গিয়েছিল। উপাসনা মুখ সরিয়ে জিজ্ঞেস করেছে, "তা ছাড়া কী?"

দ্বৈপায়ন হাসি মুছে খানিকটা গম্ভীর হয়েছে।

উপাসনা বলেছে, "থামলে কেন? বলো তা ছাড়া কী?" উপাসনার গলায় কৌতূহল।

দ্বৈপায়ন গলা নামিয়ে বলেছিল, "উপাসনা, মোস্ট প্রবাবলি কলকাতায় এটাই বুবাইয়ের শেষ জন্মদিন পার্টি হচ্ছে।"

"মানে!" উপাসনা চমকে উঠেছে। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকে দ্বৈপায়নের দিকে। বলেছে, "ট্রান্সফার?"

দ্বৈপায়ন মুচকি হেসেছিল, "ঘুরে ঘুরেই তো বেড়াই। আমার আর ট্রান্সফার কী? মার্কেটিং তো আর ঘরে বসে হয় না। ফেরিওয়ালার কাজ।"

উপাসনার বিচলিত গলা, "এবার কি পাকাপাকি কলকাতা ছাড়তে হবে?"

দ্বৈপায়ন ছাড়া-ছাড়া ভাবে বলেছিল, "এখনও ফাইনাল কিছু নয়। মনে হচ্ছে, চলে যেতে হবে।"

"মুম্বই?"

"অন্য কোথাও হতে পারে। আমি সাউথ ইন্ডিয়া অপ্ট করতে পারি। চেন্নাইতে কোম্পানির নতুন ইউনিট হবে।"

"বুবাইয়ের স্কুলের কী হবে?" উপাসনা থমকে গেছে।

"চেন্নাইতে স্কুল নেই? সেখানকার ছেলেমেয়েরা পড়ে না?"

"না, তা বলিনি। এত দৌড়ঝাঁপ বুবাইয়ের পক্ষে ভাল হবে?"

"গেলে তো প্রোমোশন নিয়েই যাব।"

"এখানে প্রমোশন হয় না?"

দ্বৈপায়ন মুখ তুলে স্ত্রীর দিকে তাকিয়েছে। আবার কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেছে, চুপ করেছিল মুহূর্তখানেক। তার পর মুখ সরিয়ে বলেছে, "যেখানে দরকার হবে কোম্পানি সেখানেই নিয়ে যাবে।"

উপাসনা এগিয়ে এসে দ্বৈপায়নের গায়ে হাত রেখেছিল। গাঢ় স্বরে

বলেছে, "কোম্পানিকে বলো না, এখানে আর কয়েকটা বছর রাখতে। বাবার শরীরটা ভাল নয়। মায়েরও বয়স হয়েছে। আমি থাকলে ভরসা পায়।"

দ্বৈপায়ন অফিসের কাগজ গোছাতে গোছাতে বলেছিল, "মনে হয় না হবে।"

উপাসনা খানিকটা নাছোড়বান্দা ভঙ্গিতে বলেছে, "কেন? কোম্পানি তোমার একটা রিকোয়েস্ট শুনতে পারে না? তোমাকে তো জিএম খুব পছন্দ করে শুনেছি। কিছুই তো চাও না। আজই ওঁকে একবার বলে দেখ না। উনি তো আসছেন।"

দ্বৈপায়ন বিরক্ত গলায় বলেছিল, "উফ্ উপাসনা, যেটা বোঝো না সেটা নিয়ে কথা বলো না। এটা পছন্দ-অপছন্দের বিষয় নয়। যোগ্যতার প্রশ্ন। যোগ্যতা আছে বলেই তো প্রোমোশন নিয়ে বড় দায়িত্বে পাঠাবে। তা ছাড়া আমার যা প্রফেশন, তাতে কলকাতার বাইরে কাজ করাটাই বেটার।"

"তুমি রেগে যাচ্ছ কেন! আমি জানি, কলকাতার বাইরে গেলে তোমার ভাল, আমি বাবা-মায়ের জন্য বলছিলাম। ভাই-বোন থাকলে বলতাম না। তারা ম্যানেজ করত। এই তিন বছরে ওরা আমার উপর অনেকটা ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গিয়েছে। ডাক্তার দেখানো থেকে বাড়ির দেখাশোনা, সবই তো আমি করে দিই। এভরিথিং।"

দ্বৈপায়ন বলেছিল, "এখন এসব কথা বাদ দাও। আমি আটটার মধ্যে চলে আসছি, ম্যাক্সিমাম এইট থার্টি। তোমরা রেডি হয়ে থেকো।"

বসের সঙ্গে ডিনার মানে এই গোটা প্রোগ্রামটাই ভেস্তে গেল। শুধু ডিনার নয়, রাত পর্যন্ত থাকতে হবে। ছেলের কথাটা একবার বলবে? জন্মদিনের ব্যাপারটা? অসম্ভব। সুদর্শন জোয়ারদার এক সপ্তাহ আগে ডেট ঠিক করেছেন। তখন বুবাইয়ের জন্মদিনের কথাটা মাথায় ছিল না। তার উপর সপ্তাহটা কেটেছে পাগলের মতো। দ্বৈপায়ন মার্কেটিং-এর কাজ করে। কিন্তু এই সপ্তাহে তাকে যে কাজটা করতে হল, তার ধারে-কাছে "মার্কেটিং" ছিল না। সরাসরি জিএমের অ্যাসাইমেন্ট। সেই অ্যাসাইনমেন্টও এতটাই গোপন যে কাউকে বলতে পর্যন্ত পারেনি।

সুদর্শন জোয়ারদার টেলিফোনের ওপাশ থেকে বললেন, "কী হল? রাতে তোমার কোনও সমস্যা আছে?"

দ্বৈপায়ন তাড়াতাড়ি বলল, "না-না, কোনও সমস্যা নেই স্যার। আমি আসছি।"

সুদর্শন চাপা গলায় জানতে চাইলেন, "কাজ হয়েছে?"

"হয়েছে স্যার। এগারোজনের একটা শর্ট লিস্ট করেছি।"

"গুড।"

দ্বৈপায়ন একটু থমকে থেকে বলল, "তবু একটু কথাও ছিল স্যার।"

সুদর্শন জোয়ারদার বললন, "অবশ্যই বলব। সেই জন্যই তো তোমার সঙ্গে বসছি।"

দ্বৈপায়নের ফোন ছাড়ার মিনিটদশেকের মধ্যে এয়ারপোর্টে ঘোষণা হল, কলকাতার ফ্লাইট আরও দেড় ঘণ্টা লেট করছে। এই লেট আরও বাড়তে পারে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা যাত্রীরা অনেকক্ষণ থেকেই অধৈর্য হয়ে উঠেছিল। এবার দল বেঁধে কাউন্টারের দিকে ছুটল। সম্ভবত এয়ারলাইন্সের সঙ্গে ঝগড়া করবে। সুদর্শন জোয়ারদার শান্তভাবে কফি শপের দিকে এগোলেন। তিনি চট করে বিরক্ত হন না। তাঁর ধৈর্যও অনেক বেশি। ধৈর্য ছাড়া, টেমার লেনের আধো অন্ধকার স্যাঁতস্যাঁতে মেস বাড়িতে থাকা, একবেলা খেতে পাওয়া এক যুবক এত বড় একটা গার্মেন্টস কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার পদ পর্যন্ত উঠে আসতে পারত না। লোকে বলে, ভাগ্য, পরিশ্রম এবং সুযোগ— এই তিন নাকি সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। সুদর্শন মনে করেন না। তাঁর ধারণা, সাফল্য নামের বস্তুটিকে আসলে লড়তে হয় ধৈর্যের সঙ্গে। ধৈর্য নানা প্যাঁচে প্রতিপক্ষকে অবিরত পরাজিত করতে চায়। করেও। তবু দাঁতে দাঁত চেপে লড়তে হয়। যে পারে, সে-ই টিকে থাকে। কফি শপে ঢুকে কফির অর্ডার দিলেন সুদর্শন। দেড় ঘণ্টা অনেকটা সময়। চেক ইন না করলে অফিসে ফিরে যেতেন। কিছুটা সময় কাটিয়ে ফিরতেন। আর ভেবে লাভ নেই। এয়ারপোর্টেই অপেক্ষা করতে হবে।

কফি শেষ করে দ্বৈপায়নকে আবার ফোনে ধরলেন সুদর্শন। বললেন, "ডিনারের পরিকল্পনাও বাতিল। আজ আসারই দরকার নেই। কথা হবে কাল সকালে, ব্রেকফাস্ট করতে করতে। সেখান থেকে দু'জনে মিলে অফিস।"

টেলিফোনের ওপাশে দ্বৈপায়নের ইচ্ছে করল, লাফ দিতে। এভাবে সমস্যা কেটে যাবে সে কল্পনাও করতে পারেনি। এখনও পারছে না। উচ্ছ্বাস সামলাতে পারল না। খানিকটা ছেলেমানুষের মতো বলে বসল, "থ্যাঙ্ক ইউ স্যার, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ। আমার খুব উপকার হল। আজ আমার ছেলের জন্মদিন।"

সুদর্শন জোয়ারদার অবাক গলায় বললেন, "সে কী! আমায় আগে বলনি তো! ডেটটা আমি চেঞ্জ করতাম।"

দ্বৈপায়ন লজ্জা পেয়ে বলল, "ইটস ওকে স্যার, কাজটা জরুরি। ছেলের জন্মদিন মানে তো সারাদিনের কিছু নয়, শুধু রাতে একসঙ্গে ডিনার করব।"

সুদর্শন অস্বস্তি নিয়ে বললেন, "ছি-ছি, তোমাকে আমি আটকে দিচ্ছিলাম। খুব অন্যায় হত। তোমার ছেলে আমার উপর রেগে যেত। যাক, ছেলের বয়স কত হল? তার নাম কী?"

"সায়ন স্যার, সায়ন মুখোপাধ্যায়। ডাকনাম বুবাই। বুবাই এবার দশ বছরে পড়ল।"

দ্বৈপায়নের গলায় কৃতজ্ঞতা। সে এখনও যেন ছুটি পাওয়ার ঘটনাটা বিশ্বাস করতে পারছে না।

"সায়নকে আমার হ্যাপি বার্থডে জানাবে।"

দ্বৈপায়নের ফোন ছেড়ে এয়ারপোর্টের এক পাশে চেয়ারে বসে রইলেন সুদর্শন। আটান্ন বছর হয়ে গেল। তার মানে আটান্নটা জন্মদিন। বাবা-মায়ের সঙ্গে একটা জন্মদিনের স্মৃতিও কি তাঁর মনে পড়ছে? সেই সময় পার্টি-টার্টির চল ছিল না। থাকলেও, সেসব ছিল ধনী পরিবারের অনুষ্ঠান। সেসবের প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু সামান্য কিছু? যেমন দরিদ্র বাড়িতে হয়ে থাকে একটু পায়েস? একটু মাথায় হাত দিয়ে আদর? একটা নতুন জামা? তাও কি কখনও ঘটেছে? কই, মনে পড়ছে না তো! জন্মদিন মনে পড়া তো দূরের কথা, মায়ের মুখটাও আবছা হয়ে গেছে। মনে আছে, মায়ের একটা চশমা ছিল। কালো ফ্রেমের। ফ্রেমটায় কী যেন গোলমাল ছিল। বিচ্ছিন্নভাবে একটা চশমার ফ্রেমের কথা হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ার কারণ কি এই গোলমাল? মা খানিকক্ষণ অন্তর অন্তর চোখ থেকে চশমা খুলে ফ্রেমের ডাঁটি ঠিক করতেন। আর বিরক্ত হয়ে বলতেন "উফ্ বড্ড জ্বালায়।" ফ্রেমটা মা সারিয়ে নেননি কেন? নিশ্চয় পয়সা ছিল না। আবার এরকমও তো হতে পারে, সারানোর পরটা এখন মনে আসছে না, শুধু গোলমালটা আসছে। স্মৃতি বড় রহস্যময়। অকিঞ্চিৎকর কত কিছু সে ধরে রাখে! ভিতরে একটা ছটফটানি অনুভব করলেন সুদর্শন। মানুষটার মুখ মনে পড়ছে না, শুধু চশমাটা মনে পড়বে কেন! মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। তিনি হাতের ব্যাগ খুলে কাগজপত্র বের করলেন। চেন্নাইতে নতুন ইউনিট খোলার প্রজেক্ট। প্লেনে বসে নেড়েচেড়ে দেখবেন বলে সঙ্গে নিয়েছিলেন। রিপোর্টের পাতা উলটাতে লাগলেন। অনেক টাকার প্রজেক্ট। কোম্পানি গোটা কাজটার দায়িত্ব তার হাতে ছেড়ে দিয়েছে। সুদর্শন ভেবেছিলেন, কাজে মন দিলে ভিতরে হঠাৎ তৈরি হওয়া অশান্তিটা কমবে। কমল না। একসময় ফাইল বন্ধ করে বসে রইলেন চুপ করে সুদর্শন জোয়ারদার।

ফ্লাইটের অ্যানাউন্সমেন্ট হল এক ঘণ্টারও আগে। সেই ঘোষণা শুনে পরপর দুটো ফোন করলেন সুদর্শন। প্রথম ফোনটা বজবজের অফিসে। সন্ধের আগেই একটা ক্রিকেট ব্যাট কিনে দ্বৈপায়ন মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে হবে। কলকাতার কোনও বড় দোকানের সঙ্গে কথা বলে এখনই যেন ব্যবস্থা করা হয়। সঙ্গে একটা কার্ড যাবে। তাতে লেখা হবে— হ্যাপি বার্থ ডে টু সায়ন। পরের ফোনে সুদর্শন কথা বললেন নিচু গলায়।

ওপাশের খসখসে গলা বলল, "স্যার, আপনি কলকাতায়?"

"না, যাচ্ছি। এবার প্লেনে উঠব।"

"স্যার, ওখানেই উঠছেন তো?"

সুদর্শন বললেন, "হ্যাঁ। ওই হোটেলেই।"

খসখসে গলা একটু অপেক্ষা করে রইল। বলল, "কখন পাঠাব?"

"ন"টা থেকে সাড়ে ন"টার মধ্যে।"

পুরুষ গলা বলল, "আর একটু যদি দেরি হয়। দশটা?"

সুদর্শন বললেন, "না হলে বেটার। পারবে তো?"

"একথা বলছেন কেন? কখনও ফেল করেছি স্যার?"

সুদর্শন হাঁটতে-হাঁটতে বললেন, "না, ফেল করনি, কিন্তু ভুল করেছ, ননা। আমি তোমাকে দুটো শর্তে বেশি পেমেন্ট করি। তুমি সেটা ভাল করেই জান। গতবার তুমি শর্ত মানতে গিয়ে ভুল করেছ। মে বি ভুলটা ইচ্ছাকৃত।"

ননা ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বলল, "সরি স্যার, গতবার আমি যাকে বলেছিলাম, সে বুঝতে পারেনি। আপনাকে বড় মানুষ ভেবে ভুল পাঠিয়েছিল। বড় মানুষরা তো গরিবগুব্বো পছন্দ করে না স্যার। তাদের চকচকে শরীর, দামি পোশাক, সেন্ট ক্রিম, রঙ ঢঙ লাগে...আপনি যে উল্টোরকম, কী করে বুঝবে...যাক, আজ আমি নিজে দেখেশুনে পাঠাচ্ছি। সোনারপুরের একটা মেয়ে কাজ চাইছে। ওর সঙ্গে কথা বলছি। সেরকম হলে গাড়ি পাঠিয়ে তুলে আনব।"

সুদর্শন খানিকটা অন্যমনস্ক হলে বললেন, "দেরি কোরো না।"

ননা ফোন ছাড়ার আগে তাড়াহুড়ো করে বলল, "স্যার, আপনি হোটেলের গেটে বলে রাখবেন, বড্ড ঝামেলা করে। স্টার হোটেল তো।"

দায়িত্বটা বড়। ফলে হাতে-কলমে অনেক কাজ শিখে নিচ্ছে। বিক্রির নানা প্যাঁচপয়জার, জটিলতা কুটিলতা শিখছে। সেই পথ কখনও সোজা, কখনও এঁকেবেঁকে গিয়েছে। এই অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে খুব সাহায্য করবে। সব বড় জায়গাই কাউকে নেবার আগে পুরনো পারফরম্যান্স যাচাই করে নেয়। নিজেরা খোঁজখবরও নেয়। কিন্তু এখন যে কাজে তাকে জড়িয়ে পড়তে হচ্ছে, সেটা তো ভয়ঙ্কর!

দ্বৈপায়ন বিড়বিড় করে বলল, "ইন্সিডেন্টটা স্যার কী?"

সুদর্শন প্লেট থেকে পাকা পেঁপের একটা টুকরো তুলে মুখে দিলেন। খানিকটা নিজের মনে-মনে বললেন, "ঠিক জানি না। এখনও ভেবে উঠতে পারিনি। আগে মানুষটাকে বেছে নিই, তারপর কাজটা নিয়ে ভাবব। সব লোককে দিয়ে তো সব কাজ হবে না। মানুষটা কী পারে, দেখতে হবে। তবে সবার আগে দেখতে হবে, মূল কোম্পানির গায়ে যেন কালি না পড়ে। কেউ যেন আমাদের দিকে আঙুল না তোলে। গুড উইলের যেমন দাম অনেক, তেমন হ্যাপাও অনেক দ্বৈপায়ন!" থেমে একটু হাসলেন সুদর্শন। হাসিমুখেই বললেন, "এই অপারেশনটার নাম তুমি দিতে পারো বরং অপারেশন সিংহদুয়ার। যে দরজা পেরিয়ে আমরা আরও বড় কোনও বিজনেসে ঢুকতে পারব। কেমন হবে? ভাল না?"

দ্বৈপায়ন মাথা চুলকে বলল, "ভাল হবে স্যার, খুব ভাল হবে। কিন্তু আমরা কি আর দু'একজনের সঙ্গে আলোচনা করতে পারি?"

সুদর্শন ভুরু কুঁচকে কঠিন গলায় বলেন, "কখনওই নয়। এমডি, তুমি আর আমি ছাড়া কেউ জানবে না। তাও এমডি একটা পর্যায় পর্যন্ত জানবেন। তুমিও তাই। এইচ আর ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে বসে তুমি আমাকে আরও একটা লিস্ট করে দাও। দু'দিন সময় নাও। ঠান্ডা মাথার, অনেস্ট কর্মীদের নামের লিস্ট। লিস্টের পাশে এবারও নোট দেবে। ঠিক যেমন এখানে দিয়েছ।"

দ্বৈপায়ন বলল, "স্যার আমার একটু নার্ভাস লাগছে। এই ধরনের কাজ আমি আগে কখনও করিনি...। যদি বড় কোনও গোলমাল বেধে যায়...।"

সুদর্শন দ্বৈপায়নের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর ঠোঁটের কোনায় সামান্য হাসি এনে বললেন, "তোমার নার্ভাস হওয়াটা স্বাভাবিক। আমিও নার্ভাস। আমিও তোমার মতো এই কাজ আগে করিনি। যদি কেন? বড় গোলমাল তো হবেই। একটা এতবড় চালু ফ্যাক্টরি বন্ধ করে ব্যবসা গুটিয়ে এখান থেকে চলে যাচ্ছি, গোলমাল হবে না? কী করব বল? চুপ করে বসে থাকব? একটা ফ্যাক্টরির জন্য গোটা বিজনেসের গ্রোথ বন্ধ করে দেব? বিজনেস বাড়াতে গেলে নতুন কারখানা, নতুন অফিস, নতুন টেকনোলজি, নতুন মেশিনপত্র, নতুন মার্কেটিং পলিসি ইনট্রোডিউস করতে হয়। তেমন পুরনো কিছু-কিছু জিনিস ঝেড়েও ফেলতে হয়। পুরনো এস্টাব্লিশমেন্ট, পুরনো কনসেপ্ট ধরে রাখা যায় না। একজন এফিশিয়েন্ট ম্যানেজারের সেটাও কাজ। তুমি চিন্তা কোরো না দ্বৈপায়ন। আমি শুধু নাম পর্যন্তই তোমাকে এই ঘটনায় ইনভল্‌ভড করছি। বাকিটা আমি নিজে দেখব।"

দ্বৈপায়ন বুঝতে পারল 'বস' তার মনোভাবে বিরক্ত হয়েছেন। ভরসা হারাচ্ছেন। প্রোমোশনের আগে ম্যানেজমেন্টের ভরসা হারানো বড় বোকামি। নার্ভাস ভাবটা মুখ ফুটে বলে ফেলা ঠিক হল না। নার্ভাস তো নয়, বস এটাকে 'ভয়'ই ভাবছেন। দ্বৈপায়ন তাড়াতাড়ি সামলাতে গেল।

"স্যার আমি তা বলতে চাইনি, আসলে... আসলে সবটা তো আমি ঠিক জানি না...আমি অবশ্যই.."

সুদর্শন মাঝপথে থামিয়ে বললেন, "আমিও সবটা জানি না। শুধু জানি কাজটা ঠিক মতো হলে কোম্পানির ভাল। একটা কথা জেনে রাখ, জায়গাটা আমাদের ছাড়তেই হবে। সুতরাং সেখান থেকে যদি আমরা প্রফিট তুলে নিতে পারি সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ। তাই না? যাই হোক, তুমি আগে নামগুলো বের কর। যার ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনও গোলমাল পাকানোর স্পট নেই।"

"লিস্ট বড় হতে পারে।"

"বড়!" খানিকটা যেন কৌতুকেই কথাটা বললেন সুদর্শন।

দ্বৈপায়ন বলল, "হ্যাঁ স্যার বড়, আমি খাতাপত্র ঘেঁটে দেখেছি, এখানকার এমপ্লয়িরা বেসিক্যালি অনেস্ট। চুরি-টুরির কমপ্লেন কম। এত দিন এখানে ফ্যাক্টরি চলছে, দু'চারটে ছুট্‌ইন্সিডেন্স ছাড়া কিছু নেই। গত বছর একবার থানায় ডায়েরি করতে হয়েছিল। লোকটা সুতো আর রঙ চুরি করত। বড় কিছু নয়, তবু নিয়ম মেনে পুলিশকে জানাতে হল। পুলিশ ধরার আগেই দোষ স্বীকার করে। আমরা স্যাক করেছি।"

"ভেরি গুড। তা হলে ঠান্ডা মাথা দিয়ে শুরু করা যাক। সহজে রাগ করে না এমন কাউকে খুঁজে বের করো।"

কথা বলতে বলতে সুদর্শন আড়মোড়া ভাঙলেন। এবার উঠতে হবে। বেরনোর জন্য তৈরি হবেন। দ্বৈপায়ন অপেক্ষা করবে। এই ডিলাক্স সুইটটা সুন্দর। একদিকের দেয়ালে বড় কাচের জানলা। অনেক আলো আসে। আজ কেমন যেন মেঘলা। বৃষ্টি হবে নাকি?

দ্বৈপায়ন খানিকটা সহজ হবার ভঙ্গিতে বলল, "আপনি শুনলে খুশি হবেন স্যার, এখানে ঠান্ডা মানুষও আছে। এই তো দু'সপ্তাহ আগে একটা গোলমাল হতে গিয়েও হল না। আমি ইন্সিডেন্টালি সেদিন বেশি রাত পর্যন্ত অফিসে ছিলাম। পরদিন নর্থ বেঙ্গল যাব, তার কাগজপত্র রেডি করছিলাম। হঠাৎ শুনি বাইরে হইচই, গিয়ে দেখলাম লেবাররা জটলা করছে। আমি ইচ্ছে করেই আবার নিজের ঘরে ফিরে এলাম স্যার। আমার ইন্টারফিয়ারেন্স ঠিক হবে না, প্রোডাকশন ম্যানেজার মিস্টার আগরওয়াল নিজে ছিলেন। পরে ঘটনা শুনলাম।"

সুদর্শন জোয়ারদার নির্লিপ্তভাবে বললেন, "ও।"

সুদর্শনের নির্লিপ্ত ভঙ্গি অস্বাভাবিক কিছু নয়। যে 'গোলমাল'-এর খবর তার কাছে গল্প বলার ভঙ্গিতে আসছে, তাকে সিরিয়াস ভাবে দেখার কোনও কারণ নেই। দ্বৈপায়ন কিন্তু বলতেই থাকে। সে যে ঘটনা বলার আগ্রহে বলছে তা নয়। সে আসলে বসের সঙ্গে স্বাভাবিক হতে চাইছে। একটু আগে নিজের ভয় প্রকাশ করে ফেলে সে বিব্রত। শুধু বিব্রত নয়, চিন্তিতও। চিন্তিত প্রোমোশনের কারণে।

"শুনলাম, নাইট শিফটের সুপারভাইজার কমপ্লেন করেছিল, প্রোডাকশনে নাকি ভুল এন্ট্রি হচ্ছে। মেশিন একরকম বলছে, পোস্টিং অন্যরকম হচ্ছে। তাই নিয়ে হইচই। যতটা না রাগ, এমপ্লয়িরা তার চেয়ে বেশি অপমানিত হয়েছিল। এই ধরনের কমপ্লেন তো চুরির দিকেই হিন্ট করে। গোলমাল বাড়ত। শেষ পর্যন্ত অবশ্য আমাদের একজন স্টাফের জন্যই কিছু হয়নি। অথচ রেসপনসিবিলিটিটা তার ঘাড়েই যাচ্ছিল। তারই চেঁচামেচি করবার কথা ছিল বেশি।"

হাতের কাগজপত্র গোছাতে-গোছাতে সুদর্শন হালকা ভাবে বললেন, "গুড।"

দ্বৈপায়ন বলল, "ঘটনা শুনে মনে হয়েছিল, বয়স্ক কেউ। পরে শুনলাম, বয়স বেশি নয়। ছাব্বিশ সাতাশ হবে।"

"কার বয়স।" হঠাৎ বয়সের কথায় সুদর্শন বেশ অবাক হয়েছেন।

"যে ছেলেটি স্যার সেদিন সিচ্যুয়েশন সামলেছে।"

সুদর্শন বললেন, "সামলানো মানে? সেও কি নেতা নাকি।"

দ্বৈপায়ন হেসে ফেলল। বলল, "না, না, সেরকম কিছু নয়। আমাদের কম্পিউটার ডিভিশনের ইনচার্জ। পার্টি পলিটিক্স থেকে বহু দূরে থাকে। শুধু ইউনিয়ন কেন, কোনও ব্যাপারেই সাঁতেপাঁচে থাকে না। নিজের কাজটা শুধু মন দিয়ে করে। সেলস আর প্রোডাকশনের হিসেব নিয়ে ব্যস্ত। ও-ই নাকি এগিয়ে এসে বলেছিল, আপনারা শান্ত হোন। এন্ট্রিতে ভুল যদি কিছু হয়ে থাকে, তা হলে আমি করেছি, দায়িত্ব আমার। এই কথা শুনে উত্তেজনা কমে যায়। সবাই বেশ পছন্দ করে ছেলেটাকে। পরে অবশ্য জানা গিয়েছে, ভুলটা কারও নয়, ভুলটা মেশিনের। কোনও একটা মেশিনের মিটারে ডিফেক্ট ছিল। কম হিসেব দিচ্ছিল। সেই হিসেবই এন্ট্রির জন্য গেছে। কারও চোখে পড়েনি।"

সুদর্শন এতক্ষণ পরে ঘটনায় সামান্য আগ্রহ দেখিয়ে বললেন, "তাই নাকি! এটা তো ঠিক নয়। মিটারে ডিফেক্ট একটা সিরিয়াস নেগলিজেন্সি। উচিত নয়।"

দ্বৈপায়ন তাড়াতাড়ি বলল, "সঙ্গে-সঙ্গে মেশিন থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল স্যার। তবে ওই প্রতীক ছেলেটার একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাকগ্রাউন্ড শুনলাম স্যার।"

"প্রতীক! কীসের প্রতীক?" অবাক হলেন সুদর্শন।

দ্বৈপায়ন বলল, "এই ছেলেটির নামই স্যার প্রতীক। সেদিন ঠান্ডা মাথায় অ্যাক্ট করেছিল। সে নাকি কোনও এক লিডারের ছেলে। ট্রেড ইউনিয়ন লিডার, একসময় খুব দাপট ছিল। টাকাপয়সাও প্রচুর করেছে। সে তো করবেই। ওদের পার্টি তখন পাওয়ারে। একবার নাকি লোকটা ভোটেও জিতেছিল। ওই সময় ভোটে জেতা কী, সে তো বুঝতেই পারছেন স্যার, মাসল দিয়ে কাজ হত। তারপর লোকটা নিজেও হারল, দলও ক্ষমতা থেকে হটল।"

দ্বৈপায়ন চুপ করলে সুদর্শন চাপা গলায় বললেন, "তারপর?"

দ্বৈপায়ন খুশি হল। গল্প যতই সামান্য হোক, তার গল্পে বস কৌতূহল প্রকাশ করছে। তার মানে বিরক্তি কমছে। সে উৎসাহ নিয়ে বলল, "এখন সেই লোক নাকি রাজনীতি-টাজনিতি ছেড়ে গ্রামের বাড়িতে পড়ে থাকে। অসুস্থ। ফ্যাক্টরিতে অনেকেই বলল, প্রতীক নাকি তার বাবাকে দেখেই পার্টি পলিটিক্সের উপর বিরক্ত। ওসব থেকে দূরে থাকে।"

সুদর্শন স্থির চোখে দ্বৈপায়নের দিকে তাকিয়ে আছেন। বললেন, "লিডারের নাম কী?"

দ্বৈপায়ন থমকে গেল। এই রে! এটা তো জানা নেই। তার ঘরের পিওন খোকন একবারই গল্পের ছলে এসব বলছে। বস যে এই গল্প নিয়ে কোয়ারি করতে পারেন ভাবতেও পারেনি। সে রকম জানলে তৈরি হয়ে আসত। সুদর্শন আবার প্রশ্ন করলেন, "লিডারের নাম কী?" তার গলায় যা কখনও থাকে না, সেটাই খেয়াল করল দ্বৈপায়ন। হালকা অধৈর্য ভাব।

দ্বৈপায়ন আমতা-আমতা করে বলল, "ঠিক জানি না স্যার।"

চোখ সরিয়ে মুখে একটা হতাশার আওয়াজ করলেন সুদর্শন। বললেন, "এত সব জানলে, অথচ আসল কথাটাই বাদ দিলে?

দ্বৈপায়ন আবার ঘাবড়াল। কী বিপদ! এটাই যে 'আসল কথা' কী করে বুঝবে সে। একেবারেই গল্প করার জন্য ঘটনাটা বলছিল। এতক্ষণ মানুষটা নিস্পৃহভাবে শুনছিল, হঠাৎ এতটা আগ্রহীই বা হয়ে উঠল কেন?

সুদর্শন উঠতে উঠতে বললেন, "একটা রিপোর্ট যখন করবে, তখন ফুল প্রিপেয়ারড হয়েই করা উচিত। তাই নয় কী?"

দ্বৈপায়ন মাথা চুলকে বলল, "সরি স্যার, আমি ঠিক সিরিয়াসলি নিইনি...হঠাৎ ইনসিডেন্টটা মনে পড়ল... স্যার জেনে বলছি।"

কর্মচারীর এই কৈফিয়তে সুদর্শন জোয়ারদার যে সন্তুষ্ট হননি, তাঁর মুখ দেখেই বোঝা গেল। বললেন, "তুমি অপেক্ষা করো। আমি রেডি হয়ে আসছি। গাড়িতে যেতে যেতে চেন্নাই প্রজেক্টটা নিয়ে কথা বলব।"

সুদর্শন ভেতরের ঘরে এসে থমকে দাঁড়ালেন। ছেলেটার বাবা কে? একটা সময় তিনি বহু নেতার পিছনে দৌড়েছেন। তাঁদের কেউ? হতে পারে। শ্রমিক, কৃষক, মহিলা, ছাত্র কোনও নেতা, নেত্রীকেই বাদ দেননি। খানিকটা অন্যমনস্ক ভাবে পোশাক বদলাতে থাকেন সুদর্শন। হঠাৎই বেড সাইড টেবিলে নজর পড়ে। ওটা কী! চশমা না? হ্যাঁ চশমাই তো। জানলা থেকে আলো এসে পড়েছে কালো ফ্রেমের ওপর। মেঘের ছায়ামাখা আলো। সুদর্শন ঝুঁকে পড়ে চশমাটা তুললেন। কাল রাতে মেয়েটা ফেলে গিয়েছে। অদ্ভুত তো! চশমা ফেলে গেল কী করে? অসুবিধে হয়নি? নিশ্চয় পাওয়ার নেই। পাওয়ার কমের মানুষরাই বেশি চশমা হারায়। চোখে না দিলেও বুঝতে পারে না, চোখে নেই। নাড়াচাড়ায় চশমার বাঁ দিকে ডাঁটিটা নড়বড় করে উঠল। সত্যি সস্তারই জিনিস। খানিকটা ছেলেমানুষির কৌতূহলেই দু'হাতে চশমা তুলে গ্লাসের ভেতর দিয়ে তাকালেন সুদর্শন। একী! দুটো চোখেই তো অনেকটা করে পাওয়ার। ডানদিকে বেশি। বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। থমকে গেলেন সুদর্শন। চশমা ছাড়া মেয়েটা বাড়ি ফিরল কী করে! হোটেলের ব্যবস্থা করা বেয়ারা না হয় গেটটুকু পার করে দিয়েছে, তারপর? কত রাত ছিল তখন? এগারোটা? বারোটা? নাকি তার চেয়েও বেশি? মেয়েটার ব্যাগে আর একটা স্পেয়ার ছিল? হতে পারে। যাদের চোখে সমস্যা বেশি, তাদের পক্ষে দুটো চশমা নিয়ে ঘোরাফেরা করা আশ্চর্যের কিছু নয়। টেবিলে চশমা নামিয়ে অন্যমনস্কভাবে স্যুট পরলেন সুদর্শন। টাইয়ের ফাঁস লাগাতে গিয়ে আবার চশমাটার দিকে তাকালেন। জিনিসটা কী করবেন? ফেলে দেবেন? অবশ্যই। এত ভাবার কী আছে? ঘরের কোনায় রাখা ওয়েস্ট পেপার বক্সে রাখলেই হবে। রুম ক্লিনিং-এর সময় হোটেলের লোকেরাই নিয়ে যাবে।

বাইরে আসতেই দ্বৈপায়ন ব্যস্ত হয়ে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। হাসিমুখে বলল, "স্যার, নামটা জেনেছি।"

সুদর্শন অন্যমনস্ক ভাবে বললেন, "কার নাম?"

"স্যার, ওই যে ছেলেটা...ওর বাবার নাম...একজন অফিস স্টাফকে ফোন করেছিলাম... খোকনকে, আমাদের পিওন...পুরনো লোক...অনেক খবরাখবর রাখে...।"

বসের প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার উত্তেজনায় দ্বৈপায়ন বেশি কথা বলছে। জেনারেল ম্যানেজারকে অফিস পিওনের নাম, বয়স পর্যন্ত বলে ফেলেছে। সুদর্শন জোয়ারদারের এই মুহূর্তে এত কথা শুনতে ভাল লাগছে না। ছেলেটাকে হালকা একটা ধমক দিলে কেমন হয়? তিনি খানিকটা অবহেলা ভরেই দ্বৈপায়নের দিকে তাকালেন। দ্বৈপায়ন এক মুখ হেসে বলল, "স্যার, ওই ছেলের বাবার নাম জাহ্নবী। জাহ্নবী পত্রনবিশ। এক সময়ে বড় লিডার ছিল।"

সুদর্শন চমকে উঠে বললেন, "কী নাম বললে?"

দ্বৈপায়ন আরও উৎসাহে বলল, "জাহ্নবী পত্রনবিশ স্যার। ট্রেড ইউনিয়ন করে বেড়াত। খোকন বলল, ওই লোক নাকি লেবার খেপানোয় ওস্তাদ ছিল, বিভিন্ন কলকারখানা, অফিসে ঘুরে ঘুরে লেকচার দিত। জ্বালাময়ী ভাষণ যাকে বলে। কী আশ্চর্য দেখুন স্যার, অমন একটা হট হেডেড লোকের ছেলে কত ঠান্ডা মাথা!"

সুদর্শন হাত তুলে থামালেন। তারপর অন্যমনস্কভাবে নিচু গলায় বললেন, "তোমাকে আর লিস্ট তৈরি করতে হবে না দ্বৈপায়ন। তুমি খবর দাও, আমি আজই ওই ছেলেকে মিট করব।"

দ্বৈপায়ন হকচকিয়ে গেল। ঢোক গিলে বলল, "প্রতীক? স্যার, শুনেছি ছেলেটি খুব শান্তশিষ্ট ধরনের। ওকে দিয়ে কী গোলমাল পাকানোর কাজটা হবে?"

সুদর্শন আর পারলেন না। খানিকটা কঠিন গলায় বললেন, "এত কথা বলছ কেন? তোমাকে যা বলেছি ততটুকু করো।"

"সরি স্যার।" দ্বৈপায়ন মাথা নামাল। মনে হল নিজের গালে দুটো চড় কষাই। ইস আজ যে সে কত ভুল করছে!

"ওকে। এক মিনিট দাঁড়াও, আমি আসছি।"

বেরনোর আগে সুদর্শন জোয়ারদার একটা অদ্ভুত কাজ করলেন, বেডসাইড টেবিলের ওপর রাখা একটা ডাঁটি নড়বড়ে সস্তার চশমা যত্ন করে ড্রয়ারে ঢুকিয়ে এলেন।



কার্তিক মাসের প্রথম সপ্তাহ। এই সময় আকাশ থাকে ঝকঝকে। মাঝে মধ্যে শিরশিরে বাতাস জানান দেয়, শীত আসছে। সকালের দিকে গায়ে রোদ পড়লে আগের মতো আর খারাপ লাগে না। বরং ভালই লাগে। যদিও আজ দিন শুরু হয়েছে আকাশ মেঘলা করে। ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ নয়, পাংশুটে রঙের আস্তরণ গোটা আকাশ জুড়ে পড়ে রয়েছে। এই ধরনের মেঘ দেখে বলা যায় না, কখন বৃষ্টি নামবে। একটু পরেও হতে পারে, আবার সারাটা দিন কাটিয়ে হয়তো বেশি রাতে ঝমঝমিয়ে নামল। অকাল ঝড় বৃষ্টির এটাই মজা। আগে থেকে গতি প্রকৃতি বোঝা যায় না।

জাহ্নবী পত্রনবিশ বসে আছেন ইজিচেয়ারে। বসে আছেন না বলে শুয়ে আছেন বলাই ভাল। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, চেয়ারটা অতিরিক্ত এলানো। চেয়ারের পাশে খোলা জানলা। দুটো ভাগে জানলা খুব বড়। পুরনো বাড়িতে যেমন হয়। নীচের অংশটুকু শেষ হয়েছে প্রায় ঘরের মেঝে পর্যন্ত গিয়ে। দু'ভাগে আলাদা-আলাদা খড়খড়ি দেওয়া পাল্লা। লম্বা-লম্বা শিক। এতে বড় জানলা দিয়ে যেমন আলো-বাতাস বেশি আসে, তেমন বাইরের অনেকখানি দেখা যায়। আকাশ দেখা যায়, আবার মাটিও দেখা যায়। জাহ্নবী দেখছেন। রাস্তা, পুকুরপাড়, আমবাগান, দুরের মাঠে মেঘলা আকাশের ছায়া পড়েছে। বেশ লাগছে। মনে হচ্ছে, শুধু আকাশ দেখলে আকাশের পুরোটা দেখা হয় না। মাটিতে তার যে ছায়া পড়ে সেটাও দেখতে হয়।

কথাটা মনে হতে জাহ্নবী নিজের মনেই সামান্য হাসলেন। তিনি কি কবি হয়ে যাচ্ছেন? ভাবুক? সারাজীবন ভাবের জগৎ থেকে অনেক দূরে থেকেছেন। কাজ করেছেন শুকনো লোহালক্কড়ের মধ্যে। কারবার ছিল কারখানার শ্রমিক, মুটে মজুরদের নিয়ে। গেট মিটিং, মিছিল, ঘেরাও, ধর্মঘট ছাড়া অন্য দিকে কখনও মন দেননি। তিনি কীভাবে ভাবুক হবেন। তিনি পাশ ফিরলেন। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা গণেশকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "লক্ষ্মণকে খবর দিয়েছিস?"

গণেশ নিচু গলায় বলল, "দিয়েছি।"

জাহ্নবী বললেন, "কখন আসবে বলল?"

"সময় কিছু বলেনি।"

"কী বলল?"

"বলল, যাব।"

আজ থেকে এক বছর আগে হলেও জাহ্নবী হুঙ্কার দিয়ে উঠতেন, যাব মানে। যাব মানেটা কী? এখনও আসেনি কেন! লাটের বেটা হয়ে গেছে? ভেবেছে কী হারামজাদা? জাহ্নবী পত্রনবিশ কাজকর্ম ফেলে তার জন্য হাঁ করে বসে থাকবে? আরে তোর সঙ্গে কথা বলব, এই তোর বাপ-ঠাকুর্দার ভাগ্য বেটাচ্ছেলে। আমি তাও তো এখন লোয়ার লেভেলে মেশামিশি করি। অন্যদের তো পাত্তাই পাবি না হারামজাদার দল! পার্টিতে আমার স্ট্যাচারের একজনকে দেখিনি যে, আমার মতো চাষাভুষোদের সঙ্গেও কথা বলে। জাহ্নবী আজ শান্ত গলায় বললেন, 'শুধুই যাব' বলল?"

গণেশ মাথা নাড়ল। জাহ্নবী বিশ্বাস করলেন না। গণেশের আচরণ বলছে, লক্ষ্মণ কিছু বলেছে। বেঁকাটেরা কিছু। গণেশ চেপে যাচ্ছে। মাধবের মেয়ের বিষয়টার মধ্যে ঢোকা ঠিক হয়নি। সেধে অপমান গায়ে মাখতে হবে। হঠাৎ যে কী হল! গণেশ লোকটাকে এনেছিল বলে? তা নয়। গণেশ কিছু করতে বলেনি। শুধু দেখা করবার জন্য বলেছিল, যাকে বলে 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট'। নরমে গরমে প্রায় হটিয়েও দিয়েছিলেন, হঠাৎ যে কী হল! তবে মেয়েটা স্বামীর কাছ থাকতে চায় শুনে মন নরম হয়ে গেল? তাই হবে। জাহ্নবী

জানলা দিয়ে দূরের দিকে বললেন, "লক্ষ্মণ কি আসবে গণেশ?"

গণেশ চুপ করে রইল। একটু আগে সে আধখানা সত্যি বলেছে। গণেশ 'আসবে' বলেছে ঠিকই, তবে সেই সঙ্গে খারাপ ব্যবহারও করেছে। লক্ষ্মণকে খবর দিতে সকালে তার বাড়ি গিয়েছিল গণেশ। লক্ষ্মণ তখন বাড়ির বাইরে মুখে নিমের ডাল পুরে উবু হয়ে বসে আছে। 'দাদা' ডেকেছে শুনে মুখের ডাল চিবিয়ে জড়িয়ে মাড়িয়ে বলেছিল, "কে দাদা?"

"দাদাকে চেনো না?"

মুখের ডাল বের করে সামনে পিচ করে থুতু ফেলেছিল লক্ষ্মণ। বলেছে, "চিনব না কেন? অনেক দাদাকেই চিনি। তোমার দাদাটা কে?"

মাথায় আগুন চড়ে গেলেও গণেশ নিজেকে সামলে নিয়ে ছিল। শান্ত গলায় বলেছে, "আমার দাদাকে তুমি চেন না? জাহ্নবী পত্রনবিশকে এর মধ্যে ভুলে গেলে।"

"ছি, ছি ভুলব কেন? উনি অত বড় মানুষ। ওকে ভুললে কি দিঘির পাড়ে থাকতে পারব?" ফের থুতু ফেলেছিল লক্ষ্মণ। কাঁধে রাখা গামছা দিয়ে মুখ মুছে বলেছে, "তা উনি আমায় হঠাৎ স্মরণ করলেন কীসের জন্য?"

গণেশ থমথমে গলায় বলেছে, "আমি জানি না।"

বিশ্রী মুখভঙ্গিতে হেসেছিল লক্ষ্মণ, "এটা কেমন কথা হল। গণেশ তার জাহ্নবীদাদার কথা জানবে না, তা কখনও হয়?"

গণেশ কড়া গলায় বলেছে, "ক'দিন আগে উনি তোমারও দাদা ছিলেন। ভোল পালটে সব ভুলে গেলে নাকি!"

জিভ দিয়ে 'চিক চিক' ধরনের আওয়াজ করেছিল লক্ষ্মণ। চোখ নাচিয়ে বলেছিল, "ভুলব কেন? সব মনে আছে। কেমন মনে আছে ঠিক সময় সবাই জানতে পারবে। এখন থাক ওসব কথা, বাড়ি গিয়ে তোমার দাদাকে বল, আমি যাব। কাজকর্ম খানিকটা গুছিয়ে নিয়ে যাব। দাদার তো এখন কোনও তাড়াহুড়ো নেই। সারাদিন ফাঁকাই বসে থাকে। যে কোনও সময়ে গেলেই হল। তাই না?"

কথাটা বলে ফিচ্ করে হেসেছিল লক্ষ্মণ। গণেশ দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে সামলেছে। বুঝতে পেরেছিল, লক্ষ্মণ ঝগড়ার মওকা খুঁজছে। চিমটি দিয়ে কথা বলছে। ফাঁদে পা দেওয়া যাবে না। শুধু লক্ষ্মণ নয়, সব ক্ষেত্রেই এটা মানতে হচ্ছে। জাহ্নবী পত্রনবিশ বলে রেখেছেন।

"খুব সাবধানে থাকবি গণেশ। আমার কাছে আসিস বলে, অনেকে গোলমাল করতে চাইবে। বড় কিছু করতে সাহস পাবে না, কিন্তু অপমান করতে ছাড়বে না। পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করতে যাবে। সব কিছু গায়ে মাখবি না। আমার বিশ্বাস কিছুদিনের মধ্যেই অবস্থা পাল্টাবে।"

গণেশ বলেছিল, "আমার কী হবে! আমি তো পার্টি পলিটিক্স করি না।"

"সেটাই চিন্তার। পলিটিক্স করলে কারও কাছে শেলটার পেতিস। আবার সেটাই বা পুরোপুরি ঠিক বলি কী করে? আমার তো এখন সবাই শত্রু। এতদিন যে দলের জন্য সব দিয়েছি, তারাও সরিয়ে দিল। যাই হোক, তুই সতর্ক থাকিস। খেয়াল রাখবি, ছোটখাটো বিষয় নিয়েও ওরা ঝামেলা পাকাতে পারে।"

গণেশ অবাক হয়ে বলেছিল, "ছোটখাটো বিষয় মানে।"

"ওভাবে কী আর মানে বলা যায়? একটা কিছু ছুতো পেলেই ঝামেলা করে বসবে। দোকানটা নিয়েও সাবধানে থাকিস। অবশ্য যদি করতে চায় ছুতো ওরা নিজেরাই পাকাবে। তাও সাবধান থাকা ভাল। চট করে মাথা গরম করবি না।"

সাবধানেই আছে গণেশ। যদিও দিঘির পাড়ে এখনও কেউ তাকে কিছু বলেনি। তবে গ্রামের অবস্থা ভাল নয়। যখন তখন একটা কিছু হয়ে যেতে পারে। সবথেকে মুশকিল হল, জাহ্নবী পত্রনবিশের নিজের দলের ছেলেরাও মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। লক্ষ্মণের সঙ্গে সেদিন কথা না বাড়িয়ে দোকানের পথে পা বাড়িয়েছিল গণেশ। পিছন থেকে লক্ষ্মণ ডেকেছে, "গণেশদা, এক মিনিট।"

ডাক দিয়ে লক্ষ্মণ নিজেই এগিয়ে এসেছিল কয়েক পা। জিজ্ঞেস করেছে, "গণেশদা, কপালির বাড়ি থেকে তোমার কাছে কেউ গিয়েছিল?"

বুকটা ধক করে উঠেছিল গণেশের। কপালি মানে লক্ষ্মণের বউ। মাধবদার যোগাযোগের ব্যাপারে হারামজাদাটা কি কিছু জেনেছে? মুখে নিমের ডাল নিয়ে লক্ষ্মণ স্থির চোখে তাকিয়ে আছে। মুখে ঢোকানো ডালটাও স্থির। ঢোঁক গিলে লক্ষ্মণ বলেছিল, "হ্যাঁ, ওর বাবা-মা? কেউ দেখা করেছে তোমার সঙ্গে?"

গণেশ উত্তর দিয়েছে, "কই না তো! আমার কাছে যাবে কেন?"

আরও কিছুক্ষণ স্থির চোখে তাকিয়ে ছিল লক্ষ্মণ। গণেশের ভুরু কোঁচকানো। লক্ষ্মণ নিশ্চয় কিছু আঁচ করেছে। যদিও জানবার কথা নয়। এই কারণেই মাধবদার সঙ্গে সে নিজে আসেনি। 'দাদা'র সঙ্গে দেখা হওয়ার ব্যবস্থাটুকু করে দিয়েছিল শুধু।

লক্ষ্মণ ঠোঁটের কোণে নোংরা হাসি মাখিয়ে বলেছে, "ঠিক আছে। তুমি যাও গণেশদা, তোমার আবার দোকান খুলতে দেরি হয়ে যাবে। চিন্তা কোরো না, আমি তোমার দাদার কাছে যাব।"

সেদিন খটকা নিয়ে চলে এসেছিল গণেশ। জাহ্নবী পত্রনবিশ এবার মুখ ফিরিয়ে বললেন, "তুই লুকোচ্ছিস গণেশ। সত্যি বল, ওই ছোকরা আসবে বলেছে?"

গণেশ বলল, "বলেছে, তবে...।"

গণেশ চুপ করে থাকে। জাহ্নবী বললেন, "তবে কী?"

"ভাবগতিক ভাল নয়।"

জাহ্নবী বললেন, "তোকে কিছু বলেছে? অপমান করেছে?"

গণেশ গলা নামিয়ে বলল, "সরাসরি করেনি। আপনার বেশি কিছু বলে দরকার নেই। মাধবদাকে আমি বলে দেব।"

জাহ্নবী আলতো ভাবে বললেন, "দেখাই যাক না, আগে থেকে ভেবে লাভ কী?"

গণেশ ঘর ছেড়ে যেতে-যেতে নিজের মনে বিড়বিড় করে বলল, বেটা বেইমান। এক সময় পায়ের তলায় বসে থাকতিস। এখন লেজ নাড়াস।

জাহ্নবী মুখ ঘুরিয়ে জানলা দিয়ে আবার বাইরে তাকালেন। লক্ষ্মণদের বেইমান বলে কী হবে? এরা তো এলেবেলে, পার্টির মাথাই তো বেইমানি করল। শুধু দলের ভিতরে জানাজানি হয়নি, খবরের কাগজেও বেরিয়েছে। পার্টির পক্ষ থেকে স্টেটমেন্ট দেওয়া হয়েছে, জাহ্নবী পত্রনবিশের বিরুদ্ধে তদন্ত হবে। একা নয়, সঙ্গে আরও ক'টা নাম আছে। সেগুলো ফালতু। জাহ্নবী পত্রনবিশই ওই লিস্টে আসল। ওর নামটা বলে দেওয়ার জন্যই স্টেটমেন্টটা করা হয়েছে। পাবলিকের কাছে যাতে ইমেজটা লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। এটা এক ধরনের গা বাঁচানোর কায়দা। পার্টি ভাল, ক'টা লোক খারাপ। এই খারাপ লোকগুলোর জন্যই মানুষ পার্টিকে ছেড়ে চলে গেছে। খারাপ গুলোকে তাড়িয়ে দিলেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

জাহ্নবী পত্রনবিশ মনে-মনে বললেন, "হারামজাদা, চোর ধরতে গা উজাড় হয়ে যাবে।" পা দুটো টান টান করে চোখ বুজলেন জাহ্নবী।

কল-কারখানায় রাজনীতি করার ইচ্ছে ছিল না একেবারে। ঝোঁক ছিল গাঁয়ের দিকে। তরুণ বয়সে ভেবেছিলেন, লেখাপড়া সেরে গ্রামে ফিরে আসবেন। মাঠঘাটে ঘুরে গরিব মানুষদের মধ্যে থাকবেন। পার্টি একরকম ঠেলেই তাঁকে কারখানায় পাঠাল। সেটাই ধীরে-ধীরে কেমন নেশার মতো হয়ে গেল।

বহু বছর আগের কথা। তখনও পার্টি ক্ষমতায় আসেনি। আসব আসব করছে। হাওড়ার কোন এক কারখানা থেকে লেবাররা এসে কমপ্লেন করল, ম্যানেজমেন্ট লোক ছাঁটাই করেছে। কারখানার নাম এখন আর মনে নেই, তবে মনে আছে, কারখানাটা বড় কিছু ছিল না। সাকুল্যে কুড়ি-পঁচিশজন লেবার। সেই সময় ওদিকটায় ট্রেড ইউনিয়ন দেখত চন্দন। শান্ত ধরনের ছেলে, ঝুট ঝামেলায় যেত না। কাঁধে সারাক্ষণ ঝোলা ব্যাগ। তাতে মোটা মোটা বই। ইউনিয়নের মিটিং মিছিলের ফাঁক-ফোকরে ব্যাগ থেকে বই বের করে পড়ত। তার বিশ্বাস ছিল, গোলমাল পাকানোর থেকেও বেশি দরকার মানুষকে ভিতর থেকে শিক্ষিত করা। সমস্যা হলে আলাপ আলোচনা করতে হবে। একবার না হলে বার-বার করতে হবে। চন্দন বেশ কয়েকবার সেই কারখানার মালিকদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করল। ছাঁটাই কর্মীকে ফিরিয়ে নিতে হবে। ছুটির পর গেটের সামনে একদিন মিটিং হল। ভাষণ হল। 'মানছি না মানব না' স্লোগান হল। কিন্তু কাজ হল না। উল্টে মালিকপক্ষ শুরু করল চোখ রাঙাতে। লোকাল পার্টি বুঝল, এভাবে চললে কাজের কাজ কিছু হবে না। অন্য পথ নিতে হবে। পার্টি চন্দনকে ডেকে পাঠায়। যত দূর মনে পড়ে, তার সঙ্গে কথা বলেছিল মনোজদা। মনোজ সামন্ত। মনোজদা সেই সময় জেলা পার্টিতে উঠছে। বড় কোনও পদে না থাকলেও ক্ষমতা প্রচুর। কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে, পার্টি পাওয়ারে এলে মিনিস্টার হবে। লেবার মিনিস্টার। লেবার না পেলে ট্রান্সপোর্ট। কেউ আটকাতে পারবে না। মনোজদা চন্দনকে বলেছিল, "এভাবে হবে না। কড়া কিছু করতে হবে। কড়া কিছু করলে শুধু ওই কারখানার মালিক নয়, আরও পাঁচজন সমঝে চলবে। চারপাশে যা অবস্থা তাতে আজ বাদে কাল পাওয়ারে আসছি। কেউ ঠেকাতে পারবে না। এখন থেকে যদি মালিকদের সমঝে চলা না শেখাই তাহলে ভবিষ্যতে সরকারের কাজে অসুবিধে হবে।"

চন্দন গাঁইগুঁই করতে লাগল। 'কড়া কিছু'তে সে থাকতে পারবে না। ক'দিন পরে পার্টি পাওয়ারে আসছে, পুলিশ এখন আর তেমন কিছু করতে সাহস পাবে না, করলেও সমস্যা নেই। পাওয়ারে আসার পর মামলা মোকদ্দমা সবই তুলে নেওয়া হবে—এসব জানলেও পারবে না। সে নাকি

গুণ্ডামি করতে রাজনীতিতে আসেনি।

এতদিন পরেও এই সব কথা স্পষ্ট মনে আছে জাহ্নবী পত্রনবিশের। থাকাটাই স্বাভাবিক। 'সামান্য কর্মী' থেকে 'লিডার' হওয়ার জন্মকথা ভুলে যাওয়া যায় না।

একদিন সন্ধের পর মনোজদা পার্টি অফিসে তার সঙ্গে দরজা বন্ধ করে বসলেন। সেই সময় পার্টিতে 'দরজা বন্ধ করে বসা' একটা বিরাট ব্যাপার ছিল। দরজা বন্ধ মানে তুমি পার্টির 'ভিতরের লোক'।

"ওই ফ্যাক্টরিতে তোমাকে যেতে হবে জাহ্নবী।"

জাহ্নবী অবাক হয়ে বলেছিলেন, "আমি! আমি তো... আমি তো ট্রেড ইউনিয়নের কিছু জানিই না মনোজদা।"

মনোজ সামন্তর শান্ত গলা, "এবার জানবে। সব কিছুরই প্রথম আছে।"

জাহ্নবী বলেছেন, "আমার কথা ম্যানেজমেন্ট শুনবে কেন?"

"কথা বলার দরকার কী?"

জাহ্নবী আরও অবাক হয়ে বলেছিলেন, "মানে?"

মনোজ উত্তর দিয়েছিলেন, "চন্দনরা অনেক কথা বলেছে। কথায় কিছু হয়নি। এবার কথা ছাড়া অন্য কিছু চাই। সেই অন্য কিছুর জন্য পার্টি তোমাকে স্বাধীনতা দিচ্ছে।"

জাহ্নবী আমতা-আমতা করে বলেছিলেন, "চন্দন তো এই ফ্রন্টটা দেখে। লেবারদের সমস্যা-টমস্যা বোঝে।"

মনোজ সামন্ত শান্ত গলায় বলেছেন, "এখন থেকে আর দেখবে না। জাহ্নবী, আমাদের পার্টিতে কাঁধে ব্যাগ রাখার অর্থ এবার বদলানোর সময় এসেছে। ব্যাগে আর বই রাখলে চলবে না। অন্য জিনিস রাখতে হবে। সুযোগ পেলেই সেই জিনিস ব্যবহার করতে হবে। পলিটিক্যাল সিচুয়েশন বলছে, আর কিছুদিনের মধ্যে আমরা ক্ষমতায় আসব। সেই সিচুয়েশন যাতে তাড়াতাড়ি আসে, তার জন্য সবরকম অস্থিরতা চাই। যে-অস্থিরতায় সাধারণ মানুষ সরকার, প্রশাসনের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে যাবে। সর্বক্ষণ আমাদের সেই প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে হবে। তুতুপুতু করে সেই প্রক্রিয়া চলবে না, জোর লাগবে।" কথাটা বলে মনোজদা ডান হাতে মুঠো পাকিয়েছেন। আবার বলেছেন, "তোমার মধ্যে একটা অ্যাগ্রেসিভ ব্যাপার আছে জাহ্নবী। আমরা সেটা কাজে লাগাব বলে ঠিক করেছি। যদি ঠিকমতো এই কাজটা করতে পার তা হলে...।"

সেদিন পুরো কথা শেষ করেননি মনোজদা। তবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, 'কাজ' ঠিক মতো হলে সামনের পথ মসৃণ। জাহ্নবী 'কাজ'টা পেরেছিলেন। মালিকপক্ষের চারজনকে টানা দু'রাত ঘেরাও করে রাখা হয়েছিল, বাইরের ছেলেপিলে নিয়ে জাহ্নবী ছিলেন সামনে। চন্দন কারখানার লেবারদের নিয়ে বসেছিল পিছনে, ভাড়া করে আনা শতরঞ্চির উপর। সোওয়া দু'দিনের মাথায় পুলিশ এল। ধ্বস্তাধ্বস্তি হল। জাহ্নবী পত্রনবিশের ইঙ্গিত পেয়ে ভিড়ে ঢুকে থাকা কেউ-কেউ কাঁধের ঝোলা ব্যাগ থেকে বইয়ের বদলে বোমা বের করল। সেই বোমা ফাটতেই পুলিশের লাঠি চলল বেধড়ক। মাথা ফেটে, চারটে স্টিচ নিয়ে হাসপাতালে শুয়ে রইলেন জাহ্নবী। হাতে স্যালাইনের বোতল। রটে গেল অবস্থার দ্রুত অবনতি হচ্ছে। যে-কোনও সময়ে অঘটন ঘটে যেতে পারে। রাতেই ম্যানেজমেন্ট ঘাবড়ে গিয়ে ছাঁটাই প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। ফুল মালা স্লোগানে নতুন এক 'শ্রমিক নেতা'র জন্ম হয়েছিল সেদিন। সেই নেতার নাম জাহ্নবী পত্রনবিশ। মাথায় ব্যান্ডেজ, হাতে ঝাণ্ডা নিয়ে হাসপাতাল থেকে সোজা কারখানার গেটে এলেন। কোনওদিন কলকারখানায় কাজ না করেও ফুল টাইম ট্রেড ইউনিয়ন রাজনীতিতে ঢুকে পড়লেন। শুরু হল নতুন জীবন। হাওড়া, হুগলি, দুর্গাপুর, আসানসোল ছুটে বেড়ানো শুরু হল। নিঃশ্বাস ফেলার সময় ছিল না। কোথাও গোলমাল পাকানোর থাকলেই ডাক পড়ত। "জাহ্নবীকে চাই"। পার্টির 'দাদা'রা অনেকেই সস্নেহে ডাকতেন 'ঘেরাও জাহ্নবী'। শুনতে রসিকতা মনে হলেও এই নামের মর্যাদা রক্ষা রেখেছিলেন জাহ্নবী পত্রনবিশ। ঘেরাও নামক বিশেষ ধরনের আন্দোলনে তিনি নানা ভাবে হাত পাকিয়েছিলেন। পার্টি ক্ষমতায় আসার পর, বিষয়টাকে প্রায় শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেলেন। মনে পড়লে, আজ একটু লজ্জাও করে। অ্যাকশন শুরুর আগে কর্মীদের বলতেন, "কেউ হয়তো বলবে, ঘেরাও মানে অত্যাচার, আমরা বলব চাপ। শ্রমিকদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন। লাঠি, গুলি, রক্ত, হই হট্টগোল কিচ্ছু নেই। চুপচাপ ঘরের বাইরে বসে পড়ো। চাপ এমন জায়গায় নিয়ে যেতে হবে যাতে বিনা গোলমালে কাজ হয়, দাবি মেটে। আগের জমানায় কী করেছি ভুলে যেতে হবে। এখন সরকারে বসেছি। দায়িত্ব অনেক। মারপিট দাঙ্গা-হাঙ্গামা করবার আগে দশবার ভাবতে হবে। আগে পুলিশ আমাদের বিরুদ্ধে ইচ্ছে করলেই ব্যবস্থা নিতে পারত, এখন পারবে না। তাই আমরা বেশি সতর্ক থাকব। তাই সব চেয়ে ভাল পথ হল মালিকপক্ষকে চাপ দাও। কাজ না হলে আরও চাপ। আরও চাপে না হলে মাথা খাটিয়ে আরও আরও চাপের কায়দা বের করতে হবে।"

জাহ্নবী পত্রনবিশ নিজেই মাথা খাটাতেন। 'আরও আরও চাপ'-এর কায়দা বের করেছিলেন। ঘেরাওয়ের সময় টেলিফোনের লাইন কাটা, খাওয়া-দাওয়া বন্ধ, বাথরুমে তালা, স্লোগানের সঙ্গে অশ্রাব্য গালিগালাজ। এর সঙ্গে কখনও কখনও টেবিলে উলটে, দরকারি ফাইল ছিঁড়ে 'শান্তিপূর্ণ আন্দোলন' চালানোর প্ল্যান কষতেন। পুলিশ আসত না এমন নয়, দেরি হলেও আসত। এসে দাঁড়িয়ে থাকত কারখানার বাইরে। চা সিগারেট খেত। টুল পেতে বাসি খবরের কাগজ পড়ত। সংঘর্ষ নেই, রক্তপাত নেই, বোমা নেই— ভিতরে ঢুকবে কেন? ভদ্রলোক ম্যানেজারদের পক্ষে এই 'গুণ্ডামি' সহ্য করা কঠিন হত। শরীরের সঙ্গে মানসিক ভাবেও বিপর্যস্ত হয়ে পড়তেন। হয় দু'চারটে দাবি মেনে নিতেন, নয় কিছুদিনের মধ্যেই কারখানার গেটে তালা ঝুলিয়ে পালাতেন। কাজ হারিয়ে শ্রমিক কর্মচারীদের মাথায় বাজ পড়ত। তারা ছুটে এলে জাহ্নবী শান্ত গলায় বলতেন, 'কারখানা বন্ধ তো কী হয়েছে? ঝাণ্ডা লাগিয়ে গেটের বাইরে বসে যাও। দুটো তক্তাপোশ জোগাড় করো। অন্যায়ের সঙ্গে আপস করে কাজ করার থেকে বন্ধ কারখানার গেটে বসে থাকা অনেক বড় সম্মানের। তোমাদের নিয়ে সমস্যা কী জান? তোমরা দুনিয়ার লেবার মুভমেন্ট নিয়ে কোনও পড়াশোনা করনি। আরে বাপু, শুধু মেশিন চালালে কি চলবে? পড়তে হবে, জানতে হবে। স্যাক্রিফাইসের ইতিহাস বড় দীর্ঘ হে। তোমাদের লড়াই, তোমাদের ত্যাগ অন্যদের উৎসাহ দেবে। চিন্তা কোরো না, আমি তোমাদের কারখানার গেটে বড় মিটিঙের ব্যবস্থা করব। দুজন লিডার যাবেন। পারলে, একজন মিনিস্টারকেও ম্যানেজ করব। মিনিস্টাররা তো চট করে আসতে পারবেন না, তাঁদের হাজার কাজ, হাজার ফ্যাকড়া। তাও আমি ধরে আনব। তারপর দেখব ওরা কতদিন গেটে তালা ঝুলিয়ে রাখে। পুলিশ দিয়ে খুঁজে বের করে, কোমরে দড়ি বেঁধে হিড়হিড় করে টেনে আনব।"

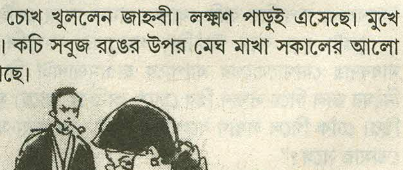
প্রতিশ্রুতি মতো তক্তাপোশ আসত, ছাউনি লাগত। সেই ছাউনির তলায় সবাই বসে যেত। সকালে বিকেলে মিটিং, দুপুরে তাস। জাহ্নবী পত্রনবিশ একদিন ঘুরে আসতেন। ব্যস, এই পর্যন্তই। একটা কারখানা নিয়ে তো দিনের পর দিন পড়ে থাকা যায় না। অন্য জায়গা থেকে ডাক পড়ত। আবার ছুটতে হত। প্রথম-প্রথম ট্রেনে বাসে যেতে হত। পরে পার্টি গাড়ি দিল। একদিনেই তিন-চারটে স্পটে যেতে হত। পরিশ্রম হত খুব। ডাক্তার মাথা নেড়ে বলেছিলেন, "বড় অসুখে পড়বেন কিন্তু, খুব বড় অসুখে পড়বেন। এই বলে রাখলাম, পরে দোষ দিতে পারবেন না। শুধু পরিশ্রম নয়, পথের ধুলো যদি টন-টন এভাবে নাকে মুখে ঢুকতে থাকে, তা হলে কী ঘটবে বুঝতে পারছেন? এক সময় দেখবেন, শরীরে আর রক্ত বলে কিছু নেই, সব ধুলো হয়ে গিয়েছে।"

জাহ্নবী হেসে বলেছিলেন, "পথে থাকি, পথের ধুলো না মাখলে চলবে কেমন করে ডাক্তার?"

ডাক্তার গম্ভীরভাবে বলেছিলেন, "আরও যাতে বেশিদিন পথে থাকতে পারেন, তার জন্য এখনই ব্যবস্থা করুন।"

বাধ্য হয়ে এসি গাড়ি নিতে হল। পথের ধুলো দূর হল, সেই সঙ্গে-সঙ্গে পথও দূর হল। হুড়মুড়িয়ে সময় কমতে লাগল। ঘেরাওয়ের সাফল্যে পার্টিতে পদোন্নতি হল খুব দ্রুত। কলকাতার অফিসে কাজের পাহাড়। একসঙ্গে গাদা খানেক ডিসপিউট এসে হাজির হত। কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে স্পটে গিয়ে মুভমেন্ট করার প্রশ্নই ওঠে না। সকালে শ্রমিক নেতাদের নিয়ে মিটিং, তারপর আসতেন মালিকরা। তাদের সঙ্গে নরমে-গরমে আলোচনা। আলোচনা সেরে লাঞ্চ। হালকা বিশ্রাম। বিকেলের পর ত্রিপাক্ষিক। দুপুরের সেই মিটিংগুলো নিয়ে আজ প্রশ্ন উঠছে। পার্টিতে তদন্ত হচ্ছে। মালিকদের সঙ্গে সেই সব আলোচনায় নাকি 'সমঝোতা' হত। দরদাম চলত। দরদাম পাকা হলে পরের মিটিংগুলো সেই পথেই চালাতেন জাহ্নবী। তবে এই অভিযোগ নতুন নয়। আগেও উঠেছে। পত্রপত্রিকায় লেখালিখিও হয়েছে। পার্টি পাত্তা দেয়নি। বলা ভাল পার্টির সেই সময়ের 'মাথা'রা পাত্তা দেয়নি।

পায়ের আওয়াজে চোখ খুললেন জাহ্নবী। লক্ষ্মণ পাত্রুই এসেছে। মুখে হাসি, হাতে দুটো লাউ। কচি সবুজ রঙের উপর মেঘ মাখা সকালের আলো পড়েছে। চমৎকার লাগছে।



"তোমার বাবা ভাল আছেন প্রতীক?"

সুদর্শন জোয়ারদার তার কালো রঙের মোটা গদির চেয়ারে হেলান দিয়ে

বসে আছেন। এই ধরনের চেয়ারের পিঠগুলো অতিরিক্ত উঁচু হয়। হেলান দেওয়ার সময় শরীরের ওপরের অংশ খানিকটা এলিয়ে পড়ে। সুদর্শন জোয়ারদারেরও পড়েছে। এই বয়সেও মানুষটার শরীরে মেদ নেই বললে চলে। এলানো শরীরটা দেখাচ্ছে টানটান। এই শরীর দেখলে অনেকের হিংসে হবে। এত কাজ, এত ছোটাছুটির পরও মানুষটা নিজেকে এরকম ফিট রেখেছেন কী করে!

সুদর্শন স্থির চোখে সামনে বসা যুবকটির মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। মনে হচ্ছে, কিছু একটা বোঝার চেষ্টা করছে। কী সেটা? উনি কি কারও সঙ্গে মিল খুঁজছেন?

সামনে বসা যুবকটি নিচু গলায় বলল, "বাবার বয়স হয়েছে, শরীরটা মাঝে-মধ্যে গোলমাল করে।"

সুদর্শন সোজা হয়ে বসলেন। বললেন, "শরীরের আর দোষ কী বল? এক সময় শরীরকে তো উনি কম কষ্ট দেননি। খাওয়া, ঘুমের ঠিক ছিল না। শরীর এখন প্রতিশোধ নিচ্ছে। শরীর রাগ পুষে রাখে।"

কথা শেষ করে সুদর্শন মুখে অল্প হাসি মাখিয়ে নিলেন। অভিনেতা আর অফিস বসেরা এই কাজটায় অভ্যস্ত। তাঁরা শূন্য থেকে হাসি, রাগ, বিরক্তি টেনে নিতে পারেন, কাজ শেষ হলে আবার শূন্যেই ছেড়ে দেন।

বহুদিন পরে বাইরের কারও মুখে বাবার নাম শুনছে প্রতীক। কী ব্যাপার? কোনও গোলমাল হয়েছে? আগে আগে মা বলত, "একটা সময় ছিল যখন রাজনীতি মানেই গোলমাল। পাড়ায়-পাড়ায় খুন-জখম লেগেই থাকত। বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ কান ফাটানো আওয়াজে বোমা ফাটত, দোকানপাট ধপাধপ বন্ধ। বাড়ির জানলা দরজা আটকে যেত। ভ্যানভর্তি পুলিশ আসত। তোর বাবা আর এর দলের লোকেরা যেমন মারও খেত তেমন আবার গোলমাল পাকানোতেও ছিল ওস্তাদ।"

বালক প্রতীক প্রবল উৎসাহে জিগ্যেস করত, "বাবা মারপিট করত? বক্সিং?"

মা হেসে বলত, "এই মারপিট সেই মারপিট নয় সোনা। এটা খুব ভয়ঙ্কর ছিল। যাক, তারপর সব পাল্টে গেল। তোর বাবার দল সরকারে এল। এখন একেবারে অন্য ব্যাপার। কথায়-কথায় পুলিশ স্যালুট ঠোকে।"

"তোমাকে স্যালুট ঠোকে?"

"ওমা! আমাকে ঠুকবে কেন রে পাগল ছেলে? আমি কি লিডার? তোমার বাবা লিডার, তাই ওকে স্যালুট ঠোকে।"

প্রতীক চোখ বড় করে বলত, "আমি লিডার হব মা!"

"আচ্ছা হবে। পরে হবে। এখন রাত হয়েছে, খাবে চলো। কাল তোমার স্কুল।"

এসব কথা অবশ্য অনেক আগের। তখনও বাবা-মায়ের ছাড়াছাড়ি হয়নি। ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর অবশ্য মা কখনও বাবাকে নিয়ে গল্প করেনি।

প্রতীক চুপ করে রইল। তার অস্বস্তি হচ্ছে। যদিও এটা নতুন নয়। জাহ্নবী পত্রনবিশের কারণে তাকে অনেকরকম অস্বস্তি সহ্য করতে হয়েছে। ভাল-মন্দ সবরকম। একটা বয়স পর্যন্ত তোষামোদের ব্যাপার ছিল। স্কুলের মাস্টারমশাইরা কখনও প্রতীককে বকাঝকা করতেন না। মারধর তো নয়ই। যদিও সে খুব বড় কোনও অন্যায় কখনও করত না, কিন্তু যেটুকু করেছে তাতেও ছাড় ছিল। খুব বেশি হলে হালকা বকুনি। সেখানেই শাস্তিপর্বের সমাপ্তি ঘটত। অথচ একই অপরাধে সহপাঠীদের কপালে কানমলা, চড় থাপ্পড় জুটেছে দেদার। তারা বলত, "আমরা জানতাম, স্যার তোকে কিছু বলবেন না। মার খাব আমরাই।"

প্রতীক বলত, "কেন? আমাকে কিছু বলবেন না কেন?"

"তোর বাবা লিডার, তাই তোকে কিছু বলবে না।"

প্রতীক রেগে গিয়ে বলত, "কেন! লিডার তো কী হয়েছে?"

বন্ধুরা বলত, "কিছু হয়নি। লিডারের ছেলেকে কানমলা দেওয়ায় বারণ। আমাদের বাবা যদি লিডার হত, আমাদেরও কান মুলতে পারত না।"

কথাটা গায়ে লাগত। বাবার 'লিডার' হওয়া এত অপমানের! সামান্য কানমলাও জুটবে না? সবার চেয়ে 'আলাদা' হয়ে থাকতে হয়!

একবার ক্লাস টেস্টের কোনও সাবজেক্টে হায়েস্ট নম্বর পেয়ে বসল প্রতীক। ভূগোল না ইতিহাস। পাশে বসা শঙ্কু নম্বর দেখে, গম্ভীর হয়ে বলেছিল, "ভালই করেছিস, তবে মনে হচ্ছে, তুই তোর বাবার জন্য ফাইভ মার্কস এক্সট্রা পেয়েছিস।"

প্রতীক অবাক হয়ে বলল, "কে বলেছে?"

শঙ্কু গম্ভীর হয়ে বলল, "কেউ বলেনি, আমি জানি। তোর বাবাকে স্যাররা ভয় পান।"

প্রতীক বলেছিল, "ভয় পাবে কেন!"

"শুনেছি, তোর বাবা নাকি খুব মারকুটে। রেগে গেলে ভাঙচুর করে। স্যাররা ভাবেন, ছেলে কম নম্বর পেলে, উনি এসে স্কুলে ভাঙচুর করবেন।"

কথা শেষ করে গাম্ভীর্য ভেঙে শঙ্কু চাপা গলায় বিশ্রী ভাবে হেসেছিল।

মনের দুঃখে সেই বেশি নম্বর পাওয়া খাতা সঙ্গে-সঙ্গে ব্যাগে লুকিয়ে ফেলেছিল প্রতীক। বাড়িতে এসে মাকে ঘটনাটা বলেছিল, মা খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বলেছিল, "একথা তোমাকে কে বলল?"

প্রতীক বলেছিল, "তুমি বল না, সত্যি বাবার জন্য কি আমি বেশি নম্বর পেয়েছি?"

মা এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে থমথমে গলায় বলেছিল, "এসব বাজে কথা কে বলেছে? তার নাম বল, আমি স্কুলে যাব। ক্লাস টিচারের সঙ্গে দেখা করব।"

নাম বলেনি প্রতীক। ওই বয়সেই বুঝেছিল, মা স্কুলে নালিশ জানালে শঙ্কুর কপালে হয়তো শাস্তি জুটবে, কিন্তু তার অপমান কমবে না। তবে একটা ভাল জিনিস ছিল, বন্ধুরা এসব প্রসঙ্গ মাথায় রাখত না বেশিক্ষণ। ভুলে যেত দ্রুত। প্রতীকও অপমান, দুঃখ ভুলে একসঙ্গে মেতে থাকত। মাঝেমধ্যে সমস্যা হত বন্ধুদের বাবা-মায়েদের খপ্পরে পড়লে। ওকে কাছে পেলে অনেকেই বাড়াবাড়ি করেছেন। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে শুরু হত আদর। বাড়িতে গেলে তো কথাই নেই। অহেতুক ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। এই চেয়ার এনে বসতে দিচ্ছে, তো এই সরবত বানিয়ে দিচ্ছে। কমলেশের মাকে মনে আছে। প্রতীক গেলেই হাত পাখা নিয়ে ছুটে আসতেন। মাথার ওপর ফ্যান চললেও পাশে দাঁড়িয়ে হাত পাখা নেড়ে যেতেন। প্রতীক বিরক্ত হত। কমলেশও রেগে যেত।

"এটা কী করছ মা? ফ্যান তো চলছে। খামোকা বাতাস করছ কেন?"

"চুপ কর তো! ওইটুকু হাওয়ায় হয় নাকি? কেমন গরম পড়েছে দেখছিস না?" তারপর প্রতীককে বলতেন, "নাও বাবা, তুমি খাটের ওপর পা তুলে বসো। লজ্জা পেও না, তুমি তো এই বাড়িরই ছেলে। একটা বালিশ দেব? হেলান দিয়ে বসবে? নাও না, লজ্জা কী? আরে বাবা, তুমি তো এই বাড়িরই ছেলে..."

পরে কমলেশ বলেছিল, "তুই আর আমাদের বাড়িতে আসিস না। মা পাগল করে দেবে।"

একবার খুব বাজে ঘটনা ঘটেছিল। সোমনাথের বাড়ি গিয়েছিল ক্যারম খেলতে। খেলা শেষ করে বেরনোর মুখে সোমনাথের ছোটকাকা সিঁড়ির তলায় খপ করে হাতটা ধরল। লোকটাকে পছন্দ করত না প্রতীক। সারাদিন চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসে পা দোলাত। সেই লোক হাত ধরতে বিরক্ত হয়েছিল।

"কী হয়েছে?"

ছোটকাকা চাপা গলায় বলেছিল, "কিছু হয়নি। একটা কাজ করে দেবে ভাইপো?"

প্রতীক হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলেছে, "কী কাজ?"

"কাউকে বলবে না বল, সমুকেও নয়?"

প্রতীক বলেছে, "তাড়াতাড়ি বল, দেরি হয়ে যাচ্ছে। এরপর মা বকবে।"

"ফাদারকে একটু বলতে হবে ভাইপো।"

প্রতীক অবাক হয়ে গেছিল, "বাবাকে! কী বলব?"

দাঁতের ফাঁকে হেসেছে লোকটা। গলার স্বর আরও নামিয়ে বলেছে, "আমার জন্য বলবে। বলবে ছোটকা বিজনেস করবে বলে লোন চেয়েছে, ব্যাঙ্কে একটা ফোন করে দিতে হবে। তুমি বললে, তোমার ফাদার ফেলতে পারবে না।"

বিজনেস, লোন, ব্যাঙ্কে বাবার ফোন— কিছুই বুঝতে পারছিল না প্রতীক। সেই বয়সে এসব বোঝবারও নয়। সে ঘাবড়ে গিয়ে বলেছিল, "কী বলছ তুমি? কিছুই বুঝতে পারছি না। না, না, আমি বাবাকে কিছু বলতে পারব না। সরো, আমাকে যেতে দাও।"

সোমনাথের ছোটকাকা পথ সরেনি। সিঁড়ির উপরটা দেখে নিয়ে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলেছে, "শ্ শ, আস্তে ভাইপো, আস্তে। ঠিক আছে, তোমাকে কিছু বলতে হবে না। বাবাকে শুধু বলবে, রবিবার সকালে আমি তোমাদের বাড়িতে যাব, উনি যেন একটু দেখা করেন। তুমি বললেই রাজি হবেন। পুত্রের কথা পিতা ফেলতে পারে না।"

প্রতীক কোনওরকমে পাশ কাটিয়েছে। যেন পালাতে পারলে বাঁচে। ছোটকাকা পথ আটকেছে ফের। মুখবন্ধ একটা খাম জোর করে পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছে। প্রতীক ভয় পেয়ে বলেছিল, "এটা কী! কী দিচ্ছ!"

"ও কিছু নয়, বাড়িতে সবাই মিলে মিষ্টি খেও।"

পকেট থেকে খাম টেনে বের করতেই একশো টাকার দুটো নোট বেরিয়ে মেঝেতে পড়ে গেছিল। কোনওরকমে পালিয়ে এসেছিল প্রতীক। বাড়িতে ফিরে মাকে জড়িয়ে হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেলেছিল। সেই বয়সে 'ঘুষ'

সম্পর্কে কোনও ধারণা ছিল না। তবু নিজেকে খুব খারাপ মনে হয়েছিল। একটা লোক কেন জোর করে টাকা দেবে? রাতে বাবা বাড়ি ফিরলে মা থমথমে গলায় বলেছিল, "তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

বাবা-মায়ের কথা কী হয়েছিল জানা নেই। দু'দিন পর থেকে সোমনাথের ছোটকাকাকে আর পাড়ায় দেখা যায়নি। সোমনাথ খেলার মাঠে শুকনো মুখে খবরটা দিয়েছিল, "ছোটকা কী করেছে কে জানে, পুলিশ থানায় ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেছে, আর কোনওদিন পাড়ায় দেখলে হাজতে পুরে রাখবে। ছোটকা পাড়া ছেড়ে পালিয়েছে।"

খারাপ অভিজ্ঞতা আরও অনেক আছে। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রতীক দেখল বাবা টেলিফোনে কাকে যেন চিৎকার করে বলছে, "দেখে নেব শুয়ারের বাচ্চা...আমার নামে মিথ্যে লেখা বের করে দেব... দেখব এই স্টেটে কী করে থাকিস...জাহ্নবী পত্রনবিশকে চিনিসনি এখনও...শালা, কারখানা তোর বাবার...মালিকের টাকা নিয়েছি বেশ করেছি..."

বাবার হাতে খবরের কাগজ। কাগজটা মাঝে মধ্যেই নিজের চোখের সামনে তুলে ধরছে আবার হুঙ্কার দিয়ে উঠছে। চোখ মুখ লাল।

প্রতীক মাকে চুপি চুপি জিগ্যেস করেছিল, "বাবা রেগে গিয়েছে কেন?"

মা কঠিন গলায় বলেছে, "খবরের কাগজে তোমার বাবার নামে মিথ্যে কথা লিখেছে, তাই রেগে গিয়েছে।"

"কী মিথ্যে লিখেছে?" প্রতীক কৌতূহলী।

"তুমি বুঝবে না।"

প্রতীক নাছোড়বান্দা, "বুঝব, তুমি বলো।"

মা থমথমে মুখে বলেছিল, "আঃ, এত কথা বলছ কেন? স্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরি হও।"

স্কুলে রওনা হওয়ার সময় প্রতীক দেখেছিল, বাবা কানে ফোন নিয়ে বসে আছে। হাতে সেই খবরের কাগজ। তবে এখন আর শুধু চিৎকার করছে না, কখনও-কখনও নিচু গলায় কথা বলছে। তার কিছুটা দরজার আড়াল থেকে শুনেছিল প্রতীক,"কে ফাঁসাল বলো তো বিশ্বনাথ? এই খবর দিল কে? আমি তো দু'জনকে সন্দেহ করছি..."

সেদিন মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারেনি প্রতীক। মা-ও তার সঙ্গে অফিসে বেরয়। গোটা পথটা মা চুপ করে ছিল। স্কুলে গিয়ে প্রতীক আঁচ করেছে, কিছু একটা ঘটেছে। ক্লাসে ঢুকেই মাস্টারমশাইরা আগে তার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে নিচ্ছেন। টিফিনের সময় শঙ্কু বলেছিল, "হ্যাঁ রে তোর বাবা নাকি কী একটা খারাপ কাজ করেছে।"

"খারাপ কাজ! কী খারাপ কাজ করেছে?"

শঙ্কু পাউরুটি চিবোতে-চিবোতে বলেছে, "সে জানি না। সকালে বড়দা বলছিল, খবরের কাগজে নাকি দিয়েছে।"

প্রতীক চমকে উঠেছিল। সকালে মা কি একথাটাই বলছিল? বাবা এই জন্য অত রেগে গিয়েছে? কানে ফোন নিয়ে বসে আছে?

"কাগজে কী দিয়েছে?"

শঙ্কু বলেছিল, "কী দিয়েছে, আমি কী করে বলব? আমি কি খবরের কাগজ পড়ি? বড়দা বলছিল, তোর বাবার সঙ্গে নাকি কার অনেক টাকার লেনদেন হয়েছে!"

প্রতীক পাথরের মতো স্থির হয়ে বসে থেকেছে। বিড়বিড় করে বলেছে, "লেনদেন মানে কী?"

শঙ্কু ছিল পেটুক ধরনের ছেলে। সামান্য পাউরুটিও সে তৃপ্তি করে খেত। সেদিনও খাচ্ছিল। বোজা চোখে বলেছে, "আমি জানি না। তবে নিশ্চয় খারাপ কিছু হবে। বড়দা যেরকম বলছিল, তাতে মনে হয় চুরি-ডাকাতি কিছু। তোর বাবার ফোটোও দিয়েছে। ফোটোটা ভাল।"

প্রতীক আর পারেনি। শঙ্কুকে ধাক্কা দিয়েছিল। চোখ বোজা অবস্থাতেই বেঞ্চের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে শঙ্কু। পাউরুটি, সন্দেশ নিয়ে তার টিফিনবক্স ছিটকে গেছে মেঝেতে। ক্লাসের বাকি ছেলেরা হইহই করে উঠেছে। শঙ্কু ততক্ষণে মাথা তুলেছিল। তার কপালের পাশ থেকে রক্ত বেরোচ্ছে। বেঞ্চের কোণে লেগে কেটে গিয়েছে। হাত দিয়ে রক্ত মুছে শঙ্কু বিড়বিড় করে বলেছিল, "চোরের ছেলে!"

শঙ্কুর মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার কারণে গার্জেন কল হল। মা অবাক। ছেলের জন্য কখনও ডাক পায়নি। কী হল! প্রতীককে জিজ্ঞেস করায় থম মেরে ছিল সে। পরদিন মা যেতে ক্লাস টিচার বললেন, "আমরা আপনাকে বিরক্ত করতে চাইনি ম্যাডাম। আপনি ব্যস্ত মানুষ। কিন্তু একটা নিয়মের মধ্যে দিয়ে তো আমাকে যেতে হয়। জানি, আপনারা একটা কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছেন। স্যারের নামে নানা ধরনের মিথ্যে প্রচার হচ্ছে। সে যাক, রাজনীতিতে আপস অ্যান্ড ডাউনস তো থাকেই। আমার শুধু একটাই রিকোয়েস্ট, প্রতীককে এইসব গোলমাল থেকে দূরে রাখুন। শান্ত ভদ্র ছেলে। মাথা গরম করে ফেলেছে। ও যা কখনও করেনি...সেদিন এক বন্ধুকে..."

যতদিন যেতে লাগল, খবরের কাগজের 'খারাপ খবর' ডালপালা মেলে ভয়ঙ্কর হতে লাগল। প্রথমে একটা কাগজে লিখেছিল, ধীরে-ধীরে অন্য কাগজগুলোও লিখতে শুরু করল। একটা ইংরেজি দৈনিক তো লিখে বসল, একটা, দুটো নয়, জাহ্নবী পত্রনবিশ গোপনে টাকার লেনদেন করেছেন এমন কোম্পানির সংখ্যা কম করে কুড়িটা। এই সব লেনদেনের জন্য বহু শ্রমিক কর্মচারী তাঁদের বেতন, বোনাস, বকেয়া পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। টাকার অনেকটাই নেতা নিজের কাছে রেখেছেন বলে অভিযোগ। বাকিটা গিয়েছে পার্টির তহবিলে। এই কারণে, অভিযোগ করলেও, পার্টি তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয় না।

খবরের কাগজ পড়ার মতো বয়স প্রতীকের তখনও হয়নি। হলেও কিছু এসে যেত না। কারণ, সেই সময়টায় মা বাড়িতে খবরের কাগজ নেওয়া বন্ধ করে দিল। ফলে ঘটনা কিছু জানার উপায় ছিল না। তবে রাস্তায় বেরলে পাড়ার চেনা লোকেই অন্যভাবে তাকাতে শুরু করল। এমন আচরণ করত যেন এই প্রথম দেখছে। নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করত, "ওই যে জাহ্নবী পত্রনবিশের ছেলে।"

মা বলত, "ওদিকে কান দিও না।"

প্রতীক অবাক হয়ে যেত, "মা, সবাই ওরকম করছে কেন?"

"কী করছে?"

"আমাকে দেখলেই কেমন যেন করছে, হাত তুলে দেখাচ্ছে। সেদিন খাতা কিনতে গিয়েছিলাম, দুটো লোক আমাকে ড্যাব-ড্যাব করে দেখছিল আর নিজেরা গলা নামিয়ে কীসব বলাবলি করছিল।"

"বলুক! তুমি তাকিও না।"

প্রতীক রাগী গলায় বলেছে, "আমি তাকাইনি। তাও বলছিল।"

মা চুলে হাত বুলিয়ে দিয়েছিল, "দেখো প্রতীক, তোমার বাবা আর পাঁচজনের মতো চাকরি-বাকরি, ব্যবসা করেন না, উনি পলিটিক্স করেন। যাঁরা পলিটিক্স করেন, তাঁদের নিয়ে ভাল-মন্দ নানারকম খবর শোনা যায়। সাধারণ মানুষের কৌতূহল হয়। তাঁকে নিয়েও যেমন হয়, তাঁর পরিবারের মানুষদের নিয়েও হয়। তোমাকে এ ব্যাপারে অভ্যস্ত হতে হবে।"

অভ্যস্ত হওয়ার সময় আর পাওয়া গেল না। এক রবিবার সকালে প্রতীকের ঘুম ভাঙল তুমুল হট্টগোলে। জানলা থেকে উঁকি মেরে দেখল, গেটের বাইরে বহু লোক জড় হয়েছে। কাঁধে পতাকা। হাতে বোর্ডের গায়ে পোস্টার সাঁটা। দুটো লোক কিম্ভুত চেহারার একটা পুতুলের মতো জিনিস মাথার উপর তুলে ধরে আছে। পুতুলটা বাঁশের গায়ে খড় পেঁচিয়ে তৈরি। মাথায় মাটির হাঁড়ি। হাঁড়ির গায়ে চুল দিয়ে আঁকা বড়-বড় চোখ, মুখ। গলায় ঝুলছে ছেঁড়া জুতোর মালা। বুকের কাছে কাগজ সাঁটা। তাতে লেখা, 'জাহ্নবী পত্রনবিশ।' লোকগুলো খুব চেঁচামেচি শুরু করল। সেই চেঁচামেচির বেশিটাই স্পষ্ট নয়। ছেঁড়া-ছেঁড়া ভাবে যেটুকু শুনতে পেল প্রতীক, তার সবটাই গালমন্দ। শঙ্কু ক্লাসের ভিতর ফিসফিস করে 'চোর,ডাকাত' বলেছিল। এরা বলছে চিৎকার করে। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে। ভিড়ের মাঝখানে সোমনাথের ছোটকাকেও দেখতে পেল প্রতীক। সব চেয়ে বেশি লাফাচ্ছে।

"চোর জাহ্নবী নিপাত যাক...ঘুষখোর জাহ্নবীর হাত ভেঙে দাও...শ্রমিকের টাকা মেরে শ্রমিক প্রেম, জাহ্নবী পত্রনবিশ শেম শেম..."

চিৎকারের মধ্যে একটা বেশ ছড়াকাটা ভাব ছিল। শুনতে খারাপ লাগছিল না। বাবার নামটা ছাড়া প্রতীক বেশ মজা পাচ্ছিল। মা এসে তাড়াতাড়ি তাকে সরিয়ে জানলা বন্ধ করে দিল। ততক্ষণে বাবা পুলিশে ফোন করেছেন। গোলমাল বাড়তে লাগল। খড়ের পুতুলটায় আগুন লাগিয়ে দিল লোকগুলো। বিকট আওয়াজ করে পটকা না বোমা ফাটল ক'টা। বাবা ঘরের ভিতর পায়চারি করছেন আর বিড়বিড় করে চলেছেন। সে বিড়বিড় অনেকটাই অসংলগ্ন। বোঝাই যাচ্ছে, গোলমাল একেবারে বাড়ির সামনে চলে আসবে, ভাবতে পারেননি। তিনি মানসিকভাবে খানিকটা বিপর্যস্ত।

"কন্সপিরেসি, কন্সপিরেসি...টাকা আমি একা নিয়েছি?...সবাই নিয়েছে...শুধু আমার বাড়ির সামনে কেন...সবার কাছে যা হারামজাদা...রাইটার্সে যা...পার্টি অফিসে যা... স্লোগান দে, এফিজি পোড়া...আমাকে একা বেকায়দায় ফেলতে চাইছিস?...কন্সপিরেসি..."

প্রতীক দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে চোখ বড়-বড় করে শুনছিল। মা এসে জোর করে ঘরের ভিতর ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। খানিকক্ষণ পরে পুলিশ এসে পৌঁছলে, গোলমাল আরও বাড়ে। পুলিশ লাঠি চালায়। জড়ো হওয়া মানুষ ইটপাটকেল, পচা ডিম ছোড়ে।

পরদিন কাগজে গোলমালের ফোটো বের হল। বাড়ির সামনে বন্দুক নিয়ে দুজন পুলিশ দাঁড়িয়ে পড়লেন পাকাপাকি ভাবে। সকালে তাঁদের জন্য বাড়ির ভিতর থেকে চা বিস্কুট গেল। বিকেলে মায়ের সঙ্গে প্রতীক চলে গেল

বড় মামার বাড়ি। ব্যাগ গোছানোর সময় সে মাকে জিজ্ঞেস করল, "আমি কি স্কুলের বই খাতা নিয়ে যাব?"

মা থমথমে গলায় বলল, "সবটা এখন নিতে হবে না। কিছুটা নিয়ে যাও। আমরা এখন ক'দিন ওখানে থাকব। তুমি ওখান থেকে স্কুল করবে।"

বড়মামা স্কুটারে স্কুল পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে আসত। মা-ও অফিসে যেত। এইভাবে কিছুদিন চলার পর এক সন্ধেবেলা অফিস থেকে ফিরে এসে মা বলল, "তুমি বড় হয়েছ, একটা জরুরি কথা তোমাকে বলতে চাই প্রতীক। এখন থেকে তোমার বাবা আর আমি আলাদা থাকব। তুমি যতদিন ছোট, ততদিন আমার কাছে থাকবে, তারপর তুমি ঠিক করবে, কার কাছে থাকলে তোমার সুবিধে বা ভাল লাগবে। আমি চাই, কলেজে ঢোকার পর তুমি এই সিদ্ধান্ত নাও। তখন নিজের ভাল মন্দ নিজেকেই বুঝতে হবে। এখন আমার কাছে না থাকলে তোমার লেখাপড়ার ক্ষতি হবে। এমনকী, ভাগাভাগি করে যদি থাক, সেটাও ঠিক হবে না। যদি জানতে চাও, কেন আমি এমন কাজ করছি তোমাকে সব বলব না। এখনই সব বোঝবার মতো বয়স তোমার হয়নি। তবে কিছুটা বলা প্রয়োজন।" এই পর্যন্ত বলে মা একটু চুপ করেছিল। সম্ভবত পরের কথাগুলো ভেবে নেওয়ার জন্য। ফের বলতে শুরু করেছিল, "তোমার বাবার সম্পর্কে যেসব কথা শোনা যাচ্ছে, সেগুলো ভাল নয়। আমি চাইছি, তুমি এসব থেকে দূরে থাক।"

সারাদিন রাজনীতিতে ব্যস্ত বাবাকে খুব কম সময়ের জন্যই পেয়েছে প্রতীক। মা-ই তার কাছে সব। সুতরাং মায়ের সঙ্গে থাকার ব্যাপারে তার দ্বিমত হওয়ার কোনও ব্যাপারই ছিল না। তাছাড়া বাবাকে জড়িয়ে তাকে যে-ধরনের অস্বস্তির মধ্যে থাকতে হত, সেটাও তার ভাল লাগছিল না মোটে। গোলমালের পর স্কুলে গিয়ে তাকে অনেক ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। এসব থেকে সে রেহাই চাইছিল।

তবে বাবার সম্পর্কে কী শোনা যাচ্ছে, সেটা ঠিকমতো বুঝতে আরও কয়েক বছর সময় লেগেছিল প্রতীকের। তার বেশিরভাগই অগৌরবের।

জেনারেল ম্যানেজার আজ ডেকে কি সেই প্রসঙ্গে কিছু বলতে চান?

সুদর্শন বললেন, "তোমার বাবাকে অবশ্য দোষ দিয়ে লাভ নেই। উনি যা করতেন, তাতে শরীরের কথা মাথায় রাখা সম্ভব ছিল না। আমার বেলাতেও একই কথা খাটে। একটা সময়ে আমাকেও রাতের পর রাত জাগতে হয়েছে। খাবার পড়ে পড়ে ঠান্ডা হয়েছে। খেতে পারিনি। খাব কখন? সময়ই পেতাম না। তখন আমার পাগলের মতো অবস্থা। তোমার বাবার মতো সেই অনিয়মের ফল আমাকেও পেতে হয় প্রতীক। ওষুধের উপর থাকি। পার্থক্য একটাই। কাজের পার্থক্য। আমি যা করেছি নিজের জন্য, আর উনি করেছেন অন্যদের জন্য।"

সুদর্শন জোয়ারদার প্রতীকের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। বোঝা যাচ্ছে, পরিস্থিতি সহজ করতে চাইছেন। কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে প্রতীক আগে কখনও মুখোমুখি কথা বলেনি। প্রয়োজন হয়নি। চাকরির ইন্টারভিউ দিতে দু'দিনের জন্য মুম্বই যেতে হয়েছিল, কিন্তু ইন্টারভিউ বোর্ডে সুদর্শন জোয়ারদার ছিলেন না। তিন বছর হতে চলল, বজবজ ইউনিটে কাজ করছে প্রতীক। কম্পিউটার ডিভিশনের ইনচার্জ। লোকজন কম। তবে অসুবিধে হয় না। প্রতীক একাই অনেক সামলায়। তার কাজ করতে ভাল লাগে। কম্পিউটার নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়ে থাকে। অনেক সময় অফিস থেকে বেরতে-বেরতে রাত হয়ে যায়। কাজ জটিল কিছু নয়। প্রোডাকশন আর সেলসের হিসেব ধরে রাখাটাই মূল দায়িত্ব। শাখা-প্রশাখাও আছে। ফ্যাক্টরি সুপারভাইজারের কাছ থেকে প্রতি শিফটে হিসেব আসে। সেলস ডিপার্টমেন্ট রিপোর্ট পাঠায় সপ্তাহের শেষে। সাজিয়ে গুছিয়ে ডেটাগুলো রেখে দেওয়া হয় কোম্পানির সফটওয়্যারে। সফটওয়্যার হিসেব করে ব্যবসার অবস্থা বলে দেয়। প্রোডাক্টের আলাদা-আলাদা কোড নম্বর ধরে খোঁজ নিলে এই মুহূর্তে বাজারে তার চাহিদা কেমন, স্টক কতটা রয়েছে, জানা যায়। চট করে দেখে নেওয়া যায়, আগের মাসের তুলনায় এমাসে ব্যবসা কি বেড়েছে? নাকি থমকে আছে? চাইলে দেশের অন্য ইউনিটগুলোর অবস্থাও জানা যায়। প্রতীক সফটওয়্যার ডেভলপ করবার চেষ্টায় আছে। পুরনো ডেটা ইনপুট হিসেবে ব্যবহার করে আগামী দিনের সম্ভাব্য প্রোজেকশন বের করা যায় না?

সুদর্শন জোয়ারদার চাইলেও পরিস্থিতি খুব সহজ হচ্ছে না। বসের সামনে তার মতো কর্মচারীর যতটা জড়সড় হয়ে বসে থাকার কথা, প্রতীক তার চেয়েও বেশি জড়সড় হয়ে বসে আছে। ভদ্রলোক জাহ্নবী পত্রনবিশের প্রসঙ্গ তোলায় এটা হয়েছে। প্রতীক অবাকও হচ্ছে। জাহ্নবী পত্রনবিশ সম্পর্কে ভদ্রলোকের উৎসাহের কারণ কী!

সুদর্শন নিজেই জবাব দিলেন। মোলায়েম ধরনের হেসে বললেন, "তোমার বাবাকে আমি একটা সময় চিনতাম। বিশেষ প্রয়োজনে আমাকে তাঁর কাছে বেশ কয়েকবার যেতে হয়েছিল, অবশ্য তার মানে এই নয় যে, তিনি আমাকে মনে রেখেছেন। রাখা সম্ভবও নয়। আমার মতো ডজন-ডজন মানুষ রোজ তার কাছে যেত। তুমি যদি ওর কাছে আমার নাম বলো, উনি চিনতে পারবেন না। অবাক হয়ে বলবেন, কোন সুদর্শন! কোন্নগরের স্কুলমাস্টার সুদর্শন? নাকি ফুড ডিপার্টমেন্টের ইন্সপেক্টর?"

কথাটা বলে সুদর্শন আওয়াজ করে হাসলেন। প্রতীকের অস্বস্তি বাড়ল। মানুষটা রসিকতাও করছেন! এটাও কি সহজ হওয়ার জন্য? নাকি অন্য কোনও কারণ? বাবাকে কীভাবে চিনতেন? পার্টি করতেন? হতে পারে। পরে হয়তো ছেড়েছুড়ে দিয়েছেন।

স্কুল শেষ করে কলেজে যাওয়ার আগের দিন মা তার ঘরে এসেছিল। মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার আগেই প্রতীকের জন্য আলাদা ঘরের ব্যবস্থা হয়েছিল। সেখানে ফার্নিচারও ঢোকানো হল। ফার্নিচার বলতে একটা টেবিল চেয়ার, বইয়ের র‍্যাক একটা। টালা পার্কের দেড় কামরার ফ্ল্যাটে এর বেশি জায়গা ছিল না। সারাদিন এই ঘরে কাটালেও, রাতে মায়ের সঙ্গে শুত প্রতীক। পরে একটা ক্যাম্প খাট ঢুকিয়ে নিল। ভাইয়ের বাড়ি থেকে নলিনী এখানে চলে আসার পর জাহ্নবী পত্রনবিশ এখনও এবাড়িতে আসেনি। নলিনী বারণ করেছিল। বলেছিল, "আমি চাই না, পাড়ার কেউ দেখুক, জাহ্নবী পত্রনবিশ এখানে আসে। এতে আমাদের অসুবিধে। ছেলেকে দেখার ইচ্ছে হলে তুমি খবর দিও, আমি নিয়ে যাব। সেরকম হলে গাড়ি পাঠিও, প্রতীক যদি চায়, দু'দিন থেকে তোমার কাছে থেকে আসবে। তবে চেষ্টা করবে খুব বেশিদিন আটকে না রাখতে। ওর লেখাপড়ার ক্ষতি হবে। একটা বয়স পর্যন্ত মাইন্ড সেট করাটা খুব কঠিন।"

জাহ্নবী স্ত্রীর কথায় আপত্তি করেননি। তিনি মনে করেছিলেন, ছাড়াছাড়ির মূল বিষয়টা যখন মেনে নিয়েছেন, তখন বাকিটাও ঠান্ডা মাথায় মেনে নেওয়া উচিত। ছেলের সঙ্গে কীভাবে দেখা হবে, তিনি নিজে যাবেন, নাকি ছেলে আসবে, এসব নিয়ে বিরোধ অর্থহীন।

মা সেদিন ঘরে এসে বলেছিল, "তোমার সঙ্গে কথা আছে। তুমি বড় হয়ে গিয়েছ। এবার কলেজে যাবে। এতদিন যা তোমাকে বলতে পারিনি, এখন সেগুলোর কিছু-কিছু তোমাকে বলার সময় এসেছে। বাকিটা তুমি নিজেই ধীরে-ধীরে জানতে পারবে। তোমার বাবার নামে টাকা পয়সা নেওয়ার যেসব অভিযোগ উঠেছিল, তার সবটা সত্যি না হলেও, অনেকটাই সত্যি বলে আমি জানি। যে জাহ্নবী পত্রনবিশকে একসময় আমি বিয়ে করেছিলাম, মানুষটা আর সেরকম নেই। নানা ধরনের অন্যায়, নানা ধরনের জুলুমের মধ্যে সে জড়িয়ে পড়েছে। এখানে শেষ নয়, তোমার বাবার রাজনীতির জন্য বহু শ্রমিক কর্মচারীর ক্ষতি হয়েছে। হচ্ছে। কারও মুখ ফুটে বলার সাহস নেই। এটা যে শুধু তোমার বাবার দোষ, এমন নয়। রাজনীতি জিনিসটাই এখন অন্যায়, গুণ্ডামির উপর দাঁড়িয়ে আছে। এতদিন যতটা পেরেছি, আমি তোমাকে আগলে রেখেছি। এখন চাই, স্বাধীনভাবে তুমি তোমার জীবন বেছে নাও। যদি মনে করো, বাবার কাছে গিয়ে থাকবে, থাকতে পার। হায়ার স্টাডির জন্য সেটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। ভাল লেখাপড়া করতে আজকাল অনেক খরচ। তোমার বাবা অনায়াসে সেই টাকা দিতে পারবেন। ইচ্ছে করলে, বিদেশে চলে যেতে পারবে। ভবিষ্যতে ভাল কাজ জোগাড় করতেও তোমার সুবিধে হবে। তোমার বাবার ইনফ্লুয়েন্স থাকবে। আর যদি তা না করে বাবার মতো রাজনীতি করতে চাও, তা-ও করতে পার। তোমার ব্যাপার। তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গেলে আমার কষ্ট হবে, কিন্তু আমি তোমাকে আটকাব না। তুমি স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নাও।"

প্রতীকের সিদ্ধান্ত নিতে সমস্যা হয়নি। সে মায়ের সঙ্গেই থেকে গিয়েছে। কলেজের পড়া শেষ করে, নিজের চেষ্টাতেই চাকরি জোগাড় করেছে। এটা তার দু'নম্বর চাকরি। আরও অফার পেতে শুরু করেছে। বেটার অফার। কিন্তু নিতে পারছে না। বাইরে গিয়ে থাকতে হবে। মা দু' বছর পর রিটায়ার করবে। তখন নেবে। মাকে নিয়ে চলে যাবে। দেয়াসিও তাই চায়। তার আর্ট কলেজ পাশ করতে কিছুদিন দেরি আছে। সে তার আগে কিছুতেই বিয়ে করতে চায় না।

সুদর্শন জোয়ারদার এতক্ষণ পর কাজের কথায় এলেন। শান্ত গলায় বললেন, "প্রতীক, আমি তোমার কাজকর্মের খবর নিয়েছি। তুমি বুদ্ধিমান ছেলে। শুধু বুদ্ধিমান নয়, কাজেরও। বুদ্ধি থাকলেই কাজ করা যায় না। কাজ একটা আলাদা বিষয়। এই যে ফাইলটা আমার টেবিলে দেখছ, এখানে তোমার সার্ভিস রেকর্ড রয়েছে। সেই রেকর্ড বলছে, তুমি আমাদের কোম্পানির একজন এফিশিয়েন্ট এমপ্লয়ি। তোমার কাজে ভুল খুব কম। তার উপর তুমি অনেস্ট।"

প্রতীক ঝকঝকে কাচের টেবিলের কোনা খুঁটতে-খুঁটতে বলল, "এটা নর্মাল স্যার।"

"অবশ্যই নর্মাল। অনেস্টি মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা। কিন্তু অনেক

সময় সুযোগ মানুষকে সেই প্রবণতা রক্ষা করতে দেয় না। সে এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করে, যখন মনে হয়, ডিজঅনেস্ট হওয়াটাই স্বাভাবিক। এই ইউনিটের যে ডেলিকেট জায়গায় তুমি কাজ করছ, সেখানে চুরি করাটা কঠিন ছিল না। ডেটার একটু এদিকওদিক করতে পারলেই হয়ে যেত। আমি যখন জানলাম, তুমি জাহ্নবী পত্রনবিশের ছেলে, তখন বুঝতে পারলাম, এটাই স্বাভাবিক। আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি, তিন বছর তুমি আমাদের সঙ্গে আছ! কিন্তু আমি এই তথ্য জানতাম না। কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে এটা আমার একটা দুর্বলতা।"

প্রতীক আমতা-আমতা করে বললে, "আমি স্যার কাউকে বলি না। এটা বলার মতো তো কিছু নয়। উনি ওঁর মতো রাজনীতি করতেন, আমি ওই জগৎ থেকে অনেক দূরে থাকি। তাছাড়া এই মুহূর্তে..."

সুদর্শন চেয়ারের হাতলে টোকা দিতে-দিতে অন্যমনস্ক গলায় বললেন, "আমি জানি, আমি জানি এই মুহূর্তে উনি রাজনীতি থেকে খানিকটা সরে নিজের গ্রাম গিয়ে আছেন। গ্রামটার নাম যেন কী?"

প্রতীক হালকা চমকালেও মুখে বুঝতে দিল না। 'বস' জাহ্নবী পত্রনবিশ সম্পর্কে হোমওয়র্ক করেই এসেছে। সে শান্ত ভাবে বলল, 'দিঘির পাড়।'

"হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়েছে, দিঘির পাড়। সুন্দর নাম। ভালই করেছেন, একটা বয়সের পর বিশ্রাম খুব জরুরি। বিশেষ করে যারা খুব খাটাখাটনি করেছেন, তাদের জন্য তো বটেই। এরপর সময় করে কলকাতায় এলে দিঘির পাড় ঘুরে আসব।"

আজ বজবজে আসবার পথেই জাহ্নবী পত্রনবিশ সম্পর্কে তিনি 'খবর' নিয়ে ফেলেছেন। কনককে ফোনে ধরেছিলেন। কনক এখনও পার্টি করে। খাটাখাটনি করলেও, কোনওদিনই বড় কিছু হতে পারেনি। নীচেই পড়ে থেকেছে। লবির জোর ছিল না। জাহ্নবী পত্রনবিশের সঙ্গে আলাপ অনেকদিনের। এখানে ব্যবসার করার সময় কিছু-কিছু যোগাযোগের খবর দিত। কাকে ধরলে কাজে সুবিধে হবে। পার্টির কে টাকা নেয়, কীভাবে টাকা নেয়, টাকা নিয়ে কাজ ফেলে রাখে কে, তখন কাকে কমপ্লেন করতে হয়, কে হাতে টাকা নেয় না, বউয়ের এনজিওতে টাকা নেয়—এইসব। সব খবর যে সবসময় ঠিক হত এমন নয়, তবে একটা ধারণা তৈরি হত। ব্যবসার ক্ষেত্রে যেটা খুব দরকার। বড় কথা হল, এই খবরাখবরের বদলে কনক কখনও কিছু চায়নি। সাহায্য নেয়নি কোনও। দিতে চাইলেও এড়িয়ে গিয়েছে। কনক যে খবর দিচ্ছে বলে খবর দিত, এমন নয়। নেতাদের উপর রাগ এবং ঘেন্না থেকে বলত। জাহ্নবী পত্রনবিশের নাম শুনে হড়বড় করে অনেকটা বলে গেল। সবটাই গালমন্দ, "এই হারামজাদাগুলোর জন্যই আজ আমাদের এই হাঁড়ির হাল। লোকে থুতু দিচ্ছে। পার্টিকেও বলিহারি দাদা। যখন এদের নামে অভিযোগ উঠত, কাগজে লেখালিখি হত, তখনও কিছু বলেনি, এখন তদন্ত করছে। লোকে বিশ্বাস করবে? পার্টিতে জাহ্নবী পত্রনবিশের নামে অন্তত দেড়শো অভিযোগ জমা আছে। বেটা এখন হাফ সাসপেন্ড হয়ে দেশের বাড়িতে গা ঢাকা দিয়েছে। যদি অভিযোগ প্রমাণ হয় তাহলেই বা কী? পার্টি তাড়ালে বয়ে যাবে। এই পার্টিতে এখন মধু নেই। ক্ষমতা নেই। এখানে থাকলেই বা কী না থাকলেই বা কী? জমানো টাকায় বসে বসে খাবে। আবার যদি গদি উল্টোয়, সুড়ুৎ করে এন্ট্রি নেবে, ফর ফর করে উপরে উঠে ছড়ি ঘোরাবে। ভাল লোকগুলো আগেও যেমন কোণঠাসা ছিল, পরেও তাই থাকবে দাদা।"

সুদর্শন জোয়ারদার জিজ্ঞেস করেছিলেন, "জাহ্নবীর ফ্যামিলি কোথায় থাকে? গ্রামে?"

ফোনের ওপর থেকে কনক বলেছে, "ফ্যামিলি আবার কী! বউ তো শুনেছি ছেলেকে নিয়ে অনেক আগেই ছেড়ে চলে গিয়েছিল। ছেলে এখন কী করে জানি না। তবে পার্টি-টার্টি করে না। করলে কানে আসত। জাহ্নবী পত্রনবিশের ছেলে বলে কথা!"

"জাহ্নবী পত্রনবিশের গ্রামের নামটা বলতে পার?"

"ঠিক বলতে পারব না, পুকুর পাড় না দিঘির পাড়, কী যেন শুনেছিলাম। যদি বলেন, খোঁজ নিতে পারে।"

"নিও।"

"কেন, যাবেন নাকি? চেনেন ওকে?"

সুদর্শন প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার কায়দায় বলেছেন, "এক সময়ে হালকা চিনতাম।"

কনক নিচু গলায় বলেছিল, "হারামজাদাকে আপনার আবার কী দরকার হল? শালার কোনও ক্ষমতা নেই। একেই তো গভর্নমেন্ট নেই, পার্টিও ওর কথা শুনবে না।"

সুদর্শন জোয়ারদার সামান্য হেসে বলেছেন, "ক্ষমতাহীন মানুষকে দিয়ে কখনও কখনও কাজ হয় কনক। দরকার হলে তোমার সঙ্গে আবার যোগাযোগ করব।"

"দাদা, একটা কথা ছিল।"

"বলে ফ্যালো।"

"বলতে বাধো-বাধো ঠেকছে। কোনওদিন তো কিছু চাইনি।"

সুদর্শন আদরের ধমক দিয়ে বলেছিলেন, "বাজে কথা রেখে বলো দেখি। টাকাপয়সা কিছু লাগবে?"

কনক ইতস্তত করে বলেছে, "না, ছেলেটার একটা চাকরি যদি...প্রাইভেট কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং করেছে, কিন্তু ভাল কাজ পাচ্ছে না। যা পাচ্ছে, পাহাড় জঙ্গলে পাঠিয়ে দিচ্ছে..."

"এখনই একটা সিভি পাঠিয়ে দাও। আমার প্রাইভেট সেক্রেটারির মেল আইডি তোমাকে মেসেজ করে দিচ্ছি।"

ফোন ছেড়ে বাকি পথটুকু চুপ করে বসেছিলেন সুদর্শন। দ্বৈপায়ন দু'একটা কথা বলতে চেষ্টা করেছিল। হু, হাঁ বলে সেগুলো এড়িয়ে গিয়েছেন। দ্বৈপায়ন তখন চুপ করে যায়। বজবজে এসে দ্বৈপায়নকে বলেছিলেন, "তুমি প্রতীক ছেলেটির সঙ্গে কথা বলো, কথা বলে দ্যাখো, ওকে চেন্নাইয়ের নতুন ইউনিটের জন্য নেওয়া উচিত হবে কিনা। যদিও আই টির জন্য আমরা ওখানেই এফিশিয়েন্ট লোক পেয়ে যাব, স্টিল আমরা যাকে বিশ্বাস করি, এমন একজন মাথায় থাকা দরকার। ডেটা নিয়ে কাজ যারা করবে তারা কোম্পানির কনফিডেন্সের হবে। এটাই কোম্পানির মূল অ্যাকাউন্টস। তুমি কথা বলো, বলে আমাকে জানাও, তারপর আমি ওর সঙ্গে বসব। আজই বসব।"

দ্বৈপায়নের খানিকটা ধাঁধার মতো লেগেছিল। ফ্যাক্টরিতে গোলমালের বদলে এসব কী পরিকল্পনা!

সুদর্শন জোয়ারদার গদি মোড়া চেয়ার সামান্য পিছনে ঠেলে শান্ত গলায় বললেন, "প্রতীক, দ্বৈপায়ন তোমার সঙ্গে কথা বলে খুশি। সে আমাকে রিপোর্ট করেছে। আমরা চাইছি, তুমি চেন্নাইয়ের নতুন ইউনিটে জয়েন করো। সেখানে আমরা ডিপার্টমেন্টটা অনেক বড় করে করব। নিজের হাতে তুমি সবটা সাজাবে। দ্বৈপায়নের কাছে শুনলাম, তোমার মাকে কলকাতায় রেখে যাওয়ার ব্যাপারে নাকি কিছু সমস্যা আছে। স্বাভাবিক। ওঁর বয়স হয়েছে, উনি কীভাবে একা থাকবেন? এক কাজ করো, তুমি বরং ওঁকে নিয়ে চল। অ্যাকোমোডেশনের বিষয়টা আমরা দেখব। আমার মনে হয়, তুমি খুব আনন্দের সঙ্গে এই অফারটা অ্যাকসেপ্ট করবে। আমরাও তোমার মতো একজন রেসপনসিবল, অনেস্ট সহকর্মী পেলে কমফর্ট ফিল করব। তুমি জান, গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি গোটা বিশ্বেই খুব ফ্লারিশ করছে। আমাদের কোম্পানি তার একটা পার্টি হতে চায়। চেন্নাইতে মূলত এক্সপোর্ট কোয়ালিটির প্রডাক্ট তৈরি হবে। মিডল ইস্টের গার্মেন্টস মার্কেটে একটা বড় গ্যাপ আছে। আমরা সেখানে ঢুকতে চাইছি। তোমাকে সেখানেও যেতে হবে," একটু থামলেন সুদর্শন। সামান্য হাসলেন।

"থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। আপনারা আমাকে এতটা রিলাই করবেন, আমি ভাবতে পারিনি।"

ধন্যবাদ গায়ে মাখলেন না সুদর্শন। বললেন, "চেন্নাইয়ের প্রজেক্টটা আমাদের ড্রিম প্রজেক্ট হবে। সুন্দর স্বপ্ন নিয়ে সব সময়েই বেশি কথা বলতে ইচ্ছে করে। তাই না?"

প্রতীক একই সঙ্গে খুব খুশি এবং হতভম্ব। সে খুব বড় একটা সুযোগ পেল। মা-ই একমাত্র সমস্যা ছিল। কোম্পানি সেটাও মেনে নিচ্ছে। দেয়াসিকে বললে সেও নিশ্চয় লাফিয়ে উঠবে। বাবার সঙ্গে সমস্যার পর থেকেই মায়ের ইচ্ছে ছিল কলকাতা থেকে চলে যাওয়ার। শুধু কলকাতা নয়, একবারে এই রাজ্যের বাইরে। চাকরির জন্য যেতে পারেনি। খানিক আগে মার্কেটিং ম্যানেজার তাকে ডেকে নতুন কাজের কথাটা বলেন, কিন্তু ফাইনাল কিছু বলেননি। এখন বোঝা যাচ্ছে, জি.এমকে দিয়ে বলাতে চেয়েছিলেন। এটাও একটা গর্বের বিষয়। কোম্পানি তাকে গুরুত্ব দিচ্ছে।

প্রতীক নিচু গলায় বলল, "স্যার, কবে ফাইনাল জানাতে হবে?"

ওঠার ভঙ্গি করতে-করতে সুদর্শন জোয়ারদার বললেন, "জানানোর কিছু নেই। তুমি নতুন ইউনিটে বড় রেসপনসিবিলিটি নিয়ে যাচ্ছ— দিস ইজ ফাইনাল। নাউ টেক ইওর টাইম। তাড়াহুড়োর কিছু নেই, সময় আছে। তবে এখন কাউকে কিছু বলবে না। এখানে তো একেবারেই নয়। আমরা সবাইকে এই সুযোগ দিতে পারব না। সবাই তো প্রতীক পত্রনবিশের মতো এফিশিয়েন্ট নয়।"

প্রতীক এতটাই খুশি যে, সবটা বিশ্বাস করতে পারছে না। খুব বেশিদিন সে এখানে কাজ করছে, এমন নয়। এর মধ্যেই 'এফিশিয়েন্ট' হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া কম কথা নয়। সে যে খুব অ্যাম্বিশাস, এমন নয়। ছেলেবেলায় বাবাকে দেখে, 'খুব বড় হওয়ার'র ইচ্ছেটা তৈরি হয়নি। উলটে 'বেশি বড় জাহ্নবী

পত্রনবিশ'কে দেখে ভয় করত। আজ ভাল লাগছে।

চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে সুদর্শন বললেন, "ও আর একটা কথা প্রতীক। দ্বৈপায়নের কাছে শুনছিলাম, তুমি নাকি কোম্পানির জন্য এমন একটা প্রোগ্রাম ইনস্টল করতে চাইছ, যেটা ফিউচার প্রজেকশন বলতে পারবে. ইজ ইট টু?"

প্রতীক লাজুক গলায় বলল, "হ্যাঁ স্যার। কাজটা খুব কঠিন নয়। সফ্‌টওয়্যারের কাজ যারা একটুআধটু জানে, তারা সকলেই পারবে। প্রোডাকশন আর সেলসের ডেটা ব্যবহার করে প্রোগ্রামটা চালু করতে হবে। আমার ধারণা, অনেকেই কাজটা করে ফেলেছে। ইউজ্‌ও করছে। আমি এক্সক্লুসিভলি আমাদের এই বজবজ ইউনিটের জন্য চেষ্টা করছি। যদি সাকসেসফুল হয় তাহলে আমরা অন্য ইউনিটেও ব্যবহার করতে পারব। কাজটা করতে পারলে আমাদের সুবিধে হতে পারে স্যার।"

সুদর্শন ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, "সেটা কীরকম?"

"এই প্রোগ্রামটা প্রোডাকশন, সেলস আর স্টকের ডেটা অ্যানালিসিস করে নিজেই বলে দেবে আগামী দিনে ইউনিটটা কোন জায়গায় পৌঁছবে। আমাদের কোথায় জোর দিতে হবে। ইয়ারলি বা হাফ ইয়ারলি যেটা আমরা নিজেরা বানাই, সেটাই রেগুলার বেসিস আমরা অটোমেটিক্যালি পেয়ে যাব।"

সুদর্শন জোয়ারদার গম্ভীরভাবে বললেন, "গুড। নতুন-নতুন ভাবনা ছাড়া বিজনেস এগোতে পারে না। এই ধরনের একটা সিস্টেম চালু করতে পারলে আমাদের পক্ষে সেটা হেল্পফুল হবে। কাজটা করতে তোমার কতদিন লাগতে পারে? তুমি যদি খানিকটা করে আমাদের দেখাতে পারো, তা হলে আমরা তোমাকে সবরকম সাহায্য করব। তোমাকে আরও লোক দিতে পারি। এই বিষয়টা নিয়ে যাঁরা কাজ করেন, তুমি তাঁদের কাছে যেতে পার। প্রয়োজন হলে বিদেশে কোর্স নিতে পার। হোয়াট এভার ইউ লাইক। আমি মুম্বই ফিরে এম ডি-কে জানাব।"

"কাজটা প্রায় করে ফেলেছি স্যার। এখন ট্রায়ালে রয়েছি।"

সুদর্শন জোয়ারদারের চোখ চকচক করে উঠল। তিনি যেন এই কথাটা শোনার জন্যই এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন।

"তাই নাকি! তোমাকে যদি একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিই, পারবে? সময় বেশি দেব না কিন্তু। পারবে?" কথাটা বলার সময় এক ধরনের চ্যালেঞ্জ করার ভঙ্গি করলেন সুদর্শন। সঙ্গে খানিকটা অবিশ্বাস।

প্রতীক শান্ত গলায় বলল "কী কাজ স্যার?"

যত সময় যাচ্ছে সুদর্শন অবাক হচ্ছেন। জাহ্নবী পত্রনবিশের মতো একজন দাপুটে, অহঙ্কারী, মারকুটে মানুষের ছেলে কী করে এত ঠান্ডা, বিনয়ী স্বভাবের হল! দেখতে খানিকটা বাবার মতো হলেও, এই ছেলে সম্ভবত তার মায়ের স্বভাব পেয়েছে। মহিলাকে একবার মিট করতে ইচ্ছে করছে।

"প্রতীক, আমাদের এই বজবজ ইউনিটের জন্য একটা প্রোজেকশন তোমাকে তৈরি করতে হবে। প্রোডাকশন, সেলস, স্টকের ডেটা দিয়ে দেখাতে হবে, আগামী এক বছরের মধ্যে আমাদের এই ইউনিট বড় ধরনের লসের মধ্যে চলে যাবে। পারবে?"

প্রতীক অবাক হয়ে গেল। গভীর বিস্ময়ে বলল, "বুঝতে পারছি না স্যার!"

সুদর্শন জোয়ারদার টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়লেন। ঠোঁটের কোনায় হাসি এনে বললেন, "বোঝার কিছু নেই। আমি দেখতে চাই, এই কঠিন কাজটা তোমার নতুন প্রোগ্রামটা সামলাতে পারে কিনা। নিউজপেপারে পড়োনি, বড় বড় জায়গায় আচমকা বানানো ফায়ার ফাইটিং টেস্ট হয়? পড়োনি? আগুন নেই, তবু অ্যালার্ম বেজে উঠে। ফায়ার ব্রিগেড ছুটে আসে। আজকাল টেররিস্ট অ্যাটাক নিয়েও এইভাবে রিহার্সাল হয়। এটাও সেরকম একটা ধরে নাও। বজবজ ইউনিটের অবস্থা খুব খারাপ হলে কী করা হবে, তার একটা মক টেস্ট হবে কোম্পানিতে। আমি তোমার প্রোজেকশন রিপোর্ট ম্যানেজারদের সামনে ফেলব। দে উইল সাজেস্ট হোয়াট টু ডু। কিন্তু প্রোজেকশন এমনভাবে করবে, যাতে অবস্থাটা মারাত্মক মনে হয়। আমি আর তুমি ছাড়া কেউ জানবে না, এমন একটা জিনিস তৈরি হচ্ছে। পারবে না?"

প্রতীক ভিতরে-ভিতরে উত্তেজনা অনুভব করছে। বলল, "স্যার ডেটাগুলো তো ফলস তৈরি করতে হবে।"

"কী-কী করতে হবে, তুমি আমার চেয়ে অনেক ভাল জানবে। সম্ভবত ব্যাক ক্যালকুলেশনে ইনপুট ডেটা তৈরি করতে হবে। কাজটা ঝামেলার নয়। ট্যাক্সের হাত থেকে বাঁচতে অ্যাকাউন্টসে এরকম অনেক সময় করতেই হয়। আমি আরও সাতদিন কলকাতায় আছি। মাঝখানে দু'দিনের জন্য নর্থ বেঙ্গল যাব। আমি তোমার রিপোর্ট নিয়ে যেতে চাই। তুমি সেদিনই তোমার বাইরে যাওয়ার বিষয়টাও কনফার্ম করবে।"

কথা থামিয়ে উঠে দাঁড়ালেন সুদর্শন। হেসে হাত বাড়িয়ে দিলেন। প্রতীক উঠে নিজের হাত এগোতে-এগোতে বুঝতে পারল, সে ঘামছে। এসির কারণে ঘর হিমশীতল, তবু সে ঘামছে কেন? আনন্দে? নাকি চ্যালেঞ্জ নেওয়ার টেনশন?



হাতের লাউ দুটো মাটিতে নামিয়ে লক্ষ্মণ পাড়ুই এক গাল হেসে বলল, "এবার ফলন বেশি হয়েছে। ভাবলাম, দাদার জন্য দুটো নিয়ে যাই।"

জাহ্নবী লক্ষ্মণের মুখের দিকে তাকিয়ে ঠান্ডা গলায় বলল, "বসো লক্ষ্মণ।"

দরজার পাশে রাখা মোড়া টেনে এনে বসল লক্ষ্মণ।

"কী বিচ্ছিরি আকাশ দেখেছেন দাদা? এই সময় জল হলে সবজিগুলো যাবে। এমনিতেই দাম নেই, তার উপর প্রকৃতিও যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহলে তো না খেয়ে মরতে হবে।"

জাহ্নবী মুখ ঘুরিয়ে বাইরে তাকালেন। লক্ষ্মণ সহজ হওয়ার চেষ্টা করছে। সহজ তাকেও হতে হবে। সহজের চেয়েও জরুরি মাথা ঠান্ডা রাখা। ছেলেটো যে এসেছে, সেটা কম নয়। সুদর্শন খানিকটা আনমনে বললেন, "মনে হচ্ছে কোথাও নিম্নচাপ হয়েছে, ডিপ্রেশন।"

লক্ষ্মণ মুখটা বিকৃত করে বলল, "তার মানেই চিত্তির। তিন দিন টানা জল চলবে। তারপর নামবে ঠান্ডা। ততক্ষণে সবজি-টবজি সব পচে গন্ধ ছাড়বে।"

জাহ্নবী মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। সরাসরি কাজের কথায় যাওয়াই ভাল। দায়িত্ব যখন নিয়েছেন, সাধ্যমতো চেষ্টা করতে হবে। লক্ষ্মণের মতো ছেলেপিলের হাতে পায়ে না ধরতে পারুন, নরম গলায় যদি কাজ হাসিল করা যায়, সেটাই অনেক। ক'টাদিন আগে হলে এসব ছুটকো জিনিস নিয়ে ভাবতে হত না। দুটো চড়েই কাজ হত। সময়, পরিস্থিতি কত কিছু পালটে দেয়। রাজনীতির গোড়াতে পার্টির 'দাদা'রা শিখিয়েছিলেন, "কীভাবে কাজটা করছ সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল, কাজটা করতে হবে।"

জাহ্নবী অবাক হয়ে বলতেন, "নীতি-আদর্শ? পার্টি লাইন?"

"আরে বাপু, সবই থাকবে। নীতি আদর্শের জন্যই তো কাজটা করতে হবে। শুধু বুলি আউড়ে গেলাম, কিন্তু কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা, পার্টি চলবে? কারখানার মালিকের সামনে গিয়ে যদি খঞ্জনি বাজিয়ে নাম সংকীর্তন গাও, হবে? ওখানেও যে-গানই গাও বাপু টেবিল চাপড়ে গাইতে হবে। এই যে আমরা জমি কাড়ছি, সে কী 'বাবা বাছা' বলে? আগে গিয়ে ঝাণ্ডা পুঁতেছি। কল-কারখানাও সব এভাবে দখল নিতে হবে।"

জাহ্নবী সরাসরি কাজের কথা শুরু করার আগেই লক্ষ্মণ গদগদ ভাবে বলল, "আছেন কেমন?"

জাহ্নবী মৃদু হেসে বললেন, "ঠিকই আছি। বিশ্রাম নিচ্ছি।"

"তাই ভাল। অনেক খেটেছেন। এবার খানিকটা সময় রেস্ট নিন।"

লক্ষ্মণের কথা বলার মধ্যে চাপা কোনও ব্যঙ্গ আছে? সুদর্শন চুপ করে রইলেন। লক্ষ্মণ মোড়াটাকে টেনে একটু কাছে সরে এসে বলল, "দিঘির পাড়ের অবস্থা ভাল নয়। কী করব বলুন, ওদের সঙ্গে না গেলে গ্রামে থাকতে পারব না। করে-কম্মে খেতে তো হবে। আর...আর খারাপ সময়ে পার্টি তো দেখল না। শেলটারও দিল না। ইলেকশনে হারার পর বলল, নিজেরটা নিজে বুঝে নাও। কলকাতায় আর আশপাশে যারা থাকে, তারাই শুধু হেড কোয়ার্টার থেকে শেলটার নিল...তাও তো সবাই নয়...আপনারাই দেখুন না দাদা... কী হল? এতদিন যাকে মাথায় তুলে নাচলি, এখন তাকেই চোর বলছিস। আমরা দল বদলেছি বলে বেইমান, আর তোরা কী করলি! ভেবে দেখেছিস একবার...দিঘির পাড়ে পার্টির যে কটা লোক টিকে আছে আপনার নাম মুখেও নেয় না..."

সবই দল বদলের যুক্তি। কৈফিয়ত। জাহ্নবী হাত তুলে বললেন, "বাদ দাও ওসব। রাজনীতিতে সবই মেনে নিতে হয়। সময় তো একরকম যায় না।"

লক্ষ্মণ চোখ বড় করে বলল, "তা বলে এরকম হবে! আমাকে যে খাইয়ে পরিয়ে বড় করল, তাকে লাথি মারব? ছ্যা ছ্যা!"

জাহ্নবী হাত দিয়ে কপালের উপর পড়ে যাওয়া চুল সরালেন। চুল বড় হয়ে গিয়েছে। কাটতে হবে। গণেশকে বললে সেলুন থেকে উপেনকে নিয়ে আসবে। দিঘির পাড়ের 'নিউ কাট' সেলুন দেখলে কলকাতার মানুষ নাক সিঁটকোবে। 'নিউ কাট'-এ একটাই চেয়ার। ঢ্যাঙা কাঠের চেয়ারের সামনে

ঘষা কাঁচের আয়না। চেয়ারের পায়াতেও গোলমাল ছিল। ঢক-ঢক করলে হাতল চেপে বসতে হয়। চেয়ার ঠিক করতে বললে উপেন বিরক্ত হয়। চেয়ার ঢক ঢক না করলে, কাঁচি চালাতে তার নাকি অসুবিধে আছে। একটা সময় ছিল, যখন জাহ্নবী পত্রনবিশ গ্রামে এসে আয়োজন করে চুল কাটতেন। বাড়ির উঠোনে চেয়ার পেতে দেওয়া হত। গায়ে সাদা চাদর। কাউকে-কাউকে ওই সময়তেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতেন। চুল কাটতে-কাটতে টুকটাক কথা হত। দেশের বাড়িতে এসে চুল কাটার কোনও দরকার ছিল না। দুটো-তিনটে দিনের তো মোটে ব্যাপার। তবু জাহ্নবী পত্রনবিশ ব্যবস্থাটা রেখেছিলেন। তিনি একটা 'মেজাজ' তৈরি করতে চাইতেন। কলকাতার নামী-দামি বিলাস ছেড়ে গ্রামের সাদামাটা জীবন পছন্দ করার মেজাজ। যে জন্য গ্রামে এসে প্রায়ই পুকুরঘাটে বসে খানিকটা সময় নিয়ে গায়ে তেল ঘষতেন। চারপাশে লোক থাকত। সাধারণ লোক, পার্টির লোক। সকলেই কিছু না-কিছু চায়। তাই মুগ্ধ চোখে নেতার তেল মাখা দেখত। পুকুরের জলে ডুব দিতে-দিতে কথা বলতেন জাহ্নবী।

চুল কাটার দিনগুলোতে সেলুনের দেয়াল থেকে আয়না খুলে আনত উপেন। চুল কাটার মাঝে সামনে এসে সেই আয়না ধরে দেখাত। জাহ্নবী বলতেন, "আঃ, গাধার মতো আয়না দেখাও কেন? যা খুশি কাটো। আমি কি ফিল্মে নেবেছি হতচ্ছাড়া, যে চুলে কেয়ারি করতে হবে?"

গণেশও উপেনকে ধমক দিত। বলত, "আয়নাটা আনো কেন? এবাড়িতে কি আয়না নেই? সেটা বের করে দেব।"

উপেনের মুখ সব সময়েই কাঁদো-কাঁদো। সেই কাঁদো-কাঁদো মুখেই বলত, "অন্য চিরুনি, কাঁইচিতে কাজ করতে পারি, কিন্তু আয়না নিজের না হলে চলে না। চুল ছোট-বড় হয়ে যায়।"

গণেশ রেগে গিয়ে বলত, "আয়না দিয়ে তুমি কী করবে? তুমি তো আর আয়না দেখে চুল কাট না। যার চুল কাট, সে দেখে।"

উপেন আরও কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলত, "সেই কারণেই তো ভয়। অন্য আয়নাতে আমার বিশ্বাস নাই। বেইমানি করতে পারে। ভাল ছাঁট যদি মন্দ দেখায়, তা হলেই কেলেঙ্কারি।"

কপালের উপর এসে পড়া চুল সরাতে গিয়ে জাহ্নবী পত্রনবিশের মনে পড়ল, একটা সময় বলা হত, চুল আর পার্টি দুটোই সমান। বড় হলে ছেঁটে ফেলতে হয়। নইলে চোখের ওপর এসে পড়ে। সামনেটা দেখা যায় না। পথ ভুল হয়ে যায়। অনেকটা এই তত্ত্ব নিয়ে একবার পার্টিতে সার্কুলার হল। যাদের জন্য 'পথ ভুল' হচ্ছে, তাদের বাদ দিতে হবে। পার্টি তখন ক্ষমতার মধ্যগগনে। মধুভরা চাক। চারপাশে মৌমাছি ভন-ভন করছে। সঙ্গে হাজার হাজার অভিযোগ। একেবারে নীচ থেকে উপর পর্যন্ত। সবার মতো সার্কুলার এল ট্রেড ইউনিয়ন অফিসেও। ইউনিয়নেও ঝাড়াই-বাছাই চাই। জাহ্নবী পত্রনবিশ সেই সার্কুলার অচিরেই ফাইলবন্দি করেন। নেতাদের জানিয়ে দেন, "কাদের নিয়ে চলব, আমাকে বুঝতে দিন। আপনারা শুধু কাজটা বুঝে নেবেন। কারখানার গেটে আমাদের ফ্ল্যাগ না দেখলে, চেপে ধরবেন, কিন্তু কীভাবে ফ্ল্যাগ টাঙালাম, সে ব্যাপারে নাক গলাবেন না প্লিজ।"

জাহ্নবী আর দেরি করলেন না। লক্ষ্মণের চোখের দিকে স্থির ভাবে তাকিয়ে বললেন, "লক্ষ্মণ, তোমাকে একটা দরকারে ডেকেছিলাম। দরকারটা সরাসরি বলাই ভাল। কাল তোমার শ্বশুরমশাই এসেছিলেন। মাধববাবু। বললেন, তার মেয়ের সঙ্গে তোমার বনিবনা হচ্ছে না।"

ভুরু কুঁচকে পিঠ সোজা করল লক্ষ্মণ। বলল, "আপনাকে নালিশ করে গেল?"

সুদর্শন ঠান্ডা গলায় বললেন, "নালিশ নয়, অনুরোধ।"

লক্ষ্মণ চাপা স্বরে হিসহিসিয়ে বলল, "কী বলল? ওর মেয়েকে মারধর করি? মিথ্যে কথা!"

জাহ্নবী হাত তুললেন, "আমি এসব কথায় যাচ্ছি না লক্ষ্মণ। তুমি ভাল করেই জান, আমি এখন গোলমাল থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখি। চারপাশে কী ঘটছে, মাথা ঘামাই না। সমস্যা নিয়ে এলে কারও সঙ্গে দেখা করি না। এড়িয়ে চলি। তোমার শ্বশুরকেও এড়িয়ে যেতে পারতাম। একসময়ে তুমি আমার সঙ্গে রাজনীতি করেছ, তাই তুমি আমার কথা শুনবে এই অবুঝ ধারণা ওর থাকতে পারে, আমার নেই। কিন্তু আটকে গেলাম অন্য জায়গায়। দাঁড়াও, আগে চায়ে চুমুক দিয়ে নিই।"

জাহ্নবী চুপ করলেন। গণেশ দুটো বড় কাচের গ্লাসে চা নিয়ে এসেছে। একটা লক্ষ্মণের হাতে দিল, অন্যটা নামিয়ে রাখল জাহ্নবীর পাশে রাখা মেঝে চাপা টেবিলে। টেবিল ঠিক নয়, জলচৌকির মতো। পায়াগুলো সুন্দর। গায়ে কাজ করা। গণেশ জাহ্নবীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি দোকানে যাচ্ছি। বেলায় আসব।" জাহ্নবী মাথা নাড়লেন, কঠিন চোখে লক্ষ্মণের দিকে তাকিয়ে ঘর ছাড়ল গণেশ।

জাহ্নবী গ্লাসের চায়ে চুমুক দিতে দিতে চট করে ভেবে নিলেন কী বলবেন।

"লক্ষ্মণ, শুনলাম, যতই অশান্তি হোক, তোমার বউ এখানেই থাকতে চায়, তোমার কাছে। এই জায়গাটাতেই আমি গেলাম আটকে। ঠিক করলাম, তোমাকে একবার বলে দেখব। তারপর যা ভাল বুঝবে করবে। সেইটা বলার জন্যই তোমাকে ডেকেছি। এসবের মধ্যে কোনও রাজনীতির সম্পর্কটম্পর্ক নেই। তোমাকে অনেকদিন ধরে চিনি, তাই বললাম।"

লক্ষ্মণ মাথা নামিয়ে খানিক সময় চুপ করে রইল। তারপর মাথা নামানো অবস্থাতে নিচু গলায় বলল, "কপালির দোষ আছে।"

জাহ্নবী খানিকটা নিশ্চিন্ত হলেন। লক্ষ্মণ বিষয়টা নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলছে এটাই অনেক। ইচ্ছে করলে অপমান করতে পারত। বলতে পারত, "এসব বলার আপনি কে?" সত্যি কথা বলতে, এই কথার শোনার জন্য মনে মনে খানিকটা প্রস্তুত হয়েই ছিলেন।

জাহ্নবী নরম গলায় বললেন, "আমি দোষ-গুণের বিচারে যাব না লক্ষ্মণ। তোমাদের পারিবারিক ব্যাপারে নাক গলাতে চাই না। আমি শুধু একটাই পরামর্শ দেব, বউয়ের সঙ্গে কথা বল। তুমি তো আর পাঁচটা সাধারণ লোকের মতো নও। তোমার বুদ্ধি আছে। পলিটিক্যাল সেন্স আছে। সেটা কাজে লাগাও। যে রাজনীতিই করো, তোমাকে একটা ইমেজ রক্ষা করতে হবে। যদি চাও তোমার বউয়ের সঙ্গে কথা বলতে পারি। একদিন যদি পাঠিয়ে দাও, অসুবিধে নেই।"

জাহ্নবী থামলেন। লক্ষ্মণ এখনও মাথা তোলেনি। তাকে খানিকটা অনুতপ্ত মনে হচ্ছে। অনুতপ্ত না হলে, বিনা বাধায় এতটা ভাষণ শুনবে কেন? নলিনী তো আলোচনাতেই যেতে রাজি হয়নি। সিদ্ধান্ত নিয়ে জানাতে এসেছিল। বলেছিল, "তোমার কাছে থাকলে ছেলে নষ্ট হয়ে যাবে।"

জাহ্নবী অবাক হয়ে বলেছিলেন, "নষ্ট!"

নলিনী শান্ত ভঙ্গিতে বলেছিল, "হ্যাঁ নষ্ট। মিথ্যে শিখবে, চুরি শিখবে, গুণ্ডামি শিখবে।"

"তোমার কি ধারণা, আমি এগুলো করি?"

নলিনী চোখ তুলে বলেছিল, "কর কিনা জান না? তুমিই সব থেকে ভাল করে জান যে, আমি শুধু খবরের কাগজ পড়ে কথাগুলো বলছি না। যাই হোক, তুমি আমাদের মুক্তি দাও। যে জাহ্নবী পত্রনবিশকে আমি ভালবেসেছিলাম, তার টাকাপয়সা ছিল না, ঘরবাড়ি ছিল না, থাকা খাওয়ার ঠিক ছিল না। সে কারখানার গেটে মিটিং করে বেড়াত, পুলিশের মার খেত। আজ আমি যে-মানুষটার সঙ্গে ঘর করছি, সে মানুষ এ নয়। এই জাহ্নবী পত্রনবিশ ভোগ-বিলাসে ডুবে গিয়েছে। ক্ষমতায় হিতাহিত জ্ঞান হারিয়েছে।"

জাহ্নবী উত্তেজিত হয়ে বলেছিলেন, "তুমি তো অপোনেন্ট পার্টির নেতাদের মতো কথা বলছ নলিনী। ওদের হয়ে দালালি করছ। ইলেকশনে দাঁড়াবে নাকি? ভালই হবে, জাহ্নবী পত্রনবিশের স্ত্রীকে যদি উলটো দিকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়, একটা হইচই হবে। মিডিয়া পাবলিসিটি দেবে।"

কথা শেষ করে নিষ্ঠুর হেসেছিলেন জাহ্নবী। হেসেছিল নলিনীও। ঠোঁটের কোনায় অল্প। বলেছিল, "তুমি ভাল করেই জান, তুমি যা বলছ সেগুলো অর্থহীন, অসংলগ্ন। এটাই তোমার সমস্যার হয়েছে। সত্যি শোনার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। শুধু তুমি একা নয়, তোমাদের গোটা পার্টিটাই এই অসুখে ভুগছে।"

ক্রুদ্ধ জাহ্নবী চিবিয়ে-চিবিয়ে বললেন, "কী করে জানলে, তুমি যা বলছ সেগুলো সত্য? তুমি তো জান, আমার মোটে দুটো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট। সেখানে কত টাকা আছে জান না? ঘুষের টাকা কি আমি এই ঘরের মেঝেতে খুঁড়ে পুঁতে রেখেছি?"

"আমি পুলিশ নই যে, চুরির টাকা কোথায় রেখেছ, তার হদিশ করব। তবে যদি বলো, তাও করতে পারি। ক্যাশ টাকা ব্যাঙ্কে বা বাড়িতে রাখার মতো বোকমি করবে, এমন কেউ আশা করে না। কোন এনজিওর নাম করে টাকা রাখছ, কোনও নার্সিংহোমে টাকা খাটছে, কোন রেস্তরাঁয় শেয়ার আছে, চাইলে লিস্ট বানাতে পারি। সেদিন শুনলাম, দুটো হাউজিং কমপ্লেক্সেও ঢুকেছ। তুমি আমার এই ইনফরমেশনগুলো অস্বীকার করতে পার, গলা ফাটাতে পার, কিন্তু তাতে লাভ হবে না। তুমি নিজেও জান, আমি যা বলছি সেটা সত্যি। তোমার জীবনযাপন বলে দিচ্ছে সত্যি।"

নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে জাহ্নবী পত্রনবিশ বিড়বিড় করে বলেছিলেন, "সেই জীবন তো তুমিও এনজয় করেছ নলিনী। করনি?"

"অবশ্যই করেছি, কিন্তু তার মানে এই নয়, চিরকাল করব। যখন জানতে পেরেছি, সরে যেতে চাইছি।"

জাহ্নবী ভুরু তুলে বললেন, "বাঃ, চমৎকার যুক্তি। খাওয়ার পর মুখ মুছে নেওয়া?"

নলিনী বলেছিল, "শুধু তো মুখ মুছে নেওয়া নয়। আমি নিজেও তো শান্তি পেতে চাইছি। এত অর্থ, ক্ষমতা ছেড়ে চলে যেতে চাইছি। সেটা একধরনের শান্তি নয়?"

"এসব নাটুকে কথা থামাও নলিনী। সত্যি কথা বলো তো, কার কাছ থেকে ব্রিফ নিয়েছ?"

একথায় গুরুত্ব না দিয়ে নলিনী বলল, "শুধু ঘুষ নয়, আরও অজস্র অন্যায়ের মধ্যে তুমি ঢুকে গিয়েছ। একটা ঘটনা তোমাকে বলতে পারি। শুনবে? মাসকয়েক আগের ইনসিডেন্ট। কাগজওয়ালারা জানে না। ডিমান্ড অনুযায়ী, ইউনিয়নে চাঁদা দেয়নি বলে দুর্গাপুরের এক কাস্ট আয়রনের ফ্যাক্টরিতে মিথ্যে অজুহাতে স্ট্রাইক করিয়েছ। লেবারদের বড় একটা অংশের আপত্তি ছিল। তারা কারখানার মালিকের কাছে গিয়ে বলেছিল, কাজ করবে। এই খবর পেয়ে, তুমি নিজে কলকাতা থেকে ওখানে যাও। দাঁড়িয়ে থেকে স্ট্রাইক মবিলাইজ় কর। যারা আপত্তি করেছিল, তাদের মধ্যে দু'জনকে তোমার গুন্ডারা হাত-পা ভেঙে হাসপাতালে পাঠায়। সেখানেও ভয়ঙ্কর কাজ করেছ। এমন কলকাঠি নেড়েছিলে যে, লোকগুলো বিনা ট্রিটমেন্টে হাসপাতালে বারান্দায় পড়ে দীর্ঘক্ষণ কাতরায়। আবার তোমরাই ট্রিটমেন্ট কেন হচ্ছে না অভিযোগ এনে, সেখানে গোলমাল পাকিয়েছিলে। ওই দু'জনের একজনের হাতের অবস্থা খুব খারাপ। ডাক্তার বলে দিয়েছে, কোনওদিন ঠিক হবে কিনা, সন্দেহ আছে। আমি শুনেছি, হাত-পা ভেঙে দেওয়ার রাজনীতিতে তোমার পারফরমেন্স নাকি খুবই ভাল। শুধু তাই নয়, দিঘির পাড়ের শুকুর আর তার বউ তোমার অর্ডারে গ্রাম ছাড়া হয়ে আছে। তাদের দোষ পঞ্চায়েতের চুরিতে আপত্তি করেছিল। যাক, এসব আলোচনায় আমার যাবার ইচ্ছে নেই। আমি কোনও দোষারোপও করতে চাই না। তোমাদের রাজনীতি তোমরা করো গে। আমি শুধু ছেলেকে নিয়ে চলে যাবার সিদ্ধান্তটাই জানিয়ে দিলাম।"

লক্ষ্মণ পাড়ুই এবার মাথা তুলল। তার কপালে ভাঁজ।

"আপনি যখন বলছেন...।"

জাহ্নবী শান্ত গলায় বললেন, "আমি বলছি বলে নয়, যদি কিছু কর, তোমাকে নিজের বিশ্বাসেই করতে হবে লক্ষ্মণ। নিজেরা পছন্দ করে বিয়ে করেছিলে, সেটা টিকিয়ে রাখতে হলে, নিজেকেই রাখতে হবে। অন্য কেউ হাজার জোর করলেও পারবে না।"

লক্ষ্মণ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "চেষ্টা করব দাদা। লাউডুটো গণেশকে রান্না করে দিতে বলবেন। খুব কচি, রান্না করলে এইটুকু হয়ে যাবে। বড়ি দিয়ে ভাল লাগবে।"

লক্ষ্মণ চলে যাওয়ার পর জাহ্নবীও আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, মেঘ একটু যেন কেটেছে। আবছা একটা রোদের ভাব। নিম্নচাপ কি সরে যাচ্ছে? তাই হবে। সমুদ্রে তৈরি হওয়া ঝড়-জল অনেকসময় মুখ ঘুরিয়ে নেয়। মনটা হালকা লাগছে। শেষ পর্যন্ত লক্ষ্মণ কতটা কী করবে সেটা এখনই বলা মুশকিল, তবে ওর হাবভাব দেখে একটা জিনিস বোঝা গেছে। বউকে মারধর করাটা থামাবে। পাড়াগাঁয়ে সেটাই অনেক। লক্ষ্মণের এই বদলে যাওয়ার ঘটনাটা জানাজানিও হবে। শুধু দিঘির পাড় নয়, অন্য গ্রামের লোকও জানবে, আজও জাহ্নবী পত্রনবিশের কথায় কিছু কাজ হয়। তার মানে, মানুষটার নখ-দাঁত এখনও পুরো ভাঙেনি। জাহ্নবী নিজের মনেই হাসলেন। নিজের প্রতি করুণায় হাসলেন। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া মেটানোর মতো তুচ্ছ বিষয়কে নিয়েও এখন তাঁকে ক্ষমতা জাহির করতে হচ্ছে। অবশ্য দিঘির পাড়ে পাকাপাকি ভাবে এসে থাকতে শুরু করার পর সামনাসামনি তাকে কেউ অপমান করেছে, এমন নয়। উল্টো পার্টির লোকদের সঙ্গে রাস্তাঘাটে দেখা হলে এখনও কেউ-কেউ কপালে হাত ঠেকায়, তবে কাছে আসে কম। ভোটে হেরে যাওয়ার পর থেকে পার্টিতেই লোকজন অনেক কমে গিয়েছে। বেশির ভাগ সময়েই অফিসে তালা। অফিসটা গোড়াতে ছিল নড়বড়ে। টালির চাল, বাঁশের বেড়া। বাথরুমের আলাদা ব্যবস্থা ছিল না। ঝোপঝাড়ই ছিল একমাত্র ভরসা। জাহ্নবী পত্রনবিশের উদ্যোগে এসব ঠিকঠাক হয়েছিল। দরজা জানলা দেওয়া পাকা ঘর হল, ছোট একটা বাথরুম হল, অফিসের চারপাশে উঁচু পাঁচিল হল। দরজার মুখে কোলাপসিবল গেট লাগানোর সময় দু'একজন ঠাট্টা করে বলেছিল, "পার্টি অফিসটাকে তো জেলখানা বানিয়ে ফেললেন! মানুষ ঢুকতে ভয় পাবে।"

জাহ্নবী হেসে বলেছিলেন, "কে জানে, নিজেদেরই একদিন জেলখানার দরকার হবে কিনা। জানেন তো, অনেক সময়ে প্রাণ বাঁচাতে জেলখানার মতো নিরাপদ জায়গা আর হয় না।"

পার্টি অফিস নতুন ভাবে তৈরি করতে অবশ্য দিঘির পাড় পার্টিকে টাকাপয়সা কিছু খরচ করতে হয়নি। সবটাই জোগাড় করে দিয়েছিলেন জাহ্নবী। সেদিন কমিটির কয়েকজন বলেছিল, "টাকাটা আপনি একা কেন ব্যবস্থা করবেন দাদা? সবাই মিলে চাঁদা তোলা হোক। গ্রামের প্রতিটা বাড়িতে ছেলেরা যাক। যে যা পারে, দেবে।"

জাহ্নবী এই প্রস্তাব উড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন, "দূর, এই সামান্য ক'টা টাকার জন্য চাঁদা তোলবার কী আছে?"

"টাকা বেশি না কম, সেটা বড় কথা নয়, মানুষের সঙ্গে একটা যোগাযোগ হত। বোঝা যেত, কারা আমাদের সমর্থন করে।"

জাহ্নবী হেসে বললেন, "যারা সাপোর্ট করে না, তারা বেশি-বেশি চাঁদা দেবে। ভয়ে দেবে। আগে এসব হত। মিটিংয়ে যাব বলে বাড়ি-বাড়ি গিয়ে রুটি গুড় কালেকশন করতাম। এখন বলতে গেলে পার্টির লোকই মারতে আসবে। সময় পালটে গিয়েছে। টাকা নিয়ে ভাববেন না। আরে বাবা, নিজের গাঁয়ের জন্য বড় মানুষদের কিছু করতে হয়। এক সময় পুকুর কেটে দিতে হত, দুটো জলের কল বসিয়ে দিত। স্কুল, লাইব্রেরিও তো কম হয়নি। আমি না হয় পার্টি অফিসটাই বানিয়ে দিলাম।"

কথাটা বলে আওয়াজ করে হেসেছিলেন জাহ্নবী পত্রনবিশ। যারা আপত্তি করেছিল তারা চুপ করে যায়। পাঁচিল আর লোহার গেট বানিয়ে পার্টি অফিসকে যতই 'নিরাপদ' বানানো হোক, এখন সেখানে মানুষ কমই ঢোকে। পরিস্থিতি বদলে যাওয়ার পর পার্টির কয়েকজন গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছে। এক সময় যাদের দাপট বেশি ছিল, তারা পালিয়েছে বেশি। বাকিরা কেউ কেউ লক্ষ্মণ পাড়ুইয়ের মতো দল বদলেছে। কেউ আবার বসে গিয়েছে। বিমল, তারাপদর মতো যে দু'একজন আছে, তারা জাহ্নবী পত্রনবিশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না। কী করেই বা রাখবে? পার্টি যাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত করছে, তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা যায় না। এখানে আসার পর একদিনই পার্টি অফিসের সামনে দিয়ে গিয়েছিলেন জাহ্নবী। সন্ধের মুখে হলেও, তখনও বেশ আলো ছিল। অফিসের ভিতর থেকে রাস্তার লোকজন দিব্যি দেখতে পাওয়ার কথা। ভিতর থেকে দু'একজনের গলা ভেসে এল। তবে জাহ্নবীকে দেখে কেউ বেরিয়ে আসেনি। একটা সময় ছিল, যখন জাহ্নবী পত্রনবিশের সঙ্গে কথা বলার জন্য এই অফিসের বাইরে ভিড় জমে থাকত। তখনও হয়তো তিনি দিঘির পাড়ে এসে পৌঁছননি, পথে রয়েছেন, তাও লোক চলে আসত। ঘুরে আসতে বললেও, যেত না।

গণেশ ফিরে এসেছে। দোকান শ্যালকের হাতে ছেড়ে সে মাঝে-মধ্যেই ঘুরে যায়। খুটখাট কাজ সেরে দেয়।

"দাদা, স্নানের জল গরম করি?"

স্নানের জল 'গরম করা' মানে গিজ়ার চালিয়ে দেওয়া। এ বাড়ির বাথরুম বহুদিন আগেই সাজিয়ে-গুছিয়ে নিয়েছিলেন জাহ্নবী। কলকাতা থেকে মিস্ত্রি এনে টাইলস বসিয়েছিলেন। কমোড, বেসিন, শাওয়ার, গিজ়ার সব লাগানো হয়েছে। বাথরুমের জন্য বাড়ির মাথায় আলাদা করে জলের ট্যাঙ্ক হল। পাম্প বসিয়ে সেই জল তোলা হয়। জাহ্নবীর ইচ্ছে ছিল, মা শেষ বয়সে বাথরুমটা ব্যবহার করবে। হেমলতা কোনওদিনই ঢোকেননি।

"একটু পরে স্নান করব। রোদটা মনে হয়, আরও উঠবে।"

গণেশ মুখ বাড়িয়ে জানলা দিয়ে বাইরেটা দেখল, "তাই মনে হচ্ছে। মেঘ সরছে। লক্ষ্মণ কী বলল?"

জাহ্নবী খানিকটা নিজের মনে বললেন, "মনে হচ্ছে, কাজ হবে।"

গণেশ লাউডুটো চোখের সামনে তুলে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে-দেখতে বলল, "হলেই ভাল। তবে ছেলেটা খারাপ হয়ে গিয়েছে।"

জাহ্নবী বললেন, "খারাপ-ভাল বিচার করে লাভ কী? মেয়েটার ক্ষতি না হলেই হল। কী যেন নাম মেয়েটার?"

"কপালি। শুনেছি, মাধবদারা এই বিয়েতে রাজি ছিল না। পার্টি-পলিটিক্স করা ছেলে কখন কী করে বসে... মেয়েটাই জোর করেছিল।"

জাহ্নবী চুপ করে রইলেন। রাজনীতি করেও নলিনীর সঙ্গে মেলামেশা বা বিয়েতে কোনও সমস্যা হয়নি। হওয়ার কথাও ছিল না। নলিনীর বাবাও অল্প স্বল্প রাজনীতি করতেন। বাবা জগন্নাথ মুন্সি সরকারি অফিসের চাকুরে ছিলেন। টিফিনের সময় মিটিং করতেন। মিটিং শেষ হলে করিডরে মিছিল হত। ডি এ বোনাস, বেতন কমিশন, এই সব। তরুণ জাহ্নবী তখন খুব ব্যস্ত। পার্টি ক্ষমতায় বসেছে। নেতারা আদেশ দিয়েছে, কলকারখানার মালিকরা যেন বুঝতে পারে যেভাবে চলছিল সেভাবে আর চলার দিন খতম। এবার থেকে পার্টি যেমনটি বলবে শুনতে হবে। না শুনলে 'টাইট' দিতে হবে। 'টাইট'-এর ফলে কিছু কারখানার গেটে তালা পড়তে পারে। পড়লে পড়বে। তাই নিয়ে চিন্তা করলে চলবে না। শ্রমিকদের ভবিষ্যতের জন্য সেটাই মঙ্গল। তাদের বোঝাতে হবে, স্বার্থরক্ষা করতে হলে, আদর্শকে আঁকড়ে ধরা চাই। আত্মত্যাগ করতে হবে। আদর্শ, আত্মত্যাগ ছাড়া মাথা উঁচু করে বাঁচার কোনও পথ নেই। পার্টি যখন ক্ষমতায় এসেছে, তখন আর চিন্তা নেই। কারখানা বন্ধ করে মালিক পালালে, সেই কারখানা আইন করে দখল নেওয়া হবে। অন্য

মালিককে পাকড়াও করে আনা হবে। কারখানা আবার খুলবে। সুতরাং কোনও সমঝোতা নয়। কঠিন কাজ। একদিকে মালিকদের 'টাইট' দিতে হবে, অন্য দিকে লেবারদের প্রয়োজনে 'পেটে গামছা বেঁধে' থাকার কথা বোঝাতে হবে। পার্টির এই আদেশ মানতে জাহ্নবীদের নাকানিচোবানি অবস্থা। এরকম একটা সময় পরিচয় হল জনার্দন মুন্সির সঙ্গে। রাজনীতির কারণেই পরিচয়। এক সকালে তার বাড়িতেও যেতে হল, জনার্দন মুন্সি পিঠ চাপড়ালেন একচোট।

"তোমার কথা খুব শুনছি ইয়ং ম্যান। তুমি তো এই বয়সেই ফায়ার ব্র্যান্ড লিডার হয়ে উঠেছ হে।"

জাহ্নবী খুশি হলেও বলেছিলেন, "না, না, ওসব কিছু নয়। পার্টি যা বলছে তাই করছি।"

"আরে বাপু, পার্টি তো অনেককেই অনেক কিছু বলে, সবাই কি ঠিকমতো করে উঠতে পারছে? এই জন্যই তো সবাই লিডার হতে পারে না, কেউ-কেউ লিডার হয়।"

জাহ্নবী বললেন, "আপনিও তো আপনার জায়গায় পার্টির কাজ করছেন।"

জনার্দন মুন্সি হেসে বলেছিলেন, "দুর, আমরা আবার পার্টির কাজ করি কোথায়? আমরা নিজের কাজ করি। কী করে মাইনে বাড়ানো যায়, শুধুই তার চেষ্টা। ভেবেছিলাম, দল পাওয়ারে এলে নতুন ভাবে কাজ শুরু হবে। নীতি আদর্শের কাজ। আমাদের বেলায় তো তার কোনও লক্ষণ দেখছি না বাপু। আমরা করি টিটিপি।"

জাহ্নবী অবাক হয়ে বলেছিলেন, "টিটিপি! সেটা আবার কী?"

জনার্দন মুন্সি হেসে বললেন, "টিটিপি হল টিফিন টাইম পলিটিক্স। যত মিটিং, মিছিল, স্লোগান সব টিফিন টাইমে। অফিস শেষ তো পলিটিক্সও শেষ। বগলে ব্যাগ নিয়ে বাড়ির দিকে দৌড়। তখন একবার বলে দেখ না, দাদা, আজ একটু থেকে যান মিটিং আছে। তেড়ে আসবে। ভাইসেস ঢুকতে শুরু করেছে। এইভাবে চলতে থাকলে এমন দিন আসবে যখন অফিস ছুটির দিনে আমাদের নিয়ে আর কোনও পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি হবে না। বাড়ি থেকে কেউ বেরবই না। মনে হবে, অনেক বিপ্লব হয়ে গিয়েছে এবার একটু বিশ্রাম করি।"

জাহ্নবী হেসে বলেছিলেন, "আমাদের সে উপায় নেই। নো বিশ্রাম। লেবার বেল্টে কাজ করি। পাওয়ারে এসে দায়িত্ব অনেক বেড়ে গিয়েছে। শ্রমিক মালিক সম্পর্কটাই জটিল হয়ে গেল। দু'পক্ষকে বোঝাতে হবে। থিওরি, প্র্যাক্টিস দুটো দিয়েই বোঝাতে হবে।"

"তুমি পারবে। আমি শুনেছি, মানুষকে বোঝানোর ক্ষমতা তোমার আছে। নরমে গরমে চলতে জান।"

জাহ্নবী যখন বেরতে যাবেন নলিনী ঘরে এল। ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস করতে যাচ্ছিল। জনার্দন মুন্সি মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। লম্বা বিনুনির শাড়ি পরা, শান্ত, সুশ্রী মেয়ে। তবে অহেতুক লাজুক নয়। বড় রাস্তা পর্যন্ত দিব্যি জাহ্নবীর সঙ্গে কথা বলতে-বলতে চলে এল। কোন সাবজেক্ট পড়ে? রাজনীতি কেমন লাগে? নিজে কেন রাজনীতিতে যায়নি— এসব টুকটাক কথা। জাহ্নবী তখনই একট-আধটু করে পার্টির গাড়ি পেতে শুরু করেছেন। যেদিন কম সময়ের মধ্যে তিন-চারটে জায়গায় ছুটতে হত, নিজেই গাড়ি চেয়ে নিতেন। তবে গাড়ি নিয়ে কোথাও যাওয়ার অস্বস্তি তখনও কাটেনি। ড্রাইভারকে দূরে রাখতে বলতেন। পারলে একটু আড়ালে। সেদিনও গাড়ি ছিল বড় রাস্তার উল্টো দিকে। জাহ্নবী ইচ্ছে করলেই নলিনীকে গাড়িতে লিফ্‌ট দিতে পারতেন। ইউনিভার্সিটি পথেই পড়ত। কিন্তু মুখ ফুটে গাড়ির কথা বলতেই পারলেন না। বরং একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসলেন। যাতে তার সঙ্গে গাড়ি আছে এমনটা কল্পনাও করা না যায়, তাই রাস্তাটা পার হয়ে দুম করে একটা বাসে উঠে বসলেন। চলে গেলেন অনেকটা। হেঁটে ফিরে আসার সময় বুঝেছিলেন, মাথা এলোমেলো হয়ে গিয়েছে। নইলে সামান্য একটা মেয়ের জন্য নার্ভাস হয়ে এই বোকামি কেউ করে? কেন এমন হল!

তিনদিন পরে বাড়িতে কাগজপত্র ফেরত দিতে এলে জনার্দন মুন্সি খুবই অবাক হয়েছিলেন। জাহ্নবীর মতো ব্যস্ত ছেলের জেরক্স ফেরত দিতে আসার কারণ কী! জাহ্নবী স্মার্ট গলায় বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন, আসল না নকল সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল কাজের জিনিস। কাজের জিনিস নিলে ফিরিয়ে দেওয়াটাই কর্তব্য। সেই অর্থে কর্তব্য করতেই এই বাড়িতে তার আসা। এক কাপ চা খেয়ে যাওয়ার জন্য জনার্দন মুন্সি সাধাসাধি করেছিলেন। জাহ্নবী রাজি হননি। হাতে নাকে এক মিনিটও অতিরিক্ত সময় নেই।

সেদিন বাস স্টপে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেও নলিনীর সঙ্গে দেখা হয়নি। পরদিন সটান ইউনিভার্সিটি চলে গিয়েছিলেন জাহ্নবী।

বিয়ের আগে-পরের ঘটনাটা নিয়ে নলিনী অনেক হাসাহাসি করেছে। প্রেম এবং বিয়ের ব্যাপারটা হাসি-আনন্দের মধ্যে দিয়েই কেটে গিয়েছিল। নলিনীর বাবা-মাও আনন্দ পেয়েছিলেন। মেয়ের বয়সের সঙ্গে ফারাক একটু বেশির দিকে হলেও, জনার্দন মুন্সি জামাই পেয়ে রীতিমতো গর্বিত হলেন। সবাইকে বলে বেড়াতে লাগলেন। বউভাতের দিন একটা কাণ্ড হল। সকালের খবর কাগজ খুলতেই জামাইয়ের বিরাট ফোটো। আসলে বড়সড় একটা প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। প্রবন্ধের বিষয় 'শ্রমিক আন্দোলনের একাল ও সেকাল'। ফোটোতে তরুণ জাহ্নবীর রুদ্রমূর্তি। মুঠো করা ডান হাত আকাশের দিকে তোলা। অন্য হাতে ধরা আছে কাঁধে রাখা পতাকা। সামনে হেলমেট পরা এক পুলিশ লাঠি উঁচিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে।

জনার্দন মুন্সি সন্ধেবেলা সেই কাগজ ভাঁজ করে পকেটে নিয়ে ঘুরতে লাগলেন। অনুষ্ঠান বাড়িতে সুযোগ পেলেই বের করে একে-তাকে দেখাতে লাগলেন। নলিনী খবর পেয়ে বাবাকে ডেকে পাঠাল। ফিসফিস করে বলল, "এসব কী করছ বাবা! ওর ফোটো দেখাচ্ছ? তোমার কি মাথা-টাথা গিয়েছে? ছি, ছি, সবাই তো হাসাহাসি করছে।"

জনার্দন মুন্সি রাগ দেখিয়ে বললেন, "হাসছে না ছাই, হিংসে করছে! বাপের জন্মে এমন ছেলে দেখেছে? ছেলে তো নয়, বাঘের বাচ্চা!"

নলিনী চাপা গলায় বলল, "আরে বাবা, পলিটিক্স করলে অমন হয়। এখানে এমন অনেকে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন, যাঁরা বহুদিন জেলে থেকেছেন। পুলিশের মার যে কত জনকে খেতে হয়েছে...তুমি অমন লাফালাফি কোরো না। কাগজটা লুকিয়ে ফ্যালো।"

"একশোবার করব। সবাই তো আমার জামাই নয় যে, সবাইকে নিয়ে আমায় লাফালাফি করতে হবে! আমি আমার জামাইকে নিয়ে লাফাব।"

নলিনী হাল ছেড়ে দিয়ে বলেছিল, "যা খুশি করো।"

রাজনীতি করা ছেলে, বিয়ের নিয়মকানুন প্রায় কিছুই মানা হয়নি। ফুলশয্যা হলেও, ফুলের কারবার তেমন ছিল না। জাহ্নবীর পিসতুতো মাসতুতো বোনেরা যেটুকু যা গোলাপের পাপড়ি ছড়িয়ে দিয়েছিল। সেই পাপড়ি ছড়ানো বিছানায় বসে নলিনী বলল, "বাপরে কী ভয়ঙ্কর ফোটো। পুলিশটা ওইভাবে তেড়ে যাচ্ছে দেখলে ভয় করে।"

জাহ্নবী ফস্‌ করে সিগারেট ধরিয়ে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলল, "ভয় পাওয়ার কী আছে? তুমি এমন করে বলছ, যেন নতুন দেখছ। পুলিশের সঙ্গে ক্ল্যাশ কি আমাদের ওই একটা? কত হয়েছে! কারখানার ম্যানেজমেন্ট একটা ফোন করলেই থানা থেকে ফোর্স এসে আমাদের পেটাত।"

নলিনী মাথা কাত করে কানের দুল খুলতে-খুলতে বলল, "তোমার কাছে গল্প শুনেছি, ফোটো তো দেখিনি। ভয় করছিল।"

সিগারেটের শেষ অংশ অ্যাশট্রেতে গুঁজে জাহ্নবী বললেন, "ছবিটা যে কোথাকার, বুঝতে পারলাম না। মনে হচ্ছে টিটাগড়ের দিকের কোনও জুটমিলের সামনে। শ্যামনগরও হতে পারে। বছরতিনেক আগে ওখানে ঝামেলা করতাম। ছবির নিচে জায়গা আর সময়টা তো লিখবে! কাগজওলাদের নিয়ে এই হয়েছে মুশকিল।"

নলিনী হেসে বলল, "বাবা, জামাইয়ের ছবি একেবারে বুকে নিয়ে ঘুরছিল। কী গর্ব।"

জাহ্নবী বিছানায় উঠে বসে নলিনীর চিবুকে হাত দিয়েছিলেন। গাঢ় স্বরে বলেছিলেন, " কেন তোমার গর্ব হয়নি?"

নলিনী মুখ সরিয়ে লজ্জা পাওয়া গলায় বলল, "মোটেই না, একটা গুণ্ডাকে বিয়ে করলাম। পুলিশের সঙ্গে মারপিট করে!"

জাহ্নবী নলিনীর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলেছিলেন, "চিন্তার কী আছে? এখন তো আর মারপিট করছি না। আজকের রিসেপশনে তিন তিনজন পুলিশ অফিসার এসেছিলেন। তোমার সঙ্গে তো আলাপ করিয়ে দিলাম। আমাকে খুব খাতির করে। ভয় নেই নলিনী, ওরা আর মারবে না।"

আকাশ ইতিমধ্যে অনেকটা মেঘ সরিয়ে ফেলেছে। আরও অনেক কিছুর মতো এটাও প্রকৃতির মজার ব্যাপার। মেঘ জমেছে কাল গোটা রাত ধরে। একটু-একটু করে এসে আকাশ ছেয়ে ফেলেছিল। অথচ চলে যাচ্ছে কী দ্রুত! যেন অন্য কোথাও যাওয়ার ছিল, এখানে থমকে ছিল ভুল করে। এখন তাড়াহুড়ো করছে। রোদ উঠেছে বেশ।

গণেশ বলল, "জল গরম করি? স্নানটা সেরে ফেলুন।"

জাহ্নবী গণেশের দিকে না তাকিয়েই বললেন, "না, এখন নয়। আগে চুল কাটব। তুই বরং উপেনকে খবর দে। তুই নিজেই ছুটে চলে আয়।"

ছুটে নয়। সাইকেল নিয়ে গেল গণেশ। সেলুন ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছিল উপেন। জাহ্নবী পত্রনবিশ ডাকছে শুনে ফক করে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, "পারব না গণেশদা।"

"মানে! পারবি না কেন? দোকানে খদ্দের তো নেই।"

উপেন বিড়িতে লম্বা টান দিয়ে বলল, "বাড়ি গিয়ে আর কাজ করব না

ঠিক করেছি।"

গণেশ বলল, "গতবার তো গিয়েছিলি।"

"ওই শেষ। আর নয়। আমার কাছে যদি চুল কাটতেই হয়, জাহ্নবী পত্রনবিশকে সবার মতো সেলুন ঘরে আসতে হবে। আর পাঁচজনের সঙ্গে বেঞ্চে বসে অপেক্ষা করতে হবে। আমি কোথাও যাব না।"

গণেশ বলল, "কেন? যাবি না কেন?"

উপেন নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে বলে, "বারণ হয়ে গিয়েছে।"

"কে বারণ করেছে?"

উপেন বলল, "জানি না।"

গণেশ ভুরু কুঁচকে বলল, "এতদিন তো যেতিস।"

উপেন ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, "এতদিন তো আরও অনেক কিছু হয়েছে।"

"কী হয়েছে? মেজাজ দেখাচ্ছিস কেন?"

উপেন বলল, "কী হয়েছে জান না? মেজাজ তো তুমিই দেখাচ্ছ গণেশদা। বেশি কথা বললে, দোকানে এলেও, তোমার দাদার চুল কাটব না!"

গণেশ স্থির চোখে তাকিয়ে রইল উপেনের দিকে।

উপেন ঠোঁটের কোণায় বেঁকা হেসে বলল, "অমনভাবে দেখছ কেন? অবাক লাগছে? মনে হচ্ছে, এমন কখনও শোনোনি? তোমার দাদা আর তার দলবল দিঘির পাড়ের কত লোকের ধোপা-নাপিত বন্ধ করে দিয়েছিল, সে হিসেব আছে? একদিন এসো, মনে করিয়ে দেব।"

গণেশের খুব ইচ্ছে করছিল, এগিয়ে গিয়ে উপেনের গালে দুটো চড় কষাতে। ছোটলোকটার এত সাহস হয়েছে! নিজেকে সামলালো গণেশ। নিশ্চয় পিছনে কেউ আছে। বড় কেউ। জাহ্নবী পত্রনবিশকে গিয়ে কী বলবে? উপেন ব্যস্ত? নাকি দিঘির পাড়ের অবস্থা তার ভাল লাগছে না?



রেস্তঁরার গেট পর্যন্ত সমস্যা হয়নি। গেটের ভিতর পা দেওয়ার পর থেকে সমস্যাটা শুরু হল। অর্পণ বুঝতে পারল, তার নার্ভাস লাগছে। সে একটা ভুল করে বসেছে। আসাটা ঠিক হয়নি। নিজের ওপর একটু রাগও হতে শুরু করল।

কাচের গেটেই বলা ছিল। নাম বলতেই সুট টাই পরা একটি ছেলে এগিয়ে এসে টেবিল পর্যন্ত পৌঁছে দিল অর্পণকে। কোনার দিকে জানালার পাশে টেবিল। কাঁচা পাকা চুলের সৌম্যদর্শন মানুষটি চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। অর্পণ টেবিলের সামনে পৌঁছোতেই, তিনি উঠে দাঁড়ালেন। সুন্দর হেসে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

"গুড মর্নিং অর্পণ। আমি সুদর্শন জোয়ারদার, ফাদার অফ ঋতজা জোয়ারদার।"

অর্পণ লজ্জা পাওয়া গলায় বলল, "সরি, খানিকটা দেরি করে ফেললাম।"

সুদর্শন হেসে বললেন, "নো প্রবলেম। তোমাদের বয়সের ছেলেমেয়েরা আজকাল সবাই রাত জাগে। ফলে পরের দিনটা শুরু হতেই তাদের অনেক দেরি হয়ে যায়। সো পর পর লেট। রিয়ার অবস্থাই দেখ না, বাইরে গিয়েও সকালে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না। যাই হোক, বসো। সুপের অর্ডার দিই?"

বসার পর অর্পণ বুঝতে পারল তার রাগটা ধপ করে কমে গিয়েছে। মানুষটাকে যেমন ভেবেছিল, তেমন নয়। রিয়া যেমন বলেছিল, তেমনই। বেশ মাই ডিয়ার ধরনের। অবশ্য কর্পোরেটের উঁচু পদের লোকেরা অনেক রকম সাজতে পারে। ভদ্রলোক তাকে ডেকেছেন কেন? রিয়ার ব্যাপারে কিছু বলবেন সেটা বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু সেটা কী?

"আমি কিন্তু খুব বেশি খাব না।"

সুদর্শন হেসে বললেন, "খুব বেশি না খাওয়াই ভাল। তুমি যতটা পারবে খাবে। আমি কোনও জোরাজুরি করব না। ইনফ্যাক্ট, সেটা আমি পারিও না। রিয়ার মা এখানে থাকলে, সে অবশ্যই ঝামেলা পাকাত।"

আওয়াজ করে হাসতে-হাসতে ইশারায় বেয়ারাকে ডাকলেন সুদর্শন।

আজ এখানে আসার জন্য অর্পণকে যে কেউ চাপাচাপি করেছে এমন নয়। কাল সকালে সুদর্শন জোয়ারদার ফোন করাতে অর্পণ হকচকিয়ে যায়। নিজের পরিচয় দিয়ে ভদ্রলোক খুব স্বাভাবিক গলায় কথা বললেন। কে বলবে তার সঙ্গে এই প্রথম কথা হচ্ছে!

"কেমন আছ অর্পণ?"

অর্পণ প্রাথমিক বিস্ময় কাটিয়ে কথা বলতে গিয়ে খানিকটা আমতা আমতা করে ফেলেছিল, "ভাল আছি, আপনি কেমন আছেন?

"চমৎকার। ক'দিনের জন্য কলকাতায় এসেছি। আগামীকাল হাতে খানিকটা সময় আছে, কাল তুমি কতটা ব্যস্ত?"

এই প্রশ্নের জন্য অর্পণ একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। কী বলবে চট করে ভেবে নিতেও পারল না। খানিকটা হকচকিয়ে গিয়ে বলেছিল, "আমার তেমন কোনও কাজ নেই। শুধু সন্ধের পর একটা..."

সুদর্শন ভাবার সময় না দিয়েই বলেছেন, "না, না, সন্ধে পর্যন্ত তোমাকে আটকাব না। দুপুরে জাস্ট ঘণ্টাখানেক পেলেই চলবে। তোমার অনেক গল্প রিয়ার কাছ থেকে শুনেছি। ভাবছিলাম, মুখোমুখি যদি পরিচয় হত। এই ধরো কাল একসঙ্গে আমরা লাঞ্চ করলাম, অসুবিধে হবে? সেক্টর ফাইভের দিকটায় ভাল-ভাল রেস্তঁরা আছে।"

রিয়ার বাবার কছ থেকে দুম করে একেবারে লাঞ্চের নেমন্তন্ন আসবে, কল্পনা করতে পারেনি অর্পণ। আমতা-আমতা করে বলল, "লাঞ্চ? কালকেই?"

ওপাশ থেকে সুদর্শন রাশভারী অথচ সৌজন্যভরা গলায় বলেছেন, "নো প্রবলেম। তোমার অসুবিধে থাকলে বাদ দাও। আমরা নেক্সট টাইম কোনও সুযোগ এলে বসব। আমি তো মাঝে-মধ্যে কলকাতায় আসি।"

অর্পণ তাড়াতাড়ি বলেছিল, "না অসুবিধের জন্য বলিনি। বলছিলাম, রিয়া এলে একসঙ্গে না হয়...।"

সুদর্শন জোয়ারদার হো-হো করে হেসে ফেললেন, "ওহ্ ইউ আর ফিলিং শাই। আরে বাবা লজ্জার কিছু নেই ইয়ংম্যান। বরং এটাই বেটার। প্রথমবার তুমি, আমি চুপি-চুপি বসে যাই। রিয়া এলে আবার না হয় মিট করা যাবে। সে থাকলে তো প্রাণ খুলে গল্প করতে পারব না! আমার মেয়েকে তো তুমি চেনো। আমাদের প্রতিটা কথায় নাক গলাবে। এমনকী, ইচ্ছে মতো খেতে পর্যন্ত দেবে না। মেনু নিয়ে খিটিরমিটির লাগাবে। বাপি, এটা খেও না, বাপি ওটা খেও না!" কথা থামিয়ে আবার খানিকটা হেসে নিলেন ভদ্রলোক। বললেন, "জোকস অ্যাপার্ট, যদি কোনও কাজ থাকে, তোমাকে আসতে হবে না অর্পণ। আমাকে এই নম্বরে আজ রাতে একটা মেসেজ করে দিও। আমি সেইমতো প্রোগ্রাম অ্যাডজাস্ট করে নেব। সত্যি কথা বলতে কী, আমি তোমার সঙ্গে এমন কতগুলো কথা বলতে চাই, যেগুলো রিয়ার সামনে বলা যাবে না। দেখ, আসতে পার কিনা। টেনশন করার কিছু নেই।"

ফোন ছাড়ার পরও হতচকিত ভাবটা কাটতে সময় লেগেছিল অর্পণের। মানুষটা অদ্ভুত একটা খেলা খেললেন। সিরিয়াস একটা বিষয়কে হাসতে হাসতে বললেন। জরুরি কথাটা এনেছেন সবার শেষে। ভাবটা এমন ছিল যেন, ওটা কোনও বিষয় নয়। লাঞ্চটাই আসল। কথাটা কী? রিয়ার আড়ালে বলতে চাইছেন কেন? কথার বিষয় কি রিয়া? তাই হবে। যদি না যায়, কেমন হয়?

কাল দুপুরেই রিয়ার সঙ্গে কথা বলেছে অর্পণ।

"রিয়া, তোমার বাবা আমাকে ডাকছেন কেন?"

রিয়া আকাশ থেকে পড়ল। বলল, "বাপি তোমায় ডেকেছে নাকি! কই আমি তো কিছু জানি না। কবে ডেকেছে? কোথায়?"

"সে কী, তুমি জান না! উনি আমার মোবাইল নম্বর কোথা থেকে পেলেন?"

"আমি জানি না। নিশ্চয় কোনওভাবে জোগাড় করেছে। বাপির নেটওয়ার্ক বিরাট।"

অর্পণ বিরক্ত গলায় বলল, "ওর নেটওয়ার্ক বিরাট হলেও, আমি তো বিরাট নই। আমার ফোন নম্বর জোগাড় করাটা কঠিন।"

রিয়া একটু চুপ করে থেকে বলল, "তুমি কি আমাকে সন্দেহ করছ?"

"এর মধ্যে সন্দেহ করার কী আছে? কথাটা এভাবে নিচ্ছ কেন?"

"না, আমাকে চার্জ করছ তো, তাই বলছি।"

অর্পণ বলল, "চার্জ করলাম কোথায়? তোমার বাবা আমাকে লাঞ্চে ডেকেছেন, কথা বলবেন বলেছেন, তাই তোমাকে জিগ্যেস করছি। যদি মনে কর এটা অন্যায়, তা হলে আর করব না। মিটে গেল।"

রিয়া বলল, "তুমি যে কোনও বিষয় নিয়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া কর কেন? বাবা কথা বলতে চেয়েছে, তুমি যদি কথা বলতে না চাও বলবে না। ওর কাছে না গেলেই তো হল। আমি কী করব?"

অর্পণ মুখ দিয়ে বিরক্তির আওয়াজ করে বলল, "আমার ভয় করছে, তোমার বাবাও একই কথা বলবেন কিনা ভাবছি।"

"কোন কথা?"

"তুমি যা বলেছিলে। আমেরিকা চলে এসো। আমি একটা কিছু করে

দেব। তোমার বাবা মনে হয় তাই বলবেন। বলা যায় না, হয়তো এয়ারপোর্ট পর্যন্ত যাওয়ার জন্য ট্যাক্সি ভাড়া দিতে চাইবেন।"

রিয়া একটু চুপ করে থেকে বলল, "বাপির নামে এরকম ভাবে বলছ কেন? আমি এটা পছন্দ করছি না।"

"সরি।" অর্পণের গলায় হালকা ব্যঙ্গের ভাব।

রিয়া বলল, "আমি বুঝতে পারছি না, তুমি আমার প্রোপোজালটাকে অপমান হিসেবে কেন ধরে নিয়েছ?"

"অপমানের কথা অপমান হিসেবেই ধরতে হয়। এখানে ঠিকমতো কাজকর্ম পাচ্ছি না বলে তোমার কাঁধে চাপতে যাব?"

"কাঁধে চাপার প্রশ্ন উঠছে কেন? একটা ট্রাই করতে। এদেশে স্কোপ অনেক বেশি। আমিও সেট্‌ল করতাম। যাক, এই ডিসকাশনের আর মানে হয় না। আমি ঠিক করেছি, খুব দ্রুত এখানকার পাট চুকিয়ে দেশে ফিরে যাব। তবে সেটাও বছরখানেকের ব্যাপার। আশা করি, তার মধ্যে তুমি একটা কিছু করে নিতে পারবে। নেক্সট উইকে আমি কলকাতা যাচ্ছি। আই ওয়ান্ট টু স্টে উইথ মাই ফাদার। বাপির মন কেমন করছে। আমার মনে হচ্ছে, বাপি আমায় চাইছে। যাক, তুমি যদি বল, আমি বাপিকে এখনই ফোন করে বলছি, লাঞ্চের প্রোগ্রামটা যেন ক্যানসেল করা হয়।"

অর্পণ বলল, "প্লিজ রিয়া, এই বিষয়টা নিয়ে তুমি আর ওঁর সঙ্গে কথা বলতে যেও না। সেটা আমার পক্ষে একটা প্রেস্টিজের ব্যাপার হবে। যদি না যাই, নিজেই বলতে পারব। তোমার হেল্প লাগবে না।"

একটু চুপ করে থেকে রিয়া বলল, "অর্পণ তোমার যদি মনে হয় আমাদের সম্পর্কটা ম্যাচ করছে না, তুমি সরাসরি বলে দিও। অযথা ডিস্টার্বড হয়ে নিজের ক্ষতি কোরো না।"

অর্পণ ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ ফর অ্যাডভাইস।"

অর্পণ ফোন ছাড়ার পর পরই রিয়া দ্রুত হাতে তার বাবার নম্বর টেপে। সুদর্শন জোয়ারদার বজবজের অফিসে নিজের ঘরে বসেছিলেন। একাই বসেছিলেন। তার হাতে ছিল দ্বৈপায়নের দেওয়া এগারোজনের নামের তালিকা। এই তালিকা থেকে তিনি দু'জনকে আলাদা করেছেন, কার্তিক আর রামানুজ। দ্বৈপায়নের নোট অনুযায়ী এরা দু'জনেই অ্যারোগ্যান্ট। রগচটা টাইপের। আলাদা-আলাদা দুটো দলের ইউনিয়ন করে। এদের মধ্যে একজনের সঙ্গে কথা বলতে হবে। সেটা কে? কথা বলার দায়িত্ব কাকে দেওয়া ঠিক হবে? যদিও এখনও সময় আছে। এমন সময় মেয়ের ফোনে একটু চমকে ওঠেন।

"কী রে কোনও সমস্যা?"

"হ্যাঁ সমস্যা। তুমি অর্পণকে লাঞ্চে ডেকেছ?"

নরম চেয়ারে হেলান দিতে-দিতে সুদর্শন হেসে বললেন, "কেন, তুই কি মেনু ঠিক করে দিবি?"

"তুমি ওর নম্বর পেলে কেমন করে?"

"গোয়েন্দাগিরি করে।"

"আমাকে জানাওনি কেন? সেদিনই তো তোমার সঙ্গে অতগুলো কথা হল। আমার কলকাতার যাওয়ার দিন, ফ্লাইট, টিকিট, সব ঠিক হল। এই কথাটা একবার বললে না।"

মেয়ের উত্তেজনায় কোনওরকম গুরুত্ব না দিয়ে সুদর্শন বললেন, "আমার আর অর্পণের লাঞ্চের সঙ্গে তোর ফ্লাইটের কী সম্পর্ক? তাছাড়া তখনও তো ঠিক করিনি।"

রিয়া অভিমানী গলায় বলল, "যখন ঠিক করলে, তখন আমাকে বললে না কেন?"

"বলব না বলে।" কথাটা বলে জোরে হেসে উঠলেন সুদর্শন।

"বাবা, আমি কিন্তু হার্ট হয়েছি। অর্পণ আমাকে সন্দেহ করছে। ভাবছে আই অ্যাম উইথ ইট। তুমি আমার সঙ্গে কথা বলে ঠিক করেছ।"

সুদর্শন এবার গম্ভীর গলায় বললেন, "এটা তোমাদের সমস্যা। রিয়া, আমি অর্পণের সঙ্গে ক'টা কথা বলতে চাই। এটা আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। তোমার মা বেঁচে থাকলে, এই দায়িত্ব আমাকে পালন করতে হত না। সে-ই করত।"

"আমি যাওয়ার পর বললে হত না?"

"হত না, এমন নয়। কিন্তু আমি কথাগুলো তাকে একাই বলতে চাইছি যে মা। যদিও এখনও সে আমাকে জানায়নি কাল আসবে কিনা। তোকে কি কিছু বলেছে?"

রিয়া বলল, "না বলেনি। জানি না, যাবে কিনা। যদি যায়ও তুমি কিন্তু বোলো না এই বিষয়ে আমার সঙ্গে কথা হয়েছে। দুঃখ পাবে।"

সুদর্শন গাঢ় গলায় বললেন, "মা, তুমি কি জানতে চাও আমি তোমার বন্ধুর সঙ্গে কী কথা বলব?"

রিয়া এক মুহূর্ত থেমে থেকে বলল, "না চাই না।"

অর্পণ ঠিক করে ফেলেছিল আসবে না। রাত ন'টা নাগাদ 'সরি' লিখে একটা মেসেজ পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত বদল করল। সন্ধের মুখে মনে হল, ভদ্রলোক আসলে তাকে একটা ঝামেলায় ফেলেছেন। তিনি যদি জোর করতেন, বলতেন আসতেই হবে, তাহলে না যাওয়াটা সহজ হত। ইচ্ছাকৃত ভাবেই তিনি সেই কাজটা করেননি। ফলে নিমন্ত্রণটা এড়ানো কঠিন। সে ন'টার আগেই মেসেজ পাঠাল, "কাল লাঞ্চে আসছি।"

মেনু কার্ড এগিয়ে সুদর্শন বললেন, "কী খাবে?"

"আমার কোনও চয়েস নেই। আপনি যা বলবেন।"

"সে কী! বুড়োমানুষের সঙ্গে এক ডিশ?"

"সেটাই তো ভাল। সেফ।"

"এই বয়সে যদি সেফ খাবার খাও, আমার বয়েসে গিয়ে কী করবে? তখন তো শুধু দুধ-মুড়ি খেতে হবে!"

কথাটা বলে হাসতে লাগলেন সুদর্শন। অর্পণও হাসল। তবে সে সতর্ক। সুপ খেতে-খেতেই টুকটাক কথা শুরু হল। একেবারেই সাধারণ কথা। বেশিটাই নিজের কাজকর্ম সংক্রান্ত। গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রির সঙ্কট, ভবিষ্যৎ, বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে প্রতিযোগিতা। সেখানে লড়াই করে টিকে থাকার জ্যামিতি, এই সব।

"বুঝলে অর্পণ, আমাদের দেশ হল, রোটি কপড়া অউর মকান খোঁজার দেশ। কোটি-কোটি মানুষ এই তিনটে জিনিসের পিছনে ছুটছে। অথচ পকেটে পয়সা নেই। আবার এমনও হচ্ছে, পকেটে যেটুকু পয়সা আছে তাতে নেবার মতো সামর্থ্য নেই। বিদেশ থেকে যেসব কাপড়-জামা আসে তাদের বেশিটাই আকাশ ছোঁয়া দাম। গুটিকয়েক মানুষ নিতে পারে। আমরা যদি এ দেশের মানুষের সামর্থ্যের কথা ভেবে জামাকাপড় তৈরি করতে পারি, তা হলে প্রোডাকশন করে কুলকিনারা পাওয়া যাবে না। বিরাট বাজার পড়ে আছে।"

অর্পণ অনেকটা সহজ বোধ করতে লাগল। ভদ্রলোক সম্পর্কে যে-কঠিন মনোভাব নিয়ে সে এসেছিল, সেটা দ্রুত বদলে যাচ্ছে। রিয়া তার বাবাকে নিয়ে কিছু-কিছু গল্প করেছে। কিন্তু সেটাকে কখনওই খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখেনি। বাবার প্রতি মেয়ের ভালবাসা বেশির ভাগ সময়ই সীমা ছাড়ানো হয়। তার উপর মায়ের ভয়ঙ্কর মৃত্যু, নিজেও দূরে থাকে। সব কিছু মিলিয়ে আবেগটা বেশি। খাবার আসার পর, মানুষটা নিজের কথা বলতে শুরু করলেন।

"আমি যে কষ্ট করে বড় হয়েছি, এটা এমন কিছু নয়। বহু মানুষই কষ্ট করে বড় হয়েছে। তবে আমার কষ্টটা ছিল ইন্টারেস্টিং।"

অর্পণ অবাক হয়ে বলল, "ইন্টারেস্টিং কষ্ট!"

সুদর্শন জোয়ারদার হেসে বললেন, "অবশ্যই ইন্টারেস্টিং। কাজের জন্য তোমরা কী আর এমন পরীক্ষা দাও, হয় ইন্টারভিউ নয়, রিটন টেস্ট। আজকাল তো বাড়িতে বসেও চাকরির পরীক্ষা দেওয়া যায়। ফোনে ইন্টারভিউ হয়। তাই তো?"

অর্পণ ঘাড় কাত করল। ভদ্রলোকের গল্প বলার মধ্যে একটা মজার ব্যাপার আছে। নিজের কষ্ট নিয়েও রসিকতা করছেন।

"দাঁড়াও, একটা ঘটনা বলি। আমিও চাকরির জন্য কেমন পরীক্ষা দিয়েছিলাম, তার একটা মজার গল্প শোনো। নাও, আর একটু চিকেন নাও। একটু রাইস দিই?"

কথাটা বলে সুদর্শন নিজেই বাটি এগিয়ে দিলেন। অর্পণ তাড়াতাড়ি বলল, "আমাকে দিন, আমি নিজে নিচ্ছি।"

"আরে বাবা, একটু যত্ন না করলে মেয়ের কাছে বকুনি খাব। বলবে আমার বন্ধুকে ডেকে খাতিরযত্ন করলে না! রিয়া আর কিছু না পারুক, ভাল বকতে পারে।"

কথাটা বলে সুদর্শন আবার হেসে উঠলেন। অর্পণের মনে হল, মানুষটার প্রতি তার একটা ভাল লাগা তৈরি হচ্ছে। সে হাসিমুখে বলল, "আপনার পরীক্ষার গল্পটা বলুন।"

ন্যাপকিনে ঠোঁটের কোণ মুছে সুদর্শন গল্প বলতে শুরু করলেন।

"তখন কাজের জন্য পাগলের মতো ঘুরছি। ঘুরছি আর ধপাস-ধপাস করে এর তার পায়ে পড়ছি। নেতা, মন্ত্রী কাউকে বাদ দিচ্ছি না। সরকার, বিরোধী, নো বাছাবাছি। একজন বলল, জাহাজ আর ফ্যাক্টরিতে কাজ পাওয়ার চান্স বেশি। ওসব জায়গায় অনেক লোক লাগে। আমি বললাম, সাঁতার জানি না। আগে বরং ফ্যাক্টরিতে চেষ্টা করি। ফেল করলে, জাহাজে ট্রাই নেব। সেই লোক বলল, তুমি জাহ্নবীর কাছে যাও। আমি ফোনে বলে রাখব। ওর দল এখন সরকারে নেই ঠিকই, কিন্তু ও ইচ্ছে করলে তোমাকে একটা কোথাও ঢুকিয়ে দেবে। ব্যক্তিগত ভাবে ওর চেনাজানা অনেক।"

টেবিলে রাখা মোবাইলটা বেজে উঠল, সুদর্শন থামলেন। নম্বর দেখে ফোনটা কেটে দিলেন। অর্পণ বলল, "জাহ্নবী কে?"

সুদর্শন বললেন, "আমার পরীক্ষক। এগজামিনার। খোঁজ নিয়ে জানলাম পুরো নাম জাহ্নবী পত্রনবিশ। কলকারখানায় ঘুরে-ঘুরে পলিটিক্স করে। ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে কর্মী খেপায়। ঘেরাও, স্ট্রাইক, ভাঙচুরে ওস্তাদ। অল্প বয়েসে মারকুটে হিসেবে বদনাম করেছে। মালিকরাও ভয় পায়। আমি খুব আশা নিয়ে জাহ্নবী পত্রনবিশের কাছে পৌঁছে গেলাম। গিয়ে দেখি, ছোকরার সত্যি দাপট খুব। অনেকে ঘিরে রেখেছে। আমাকে বলল, কাজ একটা জোগাড় করা শক্ত নয়। তবে তার আগে পরীক্ষা দিতে হবে। আমি বললাম, কী পরীক্ষা? জাহ্নবী বলল, ভবিষ্যতে কতটা আমার সঙ্গে থাকবে, তার পরীক্ষা। পরীক্ষা কিন্তু কঠিন। রাজি আছ কিনা, ভেবে বলো। আমি হেসে বললাম, চাকরির জন্য কত পরীক্ষা দিচ্ছি, আর এটা পারব না? জাহ্নবী বলল, তাহলে কাল থেকে সকাল ন'টার মধ্যে চলে আসবে। এলে জানবে, কী করতে হবে। আমি কয়েকটা দিন দেখব। পরীক্ষায় পাশ করলে এক জায়গায় ঢুকিয়ে দেব। মাইনেপত্র খুব খারাপ হবে না। যদি চাও। কোয়ার্টার ম্যানেজ করে দেব। বিয়ে থা করেছ? আমি বললাম, না। জাহ্নবী বলল, ঠিক আছে। চাকরি পেলে করবে। কাল থেকে আসবে। নেতাদের বাড়ি, অফিসে হাজিরা দেওয়া, আমার কাছে কোনও ব্যাপার ছিল না। পরদিন গিয়ে দেখলাম, শুধু আমি নই, আমার মতো আরও আছে। কুড়ি-পঁচিশ জন তো হবেই। তারাও পরীক্ষা দিচ্ছে। কারও পরীক্ষা প্রায় শেষের দিকে, কেউ সবে শুরু করেছে। তবে একটা জিনিস দেখলাম ভাল, সকলেই কিছু-কিছু টাকা পায়। আমি ওদের সঙ্গে ভিড়ে গেলাম। শুনলাম, এরা হল জেটি।"

অর্পণ হাসিমুখে বলল, "জেটি! সেটা কী?"

"জেটি হল জাহ্নবী টিম। জাহ্নবীর নির্দেশ পেলেই এই টিম বেরিয়ে পড়ত। ঝাণ্ডা, ফেস্টুন গুছিয়ে চলে যেত বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে। সেখানকার শ্রমিকদের সঙ্গে মিশে গিয়ে প্রথমে স্লোগান-টোগান দিত, তারপর শুরু করত গোলমাল। গোলমাল কী হবে, জাহ্নবী পত্রনবিশের আগেই বলা থাকত। কোনও সময়ে শুধু হট্টগোল, কোনও সময় জানালা দরজার কাচ ভাঙা, কোনও সময় কারখানার সিকিউরিটিকে মারধোর, কোনও সময় ম্যানেজমেন্টকে ঘেরাও। ঘেরাওয়ের আবার শিফ্ট ছিল। ডে শিফ্ট, নাইট শিফ্ট। একটা ব্যাপারেই শুধু সতর্ক থাকতে হত, আমরা যে বাইরে থেকে যাচ্ছি, সেটা যেন চট করে বোঝা না যায়। কারখানার ওরিজিনাল লেবারদের মধ্যে আমরা ভেজালরা মিশে থাকতাম। জেটি কখন গোলমাল পাকাবে, সেটা ওরিজিনালদের দু'একজন জানত। আর জানত, ইউনিয়নের নেতারা। তাদের ইশারায় কাজ হত। পুলিশ-টুলিশ এসে গেলে, আগে পালাতাম।"

অর্পণ খাওয়া থামিয়ে অবাক হয়ে গল্প শুনছে। সুদর্শন জোয়ারদার হেসে বললেন, "আরে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে? খেতে-খেতে শোনো।"

অর্পণ ফিসফিস করে বলল, "অদ্ভুত তো, এরকমও হয়!"

সুদর্শন বললেন, "আমাকে প্রথম সাতদিন কাজ প্রায় কিছুই দেওয়া হয়নি। শুধু গেট মিটিংয়ে ভিড় বাড়াতাম। একদিন ইচ্ছাপুরের দিকে একটা ফ্যাক্টরিতে যাওয়ার সময় বলা হল, আজ তোমার কাজ আছে, সুদর্শন। ফ্যাক্টরির মেন গেট দিয়ে ঢুকলে দেখতে পাবে, ম্যানেজারদের অফিস। অফিসের সামনে সারি দিয়ে গাড়ি। মিটিংয়ে জাহ্নবীর বলা শেষ হলেই গোলমাল শুরু। তুমি গাড়ির কাচ আর হেডলাইটগুলো ভাঙতে থাকবে। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। কিন্তু ভয় পেলে চলবে না। বুঝতে পারলাম, আজই আমার আসল পরীক্ষা। আমি বেঁটেখাটো একটা লোহার রডের মাথায় ঝাণ্ডা লাগিয়ে নিলাম। ঠিক করলাম, এটা দিয়েই গাড়ি ভাঙব। কিন্তু গাড়ি ভাঙতে হল না।"

সুদর্শন থামলেন। জল খেলেন। অর্পণ গল্পের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে। তার তর সইছে না। সে বলল, "ভাঙতে হল না কেন?"

"গোলমাল শুরুর আগেই বিরাট পুলিশ ফোর্স এসে হাজির। এসেই মিটিংয়ের স্টেজটা দিল ভেঙে। তারপরই শুরু করল, লাঠি চালাতে। আমার যে যেদিকে পারলাম, ছুটতে শুরু করলাম। সেটাই নিয়ম ছিল। ভেজালদের আগে পালাতে হবে। জাহ্নবী বলে দিয়েছিল, ধরা পড়লে কিন্তু চিনতেও পারব না বাপু। হাজতে পচতে হবে।"

সুদর্শন থামলেন। বেয়ারাকে ডেকে দুটো আইসক্রিমের অর্ডার দিলেন। অর্পণ বলল, "তারপর?"

সুদর্শন হেসে বললেন, "তারপর আর কী, ছুটতে-ছুটতেই শুনলাম বোমা ফাটছে। রাতে জাহ্নবী টিমের একজন খবর দিল, বোমার ঘায়ে থানার ওসি হেভিলি ইনজিওরড। মর-মর অবস্থা। পুলিশ আমাকে খুঁজছে। আমি আকাশ থেকে পড়লাম, আমাকে খুঁজছে। আমি কী করেছি? পুলিশ আমার নামই বা জানবে কী করে? চাকরির পরীক্ষা দিতে গিয়ে এ কী ফ্যাসাদে পড়লাম রে বাবা! টিমের ছেলেটাই জানাল, ফ্যাক্টরির কয়েকজন লেবার নাকি আমার নাম থানায় বলে এসেছে। আমিই নাকি বাইরে থেকে এসে পুলিশকে বোমা ছুড়েছি। গোলমালের হোতা আমি। যারা আমার নাম দিয়েছে, তারা জাহ্নবী পত্রনবিশের ইউনিয়ন করে। পর দিন খুব সকালে আমি জাহ্নবীর সঙ্গে দেখা করলাম। জাহ্নবী বলল, কী করে তোমার নামটা পুলিশ জানল, তা তো বলতে পারছি না ভাই। না না, এটা ঠিক হয়নি। নিজেরা বাঁচতে গিয়ে ইনোসেন্টকে ফাঁসাবে কেন? ছি, ছি, খুব অন্যায় হয়েছে। তবে এখন তো আর কিছু করা যাবে না। তুমি বরং ক'টাদিনের জন বাইরে চলে যাও। ওসি যদি ফট করে মারা যায়, সমস্যা হবে। আরে বাবা, চিন্তার কিছু নেই। আমি তো রইলাম। এদিকটা ঠান্ডা হলে খবর দেব। চিন্তা কোরো না। ফোন নম্বর নিয়ে রাখ, দরকার হলেই ফোন কোরো। এখন পালাও বাপু। আমি দুপুরের ট্রেনে বরোদা রওনা দিলাম।"

গল্প শেষ হওয়ার পর সুদর্শন জোয়ারদার খানিকটা সময় চুপ করে থেকে বললেন, "গল্পটা তোমার কেমন লাগল?"

অর্পণ মাথা নামিয়ে নিচু গলায় বলল, "আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। আই কান্ট বিলিভ। মানুষ এতটা খারাপ হতে পারে!"

সুদর্শন জোয়ারদার চেয়ার হেলান দিয়ে বললেন, "আচ্ছা অর্পণ, ধরো জাহ্নবী পত্রনবিশ নামের লোকটার সঙ্গে আবার আমার দেখা হল, তখন আমি কী করব?"

অর্পণ মুখ তুলল। তার চোয়াল শক্ত।

"আপনি ওর কাছে জানতে চাইবেন, অবশ্যই জানতে চাইবেন, কেন সে আপনার এত বড় ক্ষতি করেছিল।"

"ক্ষতি কোথায়! উপকার বলো। ছেলেটা যদি সেদিন আমাকে ওভাবে বিপদে না ফেলত, তা হলে আজ কি আমি এই জায়গায় আসতে পারতাম? সারাটা জীবন আমাকে কোনও কারখানায় সামান্য চাকরি করতে হত। দয়া-দাক্ষিণ্যের চাকরি যেমন হয়। জাহ্নবীদের মতো খারাপ মানুষদের পিছনে ঝাণ্ডা হাতে ঘুরতে হত। রাজনীতির পরীক্ষা দেওয়া চাকরি, না ঘুরে উপায় কী? ইচ্ছে না হলেও ঘুরতে হত। ক্ষমতা বদলে আর একটা জাহ্নবী ধরতাম। আপত্তি করার সাহস পেতাম না। তারপর একদিন বয়স হলে অল্প ক'টা টাকা নিয়ে রিটায়ার করতাম। সেই অর্থে জাহ্নবী আমাকে উপকার করেছে।"

অর্পণ চুপ করে রইল। সুদর্শন হেসে বললেন, "যাক, আমার কথা বাদ দাও, এবার তোমার প্রসঙ্গে আসা যাক। তোমাকে কেন ডাকলাম সেটা বলি। খুব বেশি সময় নেব না।"

অর্পণ সুদর্শনের চোখের দিকে তাকাল। সে এতক্ষণ ভুলেই গিয়েছিল, মানুষটা তাকে 'জরুরি কথা' বলতে ডেকেছেন। নাকি গল্প বলে ইচ্ছে করে ভুলিয়ে রাখলেন এতক্ষণ?

সুদর্শন চেয়ারে হেলান দিয়ে স্বাভাবিক গলায় বলতে শুরু করলেন, "অর্পণ, আমার মনে হয় রিয়া আর তোমার সম্পর্কটা এখানেই শেষ করা ভাল। তুমি হয়তো ভাবছ, আমি আমার মেয়ের জন্য তোমাকে এই পরামর্শ দিচ্ছি। না, তা নয়, আমি তোমার কথা ভেবেই বলছি। হয়তো তুমি একদিন তোমার মনের মতো কাজ পাবে। কোনও একটা গ্রামের স্কুলে গিয়ে পড়াবে। আমি রিয়ার কাছ থেকে জেনেছি, এটাই তোমার স্বপ্ন। তোমার এই স্বপ্ন সত্যি হলে, রিয়ার কোনও অসুবিধে হবে না। তাকে আমি যতদূর জানি, সে কখনওই পাকাপাকিভাবে গ্রামে যাবে না। প্রথম প্রথম দু'একমাস গিয়ে যাওয়ার ভান করবে। তারপর নিজের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। রিয়া যা পড়াশোনা করছে, যা শিখেছে তাতে দেশে বা বিদেশে যথেষ্ট ভাল কোনও কাজ খুঁজে নিতে পারবে। আমার ধারণা, সে বিদেশেই কাজ নেবে।"

সুদর্শন জোয়ারদার থামলেন। অর্পণ স্তম্ভিত! এতক্ষণ যে মানুষটা তার সঙ্গে গল্প করলেন বন্ধুর মতো, যত্ন করে খাওয়ালেন সেই মানুষটা এসব কী বলছে? কোনওরকম প্রস্তুতি ছাড়া শত্রু হঠাৎ আক্রমণ করলে যেমন হয়, মার খাওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই!

সুদর্শন আবার বলতে শুরু করলেন, "একটা সময়ের পর থেকে তোমার মধ্যে একটাই ধরনের মানসিক জটিলতা তৈরি হবে, অর্পণ। মনে হবে, একটা বয়সে যে নীতি আদর্শের কথা ভাবতাম সেটা আসলে বোকামি ছিল। এ থেকেই জন্ম নেবে ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স। তুমি হতাশায় ভুগতে শুরু করবে। সেই সময়ে তোমার সামনে কোনও পথ খোলা থাকবে না, এমন নয়। অবশ্যই থাকবে। একটা নয়, দুটো অপশন থাকবে। এক নম্বর অপশন হল, গ্রামের স্কুল-টুলের ছেলেমানুষি অ্যাডভেঞ্চার ছেড়ে, নতুন কাজকর্ম জোগাড় করে তুমি রিয়ার কাছে চলে যাবে, সে দেশে বিদেশে যেখানেই হোক। আর একটাও হতে পারে। সেটা হল, রিয়াকে নিজের কাছে নিয়ে আসা। এক্ষেত্রে চাইলে আমি তোমাকে সাহায্য করব। রিয়াকে বোঝাব সে যেন তার স্বামীর কাছ থেকে এবং সুখে ঘর সংসার করে। কিন্তু সমস্যা কী

হবে জান অর্পণ?"

অর্পণের মনে হচ্ছে তার শরীরের ভিতর আগুন জ্বলছে। এত অপমান সে আগে কখনও সহ্য করেনি। সুদর্শন জোয়ারদার তার উত্তরের অপেক্ষা করলেন না। বললেন, "এই দুটোর যাই ঘটুক, কিছুদিন পরে মনে হবে, কাজটা ঠিক হয়নি। তখন তুমি এক ধরনের কঠিন অপরাধবোধে ভুগতে শুরু করবে। জীবনটাই নষ্ট হয়ে যাবে। সো ইটস বেটার... স্টপ ইট মাই সন। এখানেই থেমে যাও।"

সুদর্শন জোয়ারদার থামলেন। জলের গ্লাস তুলে চুমুক দিলেন।

অর্পণ ফিসফিস করে বলল, "আপনি কী বলছেন, ঠিক বুঝতে পারলাম না।"

সুদর্শন উঠতে-উঠতে বললেন, "বোঝার জন্য সময় নাও। টেক ইওর টাইম। তাড়াহুড়ো নেই। আমার মনে হয় না, কাজটা খুব কঠিন। প্রথম-প্রথম সমস্যা হলেও, পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। এই মুহূর্তে আমার এই পরামর্শ শুনে তুমি রেগে যাচ্ছ। সেটাই স্বাভাবিক। একটা সময় মাথা ঠান্ডা করে ভাবলে দেখবে, আমি ঠিকই বলছি। সবশেষে একটা কথা বলি, মাই সন। যতই আমার মেয়ে হোক, ঋতজার বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। কারণ সে খুবই বুদ্ধিমতী একটি মেয়ে। খুব বুদ্ধিমতী মেয়েরা ভুল যেমন বেশি করে, তেমন ভুল শুধরেও নেয় বেশি।"

চোখ মুখ লাল করে অর্পণ বলল, "সন্দেহ! কী সন্দেহ?"

সুদর্শন এই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে একটু হাসলেন। বললেন, "চলো, আমরা উঠি। আমি এবার অফিস যাব। তোমারও নিশ্চয় কাজ আছে। আমি কি তোমাকে কোথাও ড্রপ করে দেব?"

অর্পণ দাঁতে দাঁত চেপে বল, "না। থ্যাঙ্কস।"

রেস্তরাঁ থেকে বেরিয়েই সে বুঝতে পারল, তার অনেক কিছু বলার ছিল। কিন্তু আক্রমণের আকস্মিকতায় এতটাই হতভম্ব হয়ে পড়েছিল, যে কিছু বলতে পারেনি। মোবাইল বের করে দ্রুত হাতে রিয়ার নম্বর টিপল অর্পণ। দু'বারের চেষ্টাতেও লাইন পেল না। প্রায় এক ঘন্টা পর গড়িয়াহাট মোড়ে বাস থেকে নামার পর রিয়াই তাকে ফোন করল।

"কী হয়েছে?" রিয়ার গলা ঘুম জড়ানো।

"তুমি কবে আসছ?"

"নেক্সট উইকের টিকিট করেছি। কেন?"

ফুটপাথ ধরে অগোছালো হাঁটছে অর্পণ। মানুষের সঙ্গে ধাক্কা লাগছে। তার যেন নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই।

রিয়ার গলা ছেঁড়া-ছেঁড়া ভেসে এল, "বাপির কাছে গিয়েছিলে? কী বলল বাপি?"

অর্পণ একথার উত্তর দিল না। সে বলল অন্য কথা।

"রিয়া তুমি এলে আমরা বিয়ে করব। আমি সব ব্যবস্থা করে রাখব। ম্যারেজ রেজিস্ট্রারকে বলে রাখছি।"

"বিয়ে করব! কী বলছ অর্পণ? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে?"

অর্পণ উত্তেজিত গলায় বলল, "হ্যাঁ, তাই হয়েছে। তোমার বাবা কী মনে করেন? উনিই কেবল অডসের সঙ্গে ফাইট করেছেন? ওঁর মতো খারাপ সময় ফেস করিনি বলে আমরা কিছু নই? ফালতু? ভীতু? আমার স্বপ্নের কোনও দাম নেই?"

রিয়া উদ্বিগ্ন গলায় বলল, "মাথা ঠান্ডা কর। প্লিজ, মাথা ঠান্ডা কর, অর্পণ। বাপি কি তোমাকে খারাপ কিছু বলেছে?"

"আমার মাথা ঠান্ডাই আছে রিয়া। আমি প্রমাণ করে দেব, উনি যে সহজ হিসেবে আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করছেন, সেটা ঠিক নয়। জেনারেল ম্যানেজার উনি ওঁর জামা কাপড়ের কোম্পানিতে। আমাদের জীবনে নয়। তুমি বিয়ের জন্য মানসিক ভাবে তৈরি হয়ে আসবে। আশা করি, তারপর উনি বুঝতে পারবেন, ওর মেয়ে কতটা বুদ্ধিমতী।"

রিয়ার একই সঙ্গে খুব আনন্দ এবং খুব চিন্তা হচ্ছে। অর্পণ যে এভাবে হঠাৎ বিয়ের কথা বলবে, সে কল্পনাও করতে পারেনি। অর্পণ টেলিফোন কেটে দেবার পর রিয়া অনেকটা সময় ধরে কাঁদল।



"রবীন্দ্রনাথের গানে কোন ফুলের কথা সব চেয়ে বেশিবার আছে?"

প্রশ্নটা করে দেয়াসি মিটিমিটি হাসছে। যখনই সে প্রতীককে কোনওরকম টেনশন বা মন খারাপ করতে দেখে, তখনই সে নানা ধরনের অদ্ভুত-অদ্ভুত প্রশ্ন করে। হঠাৎ শুনলে মনে হয়, মজা করছে। আসলে দেয়াসির এটা একটা কায়দা। টেনশন, মন খারাপ কমানোর কায়দা। তার বিশ্বাস, মনখারাপ থেকে বাঁচার সহজ উপায় হল নতুন কোনও চিন্তার মধ্যে গিয়ে পড়া। সে বলে, "আমি এমন সব প্রশ্ন জানি যেগুলোর জবাব খুঁজতে গেলে মনখারাপ, টেনশন কিছু করার সময়ই থাকবে না। মাথার চুল ছিঁড়তে হবে।"

প্রতীক মাঝেমধ্যে বিরক্ত হয়। বলে, "এই ছেলেমানুষিগুলো এবার বন্ধ করবে?"

দেয়াসি বিরক্তি গায়ে মাখে না। বলে, "প্রশ্নের জবাব জান না সেটা বলো। আমার উপর রাগ করছ কেন?"

"উফ দেয়া। আমি একটা সমস্যার মধ্যে আছি।"

"আমিও একটা সমস্যার মধ্যে আছি। ক্যাটপট্রোফোবিয়া কাকে বলে, আমাকে এখনই জানতে হবে।"

প্রতীক বলে, " নেট খুলে দেখে নাও। আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন?"

দেয়াসি হেসে বলে, ঠিক আছে এটা না হয় নেট সার্চ করে দেখে নিচ্ছি। কিন্তু বাড়ির পুব দিকে কালো জামের গাছ পুঁতলে কী হয়, বলতে পারবে? দেখো তো তোমার নেট, সাইট, ফেসবুক বলতে পারে কিনা?"

প্রতীক হতাশ গলায় বলে, "দেয়া তুমি কিন্তু বানিয়ে-বানিয়ে যা খুশি বলে আমাকে ডিস্টার্ব করছ।"

"মোটেই যা-খুশি নয়। আমি বাস্তুর বইতে পড়েছি, বাড়ির পূর্বদিকে কালো জামের গাছ থাকলে জীবনে বন্ধুর সংখ্যা বাড়ে।"

প্রতীকও আর বিরক্তি ধরে রাখতে পারে না। হেসে ফ্যালে। বলে, "ঠিক আছে, তুমি বরং কয়েকটা কালোজামের চারা কিনে বাড়িতে যাও। যত খুশি বন্ধু বাড়াও। আমার বদলে তাদের নানা ধরনের উদ্ভট প্রশ্ন করে বিরক্ত কর। আমাকে এখন রেহাই দাও। আমি খানিকক্ষণ একা বসে চিন্তা করি।"

"ঠিক আছে রেহাই দিচ্ছি, তার আগে চট করে বলো দেখি, দইয়ের মালপোয়া কেন বিখ্যাত?"

"দইয়ের মালপোয়া। সে আবার কী?"

দেয়াসি ফিক করে হেসে বলে, "সে একটা খাবার। সুইট ডিশ।"

প্রতীক গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করে। বলে, "মালপোয়া যে সুইট ডিশের মধ্যে পড়ে, সেটা বুঝতে পারছি।"

"তা হলে তো তুমি বিরাট পণ্ডিত। নাও, এবার বলো এই খাবার কেন বিখ্যাত।"

প্রতীক সত্যি-সত্যি ভাবতে শুরু করল। দেয়াসি, তার সুন্দর চোখ দুটো নাচিয়ে বলল, "পণ্ডিতমশাই, জি কে-র বই কনসাল্ট করবেন নাকি? এনে দেব কয়েকটা?"

প্রতীক হাল ছেড়ে বলল, "জানি না। মনে হয়, খুব ভাল খেতে বলে বিখ্যাত।"

"হল না, ফেল। ঠিক আছে একটা হিন্ট দিচ্ছি। এটা খুব বিখ্যাত একটা বাড়ির রেসিপি। নাও, এবার তুমি কম্পিউটার হাতড়াও। আমি চললাম। উত্তর পেলে আমাকে জানিও। মেসেজ করলেই চলবে। ফোন করে সময় নষ্ট করতে হবে না।"

দেয়াসি চলে যাওয়া খানিকক্ষণ পর প্রতীক বুঝতে পারল, সে তার মন খারাপ অবস্থা থেকে কখন যেন সরে এসেছে। তার মাথায় এখন শুধুই ঘুরছে দইয়ের মালপোয়া, দইয়ের মালপোয়া, দইয়ের মালপোয়া... জিনিসটা ঠিক কী? কোনও বিখ্যাত বাড়িতে এই ধরনের মিষ্টি বানানো হত? হলে কোন বাড়ি? কোনও রাজাবাদশা? রাজাবাদশার নাম কী? প্রতীক কম্পিউটারের পর্দা থেকে জরুরি কাজ সরিয়ে গুগলে ঢুকে পড়ে। দ্রুত হাতে টাইপ করে— ডি ও আই...। মিনিটপনেরোর ব্যর্থ চেষ্টার পর একা-একাই হাসতে থাকে। দেয়াসি তার সব কাজ পণ্ড করে দিয়ে গিয়েছে। এমনকী মন খারাপটাও।

এখন মেয়েটা সেই চেষ্টা করছে। চেষ্টা করছে, প্রতীকের মনখারাপ সারাতে। সত্যি প্রতীকের মন ভাল নেই। শুধু তারই নয়, তার একধরনের দুশ্চিন্তা হচ্ছে। সে ল্যাপটপের সামনে থম মেরে বসে আছে। যদিও যুক্তি দিয়ে ভাবতে গেলে, খারাপ লাগার কোনও কারণ নেই। এটা একটা বানানো বিষয়। কয়েকদিন পর সবাই জানবে, এটা বানানো। তবু কেন জানি মনে হচ্ছে, সে যা করেছে, সেটা ঠিক করেনি।

আজও প্রতীক অফিস যায়নি। এই নিয়ে তিনদিন হল, সে বাড়িতে রয়েছে। তিনদিন, কেন পাঁচদিনই বলা উচিত। প্রথম দু'দিন বিকেলেই ফিরে এসেছিল। সে বাড়িতে বসে অফিসের কাজ করছে। তার সামনে সারাক্ষণ ল্যাপটপ খোলা। বাড়িতে বসে অফিসের কাজ করার বিষয়টা এখন নতুন কিছু নয়। একে বলে 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম'। ইয়ার এন্ডিং-এর সময় প্রতীককেও কয়েকদিন 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' করতে হয়। তখন অফিসে গিয়ে রোজকার হিসেব নিয়ে পড়ে থাকলে চলে না। সেই দায়িত্ব বাকিদের হাতে দিয়ে,

বাড়িতে বসে মাথা ঠান্ডা করে সারা বছরের রিপোর্ট তৈরি করে। প্রয়োজনমতো অফিস থেকে ডেটা চেয়ে নেয়। বেশিরভাগ সময়েই চাইতে হয় না। কোম্পানির সাইটে ঢুকে দেখে নেয়। যে কেউ অবশ্য সাইটের সব অংশে ঢুকতে পারে না। পারবেই বা কেন? কোম্পানির প্রোডাকশন বা সেলসের ডেটা তো সবার জানার জন্য নয়। বিশেষ করে অন্য কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে গোপন রাখতে হয়। শুধুমাত্র পাসওয়ার্ড দিয়ে ঢোকা সম্ভব।

এখন বছরের শেষের রিপোর্ট জমা দেওয়ার সময় নয়। তবে ছেলেকে বাড়িতে বসে কাজ করতে দেখে নলিনী অবাক হয়েছে। সেদিন অফিস যাওয়ার আগে ছেলের ঘরে এল।

"কী রে, আজও বেরবি না?"

প্রতীক মাথা নাড়ল। নলিনী ছেলের পিঠে হাত রেখে বলল, "রিপোর্ট? এখন আবার কীসের রিপোর্ট?"

প্রতীক টেবিলের উপর ল্যাপটপ রেখে কাজ করছে। অন্যমনস্ক ভাবে বলল, "ঠিক রিপোর্ট নয় মা।"

"তবে?"

প্রতীক মায়ের মুখের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে আবার মুখ ফিরিয়ে নিল। ল্যাপটপে খুটখাট করতে করতে বলল, "জি এম কলকাতায় এসে অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছেন। কাজটা কমপ্লিকেটেড। অফিসে হাজার ঝামেলা। ফ্যাক্টরির কমপ্লেক্সের মধ্যে অফিস হলে, ঝামেলা আরও বেশি। একটু পর পরই লোক এসে বিরক্ত করে। লেবাররাও আসে। ওদের বেশিরভাগই কম্পিউটার বিষয়টা এখনও কিছু বোঝে না। ঠান্ডা মাথায় কিছু করা মুশকিল। তাই বাড়িতে বসে এগিয়ে নিচ্ছি। দিন কয়েকের মধ্যে কাজটা করে ফেলতে হবে। জি এম ফিরে যাবার আগে দেখবেন।"

গলা শুনে নলিনী বুঝল, ছেলেটা টেনশনে আছে। নলিনী খুশি হল। কম বয়সে অফিসের কাজ নিয়ে টেনশন ভাল। জেনারেল ম্যানেজার নিজে অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়ার মানে কোম্পানি পছন্দ করছে। প্রতীক পছন্দ করার মতোই ছেলে। ঠান্ডা মাথার। অনেকেই বলে, নলিনী একা হাতে ছেলেটাকে ভাল মানুষ করেছে। যদিও নলিনীর আক্ষেপ রয়ে গিয়েছে। প্রতীক আরও লেখাপড়া করতে পারত।

প্রতীক ল্যাপটপ থেকে মুখ না তুলে বলল, "মা, রিটায়ার করতে তোমার আর কতদিন? তিন বছর? না সাড়ে তিন?

নলিনী চলে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল।

"হঠাৎ এই প্রশ্ন?"

"বলো না। তিন বছর, না?"

নলিনী ভুরু কুঁচকে বলল, "একটু বেশি। কেন?"

প্রতীক কাজ থামিয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমাকে যদি বলি, ভিআরএস নেবে?"

কাঁধের ব্যাগটা টেবিলের উপর রেখে নলিনী হেসে ফেলল। বলল, "সে কী রে! চাকরি ছাড়িয়ে দিতে চাইছিস কেন?"

"ছাড়বে কেন? ভিআরএস নেবে!"

"স্কুলের চাকরিতে অমন ভিআরএস হয় কিনা, জানি না। মনে হয় না হয়। হলেও, পেনশন-ফেনশনে সমস্যা হয় নিশ্চয়। কী ব্যাপার বল তো?"

প্রতীক আবার ল্যাপটপের পর্দার চোখ রেখে বলল, "মা, আমাকে মনে হয় বাইরে পাঠাবে।"

নলিনী উৎসাহ নিয়ে বলল, "তাই নাকি! আগে বলিসনি তো।"

"বলতাম, কিন্তু এই কাজটা..."

"কোথায় পাঠাবে? বিদেশে?"

প্রতীক বলল, "না, না, এখনই বাইরে নয়, চেন্নাইয়ের কাছে কোম্পানি নতুন ইউনিট খুলছে। ওখানকার আই টি সেকশনের ফুলচার্জ দিতে চাইছে।"

নলিনী উজ্জ্বল চোখে বলল, "বাঃ, খুব ভাল খবর। কবে যাবি?"

"সেসব ঠিক হয়নি। এখনই কাউকে বলতে যেও না। আগে হোক, কোম্পানি অ্যাকোমোডেশন দেবে বলেছে। তুমিও থাকতে পারবে। তুমি যাবে?"

নলিনী বলল, "দেয়াসিকে বলেছিস?"

"আবছা বলেছি। আগে তুমি কী করবে, ভেবে নাও। যদি না চাও, তাহলে অফারটা অ্যাকসেপ্ট করব না।"

নলিনী হাসিমুখে বলল, "খেপেছিস? তোকে অনেক বড় জায়গায় যেতে হবে। আমার জন্য থমকালে চলবে? একেই আমার জন্য অনেক ক্ষতি হয়েছে..."

প্রতীক বলল, "তুমি সময় নিয়ে ভেবে বলো মা। তিন বছর একা থাকতে পারবে? নাকি আমার সঙ্গে চলে যাবে? আমার মনে হয় চলে যাওয়াটাই ভাল। যাক, তুমি ভাব, তিন দিন সময় আছে। এর মধ্যে আমিও অ্যাসাইনমেন্টটা শেষ করি।"

তিনদিন কেটে গিয়েছে। প্রতীকের কাজও শেষ। হিসেবমতো কাজ শেষ হওয়ার পর তার খুশি হওয়ার কথা। কারণ তার প্রোগ্রাম নিখুঁতভাবে কাজ করেছে। ডেটা পেয়েই কম্পিউটার এক বছর পরের প্রজেকশন দেখিয়ে দিয়েছে। প্রতীকের মনখারাপের কারণ, প্রোজেকশন প্রোগ্রামটা তৈরি করে প্রথমেই সে এমন একটা কাজ করল, যেটা মিথ্যে। বজবজ ইউনিটের গত কয়েক বছরের তথ্য পরিসংখ্যান ঘেঁটে সে ডেটা তৈরি করেছে। সেই ডেটা নতুন তৈরি করা, প্রোগ্রামে ইনপুট হিসেবে ব্যবহার করে রেজাল্ট বের করেছে। প্রোজেকশনে দেখা যাচ্ছে, সেলসের অবস্থা ভয়াবহ। প্রতি সপ্তাহেই বিক্রি পড়ছে। স্টকে মাল জমা থাকছে। মাসতিনেক পর থেকেই গোটা ইউনিটের অবস্থা খারাপ হতে শুরু করবে। আট মাস পর থেকে লোকসানে চলা শুরু হবে। তখন অন্য ইউনিট থেকে ভর্তুকি আনতে হবে। তবে ভর্তুকি দিয়েও পরিস্থিতি সামলানো যাবে না। বছর কাটতে না কাটকে লোকসানের পরিমান জটিল জায়গায় গিয়ে পৌঁছবে। বজবজ ফ্যাক্টরি বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া অন্য কোনও উপায় থাকবে না। প্রোজেকশনে বেশ কিছু গ্রাফ, সঙ্গে বার ডায়াগ্রাম, পাই ডায়াগ্রাম, খানকতক টেবল দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে ছবি-টবি বসিয়ে, পাওয়ার পয়েন্ট প্রোজেকশনও করা যাবে। এই প্রোজেকশনে কারণ দেখা যায় না, শুধু ফলটা পাওয়া যায়।

দেয়াসি আজ সকালে ফোন করে বলল, সিনেমা দেখতে যাবে। সিনেমা দেখার পর রেস্তঁরা খাবে। রাস্তায় অনেকক্ষণ এলোমেলো হাঁটবে। পা ব্যথা হলে, বাড়ি ফিরবে।

প্রতীক বলল, "ছেড়ে দাও।"

দেয়াসি বলল, "কেন? তোমার কাজ শেষ হয়নি? আজ তো শেষ হবার কথা ছিল।"

"হয়েছে। তবে ভাল লাগছে না।"

দেয়াসি বলল, "আমার সঙ্গে বেরলেই ভাল লাগবে। চলো কোনও একটা হরর মুভি দেখতে যাই। সারাক্ষণ তোমার হাত ধরে বসে থাকব।"

প্রতীক ভারী গলায় বলল, "সিরিয়াসলি বলছি, ভাল লাগছে না। আজ আমাকে ছেড়ে দাও।"

আর্ট কলেজের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রী দেয়াসির বড় গুণ হল, সে প্রতীকের উপর জোর খাটায় না। জোর খাটানোর মতো আচরণ কখনও করে না প্রতীক। ইচ্ছাকৃতভাবে দুঃখ দিয়েছে, এমন ঘটনা মনে পড়ে না দেয়াসির। সে যখন বলে, ভাল লাগছে না, তার মানে সত্যি তার ভাল লাগছে না। এমন শান্ত, ভদ্র এবং স্পষ্ট কথার ছেলেকে প্রেমিক হিসেবে পেয়ে দেয়াসি শুধু খুশি নয়, গর্বিতও। সে এই মানুষটার সঙ্গে ঘর-সংসার করার স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকে। মাত্র দেড় বছরের আলাপ। সেটা ছিল এক রবিবারের বিকেল। কলেজের ছেলেমেয়েদের আঁকা ছবির এগজিবিশন চলছিল অকাদেমির গ্যালারিতে। সিনিয়রদের ছবিই বেশি। নিচু ক্লাসের কম জনেরই ছবি জায়গা পেয়েছে। দেয়াসির একটা ছবি রয়েছে। নিজের ছবি এগজিবিশনে আছে বলে খুব উত্তেজনা। সেজেগুজে ভলান্টিয়ার হয়েছে। প্রতীক যে এগজিবিশন দেখতে এসেছিল, এমন নয়। পিজি হাসপাতালে গিয়েছিল পরিচিত এক রোগী দেখতে। ভিজিটরস টাইমের দেরি ছিল বলে, আর্ট গ্যালারিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল এলোমেলো। নিজে তেমন আঁকতে না পারলেও, ছোট থেকেই তার আঁকাজোকায় ইন্টারেস্ট। হঠাৎই একটা ছবির সামনে থমকে যায়। সামান্য দূরে বুকে ব্যাজ ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দেয়াসিকে জিজ্ঞেস করেছিল, "এক্সকিউজ মি, কিছু মনে করবেন না, এই ছবিটা সম্পর্কে কি আপনাদের কাছে কোনওরকম লিটারেচার আছে?"

দেয়াসি একটু বিরক্ত হয়েছিল। মেয়ে দেখে গায়ে পড়া টাইপ লোক নয় তো? সে ভুরু কুঁচকে বলেছে, "কোন ছবিটা?"

"এই যে কম্পিউটার নিয়ে ছবিটা। মনিটর থেকে গাছের গুঁড়ি বেরিয়ে এসেছে, কি বোর্ড থেকে ডালপালা, মাউসের ওপর শিকড়...এই ছবিটার? এর অর্থ কী? আপনাদের কাছে লিটারেচার কিছু পাওয়া যাবে? আমি ছবিটা ঠিক বুঝতে পারছি না...! মনে হচ্ছে...আসলে আমার যা মনে হচ্ছে, আর্টিস্ট কি সেটা ভেবেই এঁকেছেন?" কথাটা বলে বোকা-বোকা হাসল তরুণটি। বলেছে, "কিছু মনে করবেন না, আমি ঠিক ছবির বোদ্ধা নই।"

দেয়াসি সামান্য চমকেছিল। মজাও পেয়েছে। চোখ-মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এই ছেলের ছবির বিষয় তেমন কোনও জ্ঞানগম্যি নেই। দেখতে ভাল লাগছে তাই ঘুরে-ঘুরে দেখছে। অথবা সময় কাটানোর অন্য জায়গা নেই। আর্ট গ্যালারিগুলোতে এরকম দর্শক অনেকেই আসে। কিন্তু তারা সকলেই বিরাট 'আর্টিস্ট-আর্টিস্ট' মুখ করে ঘুরে বেড়ায়। ছেলেটি 'ছবির বোদ্ধা নই' স্বীকারোক্তি তাই খট করে কানে লেগেছে। ভালও লেগেছে। আর্ট গ্যালারিতে ঢুকে 'ছবি বুঝতে পারছি না, বুঝতে চাই' বলার জন্য সাহস লাগে। 'বানানো

বোদ্ধা' না হয়ে একজন একটা ছবি সম্পর্কে উৎসাহী হয়ে মানে খুঁজছে, এটাই আসল।

দেয়াসি এগিয়ে এসে নিচু গলায় বলেছিল, "ছবির তো সেভাবে নির্দিষ্ট কোনও মানে হয় না। শিল্পী একরকম ভাবে আঁকেন, আমরা যারা দেখি নিজের-নিজের মতো ভেবে নিই। সরি, ছবিটির অর্থ সম্পর্কে আমরা আপনাকে কোনওভাবে সাহায্য করতে পারব না।"

প্রতীক এক দৃষ্টিতে ছবিটির দিকে তাকিয়ে থেকে আনমনে বলল, "আসলে আমি কম্পিউটার নিয়ে কাজ করি। ছবিটিতে কম্পিউটার আছে বলে ইন্টারেস্ট লাগল। ডোন্ট মাইন্ড।"

দেয়াসি হেসে বলল, "নো প্রবলেম।"

"আপনি আর্টিস্টকে বলবেন, বড় সুন্দর ছবি।"

"অবশ্যই বলব।"

এরপর দূর থেকে দেয়াসি তরুণটির দিকে নজর রাখে। ছেলেটি একবারের জন্যও তার দিকে তাকায়নি। কার্যত কারও দিকেই তাকায়নি সে। মন দিয়ে ছবির সামনে ঘুরেছে। গ্যালারি থেকে বেরনোর মুখে সবার অলক্ষ্যে দেয়াসি এগিয়ে যায়।

"শুনুন।"

থমকে দাঁড়ায় প্রতীক। অবাক হয়ে বলে, "আমায় বলছেন?"

দেয়াসি নিচু গলায় বলেন, "ওই ছবির আর্টিস্টের সঙ্গে আপনি যদি দেখা করতে চান, কাল বিকেলে আসতে পারেন।"

প্রতীক চিন্তিত মুখে বলে, "দেখা করতে পারলে খুবই ভাল হত। কারণ মনে একটা অশান্তি রয়ে গেল। কিন্তু আমি যে কাল আর আসতে পারব না। আমার কাজের জায়গা অনেক দূরে। সেই বজবজ। যাক, কী আর করা যাবে।"

দেয়াসি এক মুহূর্ত ভাবল। বলল, "আমি যদি আপনাকে তার মোবাইল নম্বরটা দিই?"

প্রতীক আগ্রহ নিয়ে বলল, "তা হলে তো খুব ভাল হয়। উনি কি আমার সঙ্গে কথা বলবেন? শিল্পীর কী নাম?"

দেয়াসি ঠোঁটের কোনায় সামান্য হেসে বলল, "দেয়াসি। দেয়াসি মজুমদার। নিন নম্বরটা লিখুন।"

টেলিফোনে গলা শুনে চিনতে পারেনি প্রতীক। চিনল মুখোমুখি দেখার পর। আলাপ হওয়ার বহু পরে দেয়াসি জানতে পেরেছিল, প্রতীক একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নেতার ছেলে।

"তুমি আমাকে বলনি তো!"

প্রতীক বলেছিল, "এটা বলার কী আছে? এটা কি কোনও পরিচয়?"

"বাঃ, তুমি এমন একজন মানুষের ছেলে, কথাটা বলবে না! আমাকে বাইরে থেকে শুনতে হল!"

প্রতীক মাথা নামিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে বলেছিল, "আমি তো তোমাকে বলেইছি, মা আর আমি আলাদা থাকি। ছেলেবেলাতেই আমার বাবা-মায়ের ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে। বলিনি?"

"বলেছ, কিন্তু ভদ্রলোকের নাম বলনি। যা-ই হোক, উনি তোমার বাবা শুনে ভাল লাগল।"

প্রতীক সামান্য হেসেছিল, "কী এসে যায়? যার সঙ্গে থাকি না, তার নাম বলে বেড়িয়ে লাভ কী? তিনি যতই ইম্পর্ট্যান্ট মানুষ হোন। এটা অসম্মানের। দু'জনের পক্ষেই অসম্মানের।"

দেয়াসি বলেছে, "সরি, আমি লাভ ক্ষতির কথা ভেবে বলিনি।"

"না, না, তোমার সরি বলার কিছু নেই। হঠাৎ জানলে তো এরকম মনে হওয়ারই কথা। যে মানুষটার নাম ঘন-ঘন খবরের কাগজে বেরয়, টিভির পর্দায় দেখা যায় আমি যে তারই পুত্র, এটা হঠাৎ জেনে তোমার চমকে যাওয়াটা অন্যায় কিছু নয়। হ্যাঁ দেয়াসি, জাহ্নবী পত্রনবিশ আমার বায়োলজিক্যাল ফাদার। আইন অনুযায়ী মায়ের সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে যাওয়ার পর উনি ইচ্ছে করলে, বছরের কিছুদিন আমাকে নিজের কাছে রাখতে পারতেন। আবার বড় হওয়ার পর ইচ্ছে করলে, আমিও তার কাছে গিয়ে কয়েকটা দিন থাকতে পারতাম। আমরা দু'পক্ষই কখনও তা করিনি। আর্থিক ভাবেও মানুষটার সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই। আমি তার কাছে মাঝেমধ্যে যাই, দেখা করি। অসুখ করলে খোঁজখবর নিই। মা-ও নেয়। কিন্তু গিয়ে থাকি না।"

দেয়াসি অনুতপ্ত হওয়া গলায় বলেছিল, "সরি, আমি তোমাকে আঘাত করার জন্য কিছু বলিনি প্রতীক।"

প্রতীক শান্ত গলায় বলেছে, "আমি জানি। তবু প্রসঙ্গটা যখন উঠল, তখন বাকিটাও শুনে রাখ। আমার মা যে কারণে বাবাকে ছেড়ে চলে আসে সেটা একটু অন্যরকম। এই অশান্তির কারণ ছিল, বাবার রাজনীতি। বাবা যে রাজনীতির পথ বেছে নিয়েছিল, মা সেটা মেনে নিতে পারেনি।"

দেয়াসি অবাক হয়ে গেছে, "মানে? মাসিমা অন্য মতে বিশ্বাসী?"

প্রতীক হেসে উত্তর দিয়েছিল, "না, তা নয়। মা রাজনীতি করত না। কিন্তু বাবাকে অল্প বয়সে পছন্দ করার একটা কারণ অবশ্যই ছিল রাজনীতি। পরে মায়ের মনে হল, বাবা যে পথে রাজনৈতিক জীবনযাপন করছে, সেটা খুব খারাপ। বিশেষ করে পাওয়ারে বসার পর। ভদ্রলোক নানা ধরনের অন্যায়ের কাজের মধ্যে জড়িয়ে পড়েন। অসৎ পথে নিজের এবং দলের জন্য টাকা তুলতে থাকেন। তার রাজনীতি কলকারখানার শ্রমিকদের জন্য, কিন্তু তিনি মালিকপক্ষের হয়ে কাজ করতেন। শ্রমিকরা তাকে বিশ্বাস করে ঠকেছে। এখানেই শেষ নয়, রাজনৈতিক ক্ষমতা জাহির করার জন্য জাহ্নবী পত্রনবিশের মতো নেতারা কলকারখানা বন্ধ করে দিয়ে বহু লোককে কর্মহীন করেছেন। মা এসব বিষয়ে আপত্তি তোলে এবং বলে একসঙ্গে থাকলে আমাকে মানুষ করা যাবে না।"

"অভিযোগগুলো সত্যি?"

প্রতীক অন্যমনস্কভাবে বলেছিল, "যখন অভিযোগগুলো এসেছিল, তখন আমি ছোট। ওসব বুঝতাম না। পরে খবরের কাগজে পড়েছি, লোকের মুখে শুনতাম...মা বলেছিল, ভিক্ষের পয়সায় বড় হওয়া যায়, অন্যায় আর বিশ্বাসঘাতকের উপার্জনে মানুষ হওয়া কঠিন। মায়ের মাইনেতেই বাড়ি ভাড়া নিয়ে থেকেছি, লেখাপড়া শিখেছি।"

দেয়াসি প্রতীকের হাত ধরেছিল। ফিসফিস করে বলেছিল, "ব্যস, আর নয়, আর জানতে চাই না, চুপ করো। প্লিজ়..."

দু'জনে চুপ করে রাস্তা দিয়ে হেঁটেছিল সেদিন। তখন আকাশে শেষ বিকেলের আলো। এই আলো গোটা দিনের ক্লান্তি, গ্লানি, মুছে নিতে চায়। কিছুটা পারে, কিছুটা পারে না। দুই তরুণ-তরুণী সেই আলো গায়ে মাখতে মাখতে চলেছিল। বড় সুন্দর লাগছিল তাদের। মনে হচ্ছিল, ফুরিয়ে আসা আলো তাদের দুঃখ কষ্টও মুছে দিচ্ছে।

প্রতীক সিনেমা দেখতে যাবে না বলার ঠিক এক ঘণ্টা পর চলে এসেছে দেয়াসি। নলিনী ততক্ষণে স্কুলে বেরিয়ে গিয়েছে। যাওয়ার আগে ছেলের কাছে এসেছিল।

"তোর সেই বসের কাজ হয়েছে?"

প্রতীক মুখ না তুলে বলল, "হ্যাঁ, কাল থেকে অফিসে যাব।"

নলিনী রাগ দেখিয়ে বলল, "কী সারাক্ষণ কম্পিউটারের দিকে তাকিয়ে কথা বলিস? মুখটা তোল। মুখ না দেখলে, কথা বলা যায়?"

প্রতীক মুখ বাড়িয়ে বলল, "নাও মুখ দেখো, এবার বলো।"

"আমি একটা ডিসিশন নিয়েছি।"

"বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে তো? আমি তোমাকে আজই রাতে জিজ্ঞেস করতাম।"

নলিনী বলল, "তুই চলে যা। তিনটে বছর আমি একাই থাকতে পারব। রিটায়ারমেন্টের পর, তোর কাছে চলে যাব। কত ছেলেমেয়ে তো দূরে দূরে যায়, বাবা-মা তো একাই থাকে। তুই তো তাও দেশের মধ্যে থাকবি, অনেকে হাজার-হাজার মাইল দূরে চলে যায়।"

প্রতীক নলিনীর দিকে একটু সময় চুপ করে তাকিয়ে রইল। নলিনী বলল, "কী হয়েছে? তাকিয়ে আছিস কেন?"

প্রতীক কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল। বলল, "না, তুমি স্কুল থেকে ফেরো, তারপর বলব।"

নলিনী এগিয়ে এসে ছেলের মাথায় হাত রাখল। ভুরু কুঁচকে বলল, "কী হয়েছে? কোনও সমস্যা? আমাকে কিছু লুকোচ্ছিস?"

নলিনীকে যে-কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে তাতে আলুথালু সাজে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়াটাই তার পক্ষে ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু নলিনী কখনও সেরকম করেনি। সব সময়ই সাজগোজের জন্য সময় নিয়েছে। রুচি, পেশা আর বয়সের সঙ্গে মানানসই করে শাড়ি পড়েছে। মুখে হালকা পাউডার, কোনও কোনওদিন কপালে ছোট একটা টিপ। বয়স অনুযায়ী শাড়ির রঙ বদলেছে, কিন্তু মলিন হয়নি। ভিতরকার ব্যক্তিত্বটা যতটা পারে ফুটিয়ে এনে, তবেই বাইরের মানুষের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু আচরণ বা কথাবার্তায় নয়, চেহারাতেও নিজেকে এমনভাবে রেখেছে, যাতে কেউ তাকে 'বিধ্বস্ত' বা 'বিপর্যস্ত' না ভাবে। শুধু বাইরে নয়, ভিতরেও নিজেকে পরিপাটি রাখতে চেয়েছে। এর ফলও পেয়েছে। জাহ্নবী পত্রনবিশের সঙ্গে ছাড়াছাড়ির পরে, তাকে কেউ করুণা দেখাতে পারেনি। না বাবা-মা, না কাজের জায়গা। জনার্দন মুন্সি মেয়েকে চিনতেন। জানতেন, সে যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটাই শেষ। তবু কথা বলেছিলেন, "যা করছিস, নিশ্চয়ই ভেবেচিন্তেই করছিস।"

"হ্যাঁ বাবা, ভেবেছি।"

"আমিও পার্টি লোকদের কাছ থেকে কানাঘুষো শুনি...জাহ্নবী নয়, অনেকের নামেই শুনি...তবে নিজের জামাই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না..."

"শুধু যে টাকাপয়সার গোলমালের কারণে আমি সরে আসছি, তা নয় বাবা, ওর কাজকর্মে একধরনের ক্রুয়েলটি তৈরি হয়েছে। নিষ্ঠুরতা। নির্লিপ্তভাবে মানুষের ক্ষতি করতে পারে। রাজনৈতিক বিরোধিতার কারণ হলে একটা অর্থ পাওয়া যেত, কিন্তু তা নয়। ব্যক্তিগত লাভ, ক্ষমতার অংশটাই বেশি। তার নাম দেওয়া হচ্ছে রাজনীতি।"

জগন্নাথ মুন্সি আহত গলায় বলেছিলেন, "পলিটিক্সটাই নিষ্ঠুর হয়ে গিয়েছে।"

"না বাবা, এটা পলিটিক্স নয়, পলিটিক্সের নামে এরা অন্য কিছু করছে। এই নিষ্ঠুরতার মাঝখানে প্রতীক বড় হলে, সে মানুষ হতে পারবে না।"

"তাও আর একটু ভাবলে পারতিস।"

নলিনী বলেছিল, "আর ভাবলে ভুল করে ফেলতে পারি। শুধু প্রতীক নয়, আমি নিজেও এটা মন থেকে মেনে নিতে পারছি না। যে মানুষটাকে বিয়ে করেছিলাম, সে মানুষটা পুরোপুরি বদলে গিয়েছে। আমি মানুষের ভিতরটাকেই ভালবেসেছিলাম। সেটাই যখন নষ্ট হয়ে গিয়েছে, থেকে লাভ কী?"

জগন্নাথ মুন্সি ছেঁড়া-ছেঁড়া ভাবে বলেছেন, "তোর মা বলছিল, একই বাড়ির মধ্যে তোরা যদি আলাদা থাকতিস..."

নলিনী সামান্য হেসেছিল। বলেছে, "এখনও তো আলাদাই থাকি। চেনা-জানা মানুষের কাছ থেকে তোমার জামাইয়ের এক-একটা অন্যায় শুনে লজ্জায় মাথা নেমে যায়। আমি না হয় সহ্য করে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেব। চোর-ডাকাতের বউরাও বেঁচে থাকে, কিন্তু তোমার নাতি কী শিখবে, বলতে পার? এক সময় তাকেও তো জানতে হবে, তার মা এইসব অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিল। মুখ বুজে মেনে নেয়নি। আজ থেকে দশ-পনেরো বছর পর ও যখন বড় হবে, দেখবে ওর বাবার নামে সবাই ছি-ছি করছে। তখন যদি বলে, তুমি কী করছিলে মা? বাবাকে বোঝাওনি কেন? কেন প্রতিবাদ করনি? আমি কী উত্তর দেব?"

জগন্নাথ মুন্সি মেয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে বলেছেন, "বোঝালেই পারিস। কথা বলেছিস?"

নলিনী সামান্য হেসেছিল, হতাশার হাসি। বলেছে, "যতদিন না এই নোংরামি ছেড়ে দূরে সরে যেতে পারবে, ততদিন বদলাতে পারবে না। বাবা, তুমি চিন্তা কোরো না, আমি যা ডিসিশন নিয়েছি, ভেবেচিন্তেই নিয়েছি।"

জগন্নাথ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, "তুই যা ভাল বুঝিস। তোরা কি এখানে এসে উঠবি?"

"না, বড়দার কাছে যাব। দাদার স্কুটারে ছেলের স্কুল যাতায়াত সুবিধে হবে। তারপর স্কুল বাস ঠিক করে দেব।"

পার্টি থেকে চাপ এসেছিল। প্রণয় সেন, আশুতোষ পালের মতো নেতারা নলিনীর সঙ্গে কথা বলেছিলেন, "এতে পার্টির ভাবমূর্তি নষ্ট হবে নলিনী। এমনিতেই অপোনেন্ট প্রতিদিন স্ট্রং হচ্ছে, হয়তো এটাকেও ইসু করবে। তুমি জাহ্নবীর সঙ্গে কথা বল, বললে আমরাও থাকব। তুমি পার্টির ঘনিষ্ঠ হয়ে যদি অপপ্রচারে কান দাও, তা হলে অন্যরা কী করবে? জাহ্নবী বলেছিল, "তুমি নাকি কয়েকটা ইনসিডেন্ট রেফার করছ? দেখ নলিনী, তোমার কাছে তো আমাদের লুকোনোর কিছু নেই। পার্টি চালাতে গেলে টাকাপয়সা লাগে। এখন আর আগের মতো বাড়ি-বাড়ি গিয়ে চাঁদা তোলার যুগ নেই। সুতরাং পদ্ধতি বদলাতে হয়েছে। আমরা ধনী মানুষের কাছ থেকেই টাকা নিচ্ছি। প্রয়োজনে চাপ দিতে হয়। সেই চাপ কখনও এক্সেস হয়ে যায়। আমরা কর্মী, লিডারদের ডেকে সতর্ক করি। তুমি তো সব জান।"

নলিনী হাত জোড় করে বলেছিল, "আমাকে মাপ করুন। তবে আমি এমন কিছু করব না যাতে অপোনেন্টের সুবিধে হয়।" কাজের জায়গাতেও নলিনী তার সম্পর্কে কৌতূহল নিজেই শেষ করেছিল। প্রথম দিকে কানাঘুষো কিছু কথা কানে আসার পর হঠাৎই একদিন টিচার্স রুমে বলে বসল, "এখন থেকে ছেলেকে নিয়ে আমি আলাদা থাকছি। আমি আর জাহ্নবী দু'জনে জয়েন্টলি কোর্টে সেপারেশনের জন্য অ্যাপিল করেছি। আশা করি, অল্পদিনের মধ্যে পেয়ে যাব। যেহেতু জাহ্নবী পত্রনবিশ একজন ইমপর্ট্যান্ট পার্সন সেহেতু এই বিষয়টা নিয়ে গুজব রটার সুযোগ খুব বেশি। কিন্তু ঘটনা সেরকম কিছু নয়। আশা করব, তোমরা বিষয়টা নিয়ে কোনওরকম গুজবে পার্টিসিপেট করবে না। আর যদি করো, তার দায় কিন্তু আমার নয়।" কথা বলে নলিনী স্মার্ট ভঙ্গিতে হেসেছিল।

নিজের বিবাহবিচ্ছেদ নিয়ে এত সরাসরি কথা! সকলেই অবাক হয়েছিল। নলিনী স্কুলে এসে স্বামীর বিষয়টা চিরকালই এড়িয়ে চলত। অত বড় নেতার স্ত্রী হলেও কখনও ভাঁট দেখায়নি। স্বামীর গাড়িতে স্কুলে আসেনি কোনওদিন। এলেও হয়তো অনেক দূরে নেমে পড়েছে। যে তাকে তোষামোদ করতে গিয়েছে, তাকেই এড়িয়ে গিয়েছে। বাড়াবাড়ি করলে অপমান করতে দ্বিধা করেনি। বছরকয়েক আগে হেডমিস্ট্রেস বদলাল। নতুন হেডমিস্ট্রেস জয়েন করেই টিচারদের রুটিন নিয়ে বসলেন। রুটিনে ক্লাস কম দিলেন নলিনীকে। রুটিন দেখেই নলিনী সোজা চলে গিয়েছিল ঘরে।

"কী ব্যাপার ম্যাডাম, বুধ আর শুক্র আমাকে দুটো করে অফ পিরিয়ড দিয়েছেন কেন?"

হেডমিস্ট্রেস বড় করে হেসে বলেছিলেন, "বসো নলিনী, চা খাবে? বাবুলালকে বলব?"

"বসার সময় নেই, ক্লাসে যাব। আমার রুটিনটা এরকম হল কেন জানতে পারি কি? মনে হচ্ছে, কোনও ভুল হয়েছে। আপনার চোখ এড়িয়ে গিয়েছে।"

হেডমিস্ট্রেস বলেছিলেন, "ভাল লাগল তুমি জিনিসটা খেয়াল করেছ বলে। চোখ এড়িয়ে যাবে কেন নলিনী? আমিই তো করেছি।" কথা শেষ করে আবার মুখ এঁটো করে মহিলা হাসলেন।

নলিনী অবাক গলায় বলেছে, "আপনার কথা মতো হয়েছে! সেকী! কেন? সবার যেখানে একটা অফ, সেখানে আমার পর-পর দুটো কেন।"

নতুন হেডমিস্ট্রেস খানিকটা আহ্লাদী গলায় বলেছিলেন, "আরে বাবা তুমি কি সবার মতো নাকি নলিনী? তোমাকে বাড়িতে কত বেশি পরিশ্রম করতে হয়। জাহ্নবীবাবু কত ব্যস্ত মানুষ। বাড়িতে লোকজন আসে। তোমাকেই তো সামলাতে হয়। হয় না? তার উপর উনি মিটিং-টিটিং করে অনেক রাতে বাড়ি ফেরেন। তোমাকেও জেগে থাকতে হয়। এই তো কাল না পরশুর পেপারে দেখলাম, কাঁকিনাড়া না কোন্নগরে উনি লেকচার দিচ্ছেন, পাশে চিফ মিনিস্টার। এত ঝামেলা সামলে, তুমি স্কুলে আস, আর আমরা যদি তোমাকে একটু রিলিফ দিতে না পারি, সেটা কি ঠিক? আগের বড়দি যেন কেন বিষয়টা বুঝতে পারেননি, তাতেই অবাক হচ্ছি।" এই পর্যন্ত বলে একটু থামলেন হেডমিস্ট্রেস। গলা নামিয়ে বললেন, "অ্যাই নলিনী শোনো, তোমার দাদা বলছিল, একদিন জাহ্নবীবাবুর সঙ্গে দেখা করবে, ওর অফিসে কী একটা ফাংশনে ওঁকে আনতে চায়।"

নলিনীর চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। হেডমিস্ট্রেসের টেবিলে দুটো হাত রেখে শান্ত গলায় বলেছে, "পার্টি মিটিংয়ে যেমন আমি লেকচার দিই না ম্যাডাম, আমার হাজব্যান্ড দেন, ঠিক তেমনই এই স্কুলে আমার হাজব্যান্ড পড়ান না, আমি পড়াই। সুতরাং তার পরিশ্রমের কারণে আমাকে বিশ্রাম দিতে হবে না। টিচাররা সকলেই জানে, জাহ্নবী পত্রনবিশের স্ত্রী হওয়ার সুযোগে আমি কখনও কোনওরকম অ্যাডভান্টেজ নিইনি। ভবিষ্যতেও নেব না। সুতরাং, আপনি দয়া করে আমাকে সবার মতো করেই রুটিন রাখবেন। আর হ্যাঁ, ওর সভাসমিতি যাওয়ার বিষয় টিফয়গুলোতে আমি কখনও ইন্টারফেয়ার করি না। পার্টি অফিসে যোগাযোগ করাটাই ভাল।"

নলিনী যখন কথাগুলো বলছিল, তখন পিওন বাবুলাল ঘরে ঢুকে হাতে খাতা নিয়ে দরজার কাছে মাথা নামিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলেও, তার কান দুটো খাড়া ছিল। পরে সে-ই গোটা স্কুলে ঘটনা রাষ্ট্র করে। তার কানে ঢোকা কথা আর পাঁচ কানে ছড়ায় দ্রুত। শুনে অন্য শিক্ষিকারা খুশি হয়েছিল, তবে আশ্চর্য হয়নি। নলিনীকে তারা চেনে। সে তার স্বভাব অনুযায়ী কাজ করেছে। অথচ মন্ত্রীদের পরিবার নিয়ে কত রকমই গল্প না শোনা যায়। কাগজেই কত কথা বেরিয়েছে। কোন এক মন্ত্রীর স্ত্রী নাকি সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশবেন বলে ট্রেনের সেকেন্ড ক্লাস কামরায় উঠেছিলেন। সাধারণের মতোই হকারের কাছ থেকে চা কিনে খেতে গেলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত 'সাধারণ' থাকতে পারলেন না। চায়ে চিনি বেশি হয়েছে বলে, হকাররের সঙ্গে মৃদু তর্কাতর্কির পরই ধৈর্য হারান। ভিতর থেকে 'অ-সাধারণ' মানুষটি বেরিয়ে আসে। চায়ের কাপ পাশে বসা সঙ্গীকে ধরতে বলে তিনি উঠে দাঁড়ান এবং হকারটিকে কষিয়ে চড় লাগান। হকারটি তেড়ে এলে সঙ্গীটি কোমর থেকে রিভলবার বের করে। কামরা জুড়ে তুমুল হট্টগোল শুরু হয়। জানা যায়, মহিলা একজন মন্ত্রীর স্ত্রী। সঙ্গীটি তাঁর সাদা পোশাকের দেহরক্ষী। পুলিশ এসে হকারটিকে 'চড় খাওয়ার অপরাধে' আটক করে। কাগজে বেরিয়েছিল, এতে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। সব হকাররা লাইনের ওপর বসে পড়ে ট্রেন অবরোধ করেন। তাদের দাবি, মন্ত্রীর স্ত্রীকে ক্ষমা চাইতে হবে। রেলের বড় বড় কর্তারা ছুটে এসে কোনওরকমে অবরোধ তোলেন। নলিনীর সঙ্গে মিশলে মনে হবে, এই ঘটনা সত্যি নয়, বানানো।

নলিনী স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ির কথা নিজের মুখে বলে দেওয়ায়, কানাঘুষো যে সঙ্গে-সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল, এমন নয়। তবে কমলো তো বটেই। মন্দার টেলিফোনে বলল, "তোর অমন নাটক করে বলাটা ঠিক হয়নি।" মন্দার আর নলিনী একই দিনে স্কুলে জয়েন করেছিল। বন্ধুত্ব বেশি। সম্পর্ক সহজ। মন্দার তাকে বকাবকিও করে।

নলিনী বলে, "নাটকের কী দেখলি! যেটা সত্যি, সেটাই বলেছি। বানিয়ে তো কিছু বলিনি।"

মন্দার বলে, "সব সত্যি বলাটাও এক ধরনের নাটক। তোর ব্যক্তিগত বিষয় ঘোষণা করার কী আছে? নিজেকে রসিকতা করা খুব বড় গুণ জানি, কিন্তু এটা রসিকতার করার মতো লাইট বিষয় নয়।"

নলিনী বলেছিল, "লাইট বা হেভির কিছু নেই। আড়ালে-আবডালে কথা হচ্ছিল, সেটা থামালাম।"

"কে বলল, থামালি? সবাই এখন আলোচনা করবে, কেন ডিভোর্স হল। এর মধ্যে কেউ বলতে শুরু করেছে, জাহ্নবীদা নাকি আবার বিয়ে করবে।"

নলিনী হেসে বলেছে, "কে কী ভাববে, সেটা বড় কথা নয়। আমি আমার পার্টটা গোপন রাখলাম না। যাদের সঙ্গে রোজ দেখা হবে, তারা যেন মনে না করে, এর মধ্যে কোনও লুকোচুরি আছে।"

"তা হলে তুই ডিভোর্স কেন করলি, সেটাও বলে ফেললে পারতিস। ঝামেলা মিটে যেত।"

"তুই রাগ করছিস মন্দার, কিন্তু পরে বুঝতে পারবি, কাজটা আমি ঠিকই করেছি। দু'দিন পরে এই বিষয়ে সকলের ইন্টারেস্ট নষ্ট হয়ে যাবে। ডিভোর্সি মহিলা নিয়ে এখন আর কেউ মাথা ঘামায় না।"

সত্যি 'ইন্টারেস্ট' কমল। মাসকয়েক পরে খবরের কাগজের এক সাংবাদিক ফোন করে বলল, "ম্যাডাম, একটা কথা ছিল।"

নলিনী অবাক হয়ে বলেছিল, "আমার সঙ্গে! কী ব্যাপার বলুন তো?"

"একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাইছিলাম। আপনার একটা ইন্টারভিউ নেব।"

নলিনী বিরক্ত, "কী বিষয়ে ইন্টারভিউ?"

"সেটা আমরা গিয়েই না হয় বলছি। টেলিফোনে তো সবটা বলা যায় না।"

রেগে গিয়েও নিজেকে সামলে নলিনী বলেছে, "দুঃখিত, আমি কোনওরকম ইন্টারভিউ দেব না।"

সাংবাদিক ওপাশে একটু চুপ করে থাকে। তারপর বলে, "দেখুন দিদি, আমাদের কাছে খবর আছে, নেক্সট ইলেকশনে আপনি জাহ্নবী পত্রনবিশের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছেন। আমরা এই বিষয়েই কথা বলতে চাইছি। এতে আপনারই পাবলিসিটি হবে।"

নলিনী ধমক দিতে গিয়ে থমকেছে। দাঁতে-দাঁত চেপে বলেছে, "ভাই, অনুগ্রহ করে এসব মিথ্যে কথা লিখবেন না। আমি রাজনীতির ধারকাছ দিয়ে কখনও যাই না, যাবও না। জাহ্নবী পত্রনবিশের সঙ্গে আমার সেপারেশনের পিছনে কোনও রাজনীতি নেই। ইটস কমপ্লিটলি পার্সোনাল ম্যাটার। প্লিজ এই বিষয়ে আমাক আর ডিস্টার্ব করবেন না।"

ফোন কেটে দিলেও, দুদিন পর খবরের কাগজের ভেতরের পাতায় খবর বেরল। ছোট খবর। শিরোনামের পাশে জিজ্ঞাসার চিহ্ন। "এবার কি জাহ্নবী পত্রনবিশ প্রাক্তন স্ত্রীর বিরুদ্ধে লড়বেন?" খবরের ভিতরে সারবত্তা কিছুই নেই। পড়লেই বোঝা যাচ্ছে বানানো। শেষে লেখা হয়েছে, "জাহ্নবী পত্রনবিশের সঙ্গে এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে, তিনি বলেছেন, আমি এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করব না। নলিনী মুন্সি অবশ্য সংবাদটিকে মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেন। তবে রাজ্য-রাজনীতিতে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে।"

সেদিন স্কুলে যেতে হিস্ট্রির ঈপ্সিতা চুপি-চুপি জিজ্ঞেস করেছিল, "হ্যাঁ গো নলিনীদি, সত্যি তুমি ইলেকশনে দাঁড়াচ্ছ?"

নলিনী একইরকম চুপি-চুপি ভঙ্গিতে উত্তর দেয়, "হ্যাঁ রে দাঁড়াচ্ছি। তুই আমার হয়ে ক্যাম্পেন করবি। রাজি তো?"

অন্য দিনের মতো আজও নলিনী সেজেগুজে বেরচ্ছে। ছেলের কথায় থমকে গেল।

"কী বলবি?"

প্রতীক শুকনো হাসল, বলল, "বললাম তো ফিরলে বলব। যাও তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

নলিনী অল্প চিন্তা নিয়েই বেরল। মোবাইলে দেয়াসিকে ধরল,"প্রতীকের কী হয়েছে?"

দেয়াসি অনুযোগের গলায় বলল, "কী জানি মাসিমা, বুঝতে পারছি না। দুদিন আগেই প্ল্যান করল, অফিসের কাজটা ঠিকমতো হলে বেরবে। একটু আগে ফোন করেছিলাম, বলল কোথাও যাব না। এদিকে আমি সব ফিক্সড করে রেখেছিলাম।"

নলিনীর সত্যি লেট হয়ে গিয়েছে। একটা ট্যাক্সি ডাকতে-ডাকতে বলল, "তুমি একবার গিয়ে কথা বলে দেখো তো। ওর মুখটা আমার কেমন যেন ভাল লাগল না। মন খারাপ মনে হল।"

দেয়াসি বলল, "আপনি চিন্তা করবেন না মাসিমা, আমি ঠিকই করে রেখেছিলাম, যাব।"

প্রতীক টেবিলে ল্যাপটপ খুলে স্যান্ডো গেঞ্জি আর পায়জামা পরে কাজ করছিল। অফিস যাওয়ার ব্যাপার নেই বলে আলস্যিতে তিনদিন দাড়িও কামায়নি। চুলে চিরুনি দিতেও ভুলে গিয়েছে। গালভর্তি হালকা দাড়ি আর এলোমেলো চুলে তাকে সুন্দর লাগছে। শুধু জাহ্নবী পত্রনবিশের লম্বাচওড়া চেহারা নয়, বড়-বড় চোখ দুটোও পেয়েছে প্রতীক। ডোরবেল বাজতে প্রথমটায় বিরক্ত হয়েছিল। এখন আবার কে এসেছে? সেলসম্যান? না চাঁদা? এখন তো চাঁদা-টাঁদার কোনও বিষয় নেই। দরজা খুলে দেয়াসিকে দেখে অবাক হল।

"তুমি!"

দেয়াসি প্রতীককে সরিয়ে ঘরে ঢুকে চোখ কুঁচকে বলল, "কেন তুমি কাকে এক্সপেক্ট করছিলে? আমার চেয়ে সুন্দরী কোনও বান্ধবী তোমার আছে বলে তো শুনিনি।" তারপর হেসে বলল, "চেহারার এ কী ছিরি করেছ? একমুখ দাড়ি! বেশ লাগছে কিন্তু। তরুণ বয়সের রবীন্দ্রনাথের মতো। দাঁড়াও এক স্কেচ করি।"

প্রতীক যেন লজ্জা পেল। দরজা আটকাতে-আটকাতে বলল, "দুর, কী যে বল। তুমি এলে কেন? আমি তো বললাম, বেরোব না।"

দেয়াসি কোনও উত্তর না দিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। সে এবাড়িতে স্বচ্ছন্দ। নলিনীর সঙ্গে তার সম্পর্ক সহজ। নলিনী তাকে 'পুত্রবধূ' হিসেবে মেনে নিয়েছে এবং তার সঙ্গে সেরকমই ব্যবহার করে। প্রতীককে বাদ দিয়েও, দু'জনের মধ্যে আলাদাভাবে যোগাযোগ আছে। বাড়িতে এলে দেয়াসি বেশ খানিকটা সময় নলিনীর সঙ্গে গল্প করে। ফোনেও কথা হয়। এমনকী দু'জনে শপিংয়েও বেরোয়। দেয়াসি রান্নাঘরে গিয়ে দু'কাপ চা করে আনল। একটা কাপ প্রতীকের টেবিলে রেখে, আর একটা হাতে নিয়ে এসে, খাটে পা ঝুলিয়ে বসল।

"একটা কাগজ পেন দাও, স্কেচ করব।"

এর মধ্যে প্রতীক পাঞ্জাবি গলিয়ে নিয়েছে। কিন্তু তাড়াহুড়োর কারণে গলিয়েছে উলটো। উলটো পাঞ্জাবির দেখে ফিক করে হাসল দেয়াসি। তারপর দুটো পা নাড়তে নাড়তে বলল, "আমি কেন ছুটতে-ছুটতে এলাম বল তো?"

ল্যাপটপে কাজ করতে-করতেই প্রতীক বলল, "আমাকে দেখতে এসেছ।"

"ঠিক বলেছ। প্রায় এক সপ্তাহ তোমার মুখ দেখা হয়নি। চোখ বুজে মুখটা মনে করার চেষ্টা করলাম। দেখলাম, না মনে পড়ছে না। তখন ভাবলাম, চলে যাই। তবে এখন দেখছি, গ্যাপটা দিয়ে ভালই হয়েছে, এই ক'দিনে তোমার মধ্যে একটা ইনটেলেকচুয়াল ভাব এসেছে। তবে শুধু যে তোমাকে দেখার জন্য এসেছি, তা নয়।"

প্রতীক হালকাভাবে বলল, "তা হলে?"

দেয়াসি কাপে চুমুক দিয়ে বলল "একটা প্রশ্ন ছিল।"

প্রতীক মুখ ফিরিয়ে বলল, "আবার শুরু করলে? এবার তোমার ওই উদ্ভট প্রশ্নের ঝুলি খুলবে তো?"

দেয়াসি এই কথায় কান দিল না। রবীন্দ্রনাথের গান আর ফুল নিয়ে সেই পুরনো প্রশ্নটা করে মিটিমিটি হাসতে লাগল। তারপর সত্যি-সত্যি টেবিল থেকে কাগজ পেন নিয়ে ঘষঘষ করে প্রতীকের মুখ আঁকতে লাগল।

"ভেবেছিলাম, তোমার সঙ্গে আজ দেখা হলে জিজ্ঞেস করব, কিন্তু দেখা যখন করবে না বললে, বাড়ি চলে এলাম। প্রশ্নটা টেলিফোনেও করতে পারতাম। কিন্তু তাতে একটা সমস্যা আছে। উত্তর না দিতে পেরে তোমার মুখটা কেমন হয়ে গিয়েছে সেটা দেখতে পেতাম না।"

"উফ দেয়াসি। তুমি থামবে?"

"থামব, আগে উত্তরটা দাও। আচ্ছা হিন্ট দিচ্ছি, প্রেমের গান লেখার সময় রবীন্দ্রনাথ এই ফুলটার কথা সব চেয়ে বেশিবার বলেছেন। মোট তেরো বার। বসন্তের বেলাতেও তাই।"

প্রতীক বলল, "দোহাই তোমায়। আমি পারব না। আমাকে ছেড়ে দাও। বাপরে, কোথা থেকে যে তুমি এসব কালেক্ট কর দেয়া! রবীন্দ্রনাথের গানে কোন ফুলের কথা সব চেয়ে বেশি আছে, এটা কোনও প্রশ্ন হল? কম্পিউটার ভেঙে ফেললেও উত্তর পাবে না।"

দেয়াসি আঁকা থামিয়ে ভুরু কুঁচকে বলল, "কেন হবে না? তোমার কম্পিউটার উত্তর দিতে পারবে না বলে?"

প্রতীক বলল, "তা নয়, কিন্তু প্রশ্নের তো একটা মাথামুণ্ডু থাকবে। যা খুশি দিয়ে তো আর প্রশ্ন হয় না।"

ছবির মুখে অগোছালো দাড়ি আঁকতে-আঁকতে দেয়াসি বলল, "মাথামুণ্ডু বলতে কী বলতে চাইছ? চাকরির পরীক্ষায় যেসব প্রশ্ন দেওয়া যাবে সেটাই শুধু প্রশ্ন? বাকি সব উদ্ভট? আমি যদি এইসব পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন করতাম তাহলে অবশ্যই এই প্রশ্নটা রাখতাম।"

প্রতীক হেসে বলল, "পরীক্ষা হলে আগুন জ্বলে যেত। খোদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এসে গান ধরতেন, আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো...।"

অতিরিক্ত উৎসাহে গলা ছেড়ে দু'লাইন গান গেয়ে ফেলল প্রতীক। গেয়েই আওয়াজ করে হেসে উঠল। হাসতে-হাসতে থমকে গিয়ে বলল, "এবার বুঝেছি।"

চায়ের কাপ সরিয়ে পিছনে এসে দাঁড়াল দেয়াসি। হাত বাড়িয়ে স্কেচ আঁকা পাতাটা প্রতীকের ল্যাপটপের কি বোর্ডের উপর রাখল।

"কী বুঝেছ?"

দেয়াসি হালকা সবুজ রঙের সালোয়ার কামিজ পরেছে। ওড়নাটা হলুদ। রঙ মিলিয়ে কানে বড়-বড় হলুদ পাথরের দুটো দুল পরেছে। ঘরের জানলা থেকে আসা আলোয় তাকে ঝলমলে দেখাচ্ছে। মেয়েটার চেহারায় একটা স্নিগ্ধ ভাব রয়েছে। চোখ দুটোয় রয়েছে এক ধরনের সারল্য। প্রতীক অবশ্য বলে, "তোমার চোখ দেখে যতটা সরল মনে হয়, তুমি মোটেও তা নয়।"

দেয়াসি প্রতীকের কাঁধে দুটো হাত রেখে বলল, "কী বুঝেছ?"

"বুঝেছি, তুমি চাইছ আমি আজও তোমার ফাঁদে পা দিই। উদ্ভট প্রশ্ন নিয়ে তর্কে জড়াই, কোন ফুল রবীন্দ্রনাথের গানে সব চেয়ে বেশিরভাগ আছে, তার উত্তর খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। সেরকম হলে, গীতবিতান নিয়েও বসে যেতে পারি। মন খারাপ, টেনশন সব চুলোয় যাক। তাই তো?"

দেয়াসি ঝুঁকে পড়ে প্রতীকের গলা জড়িয়ে গাঢ় স্বরে বলল, "এখনও চুলোয় যায়নি? স্কেচটা কেমন হয়েছে?"

"দশে দুই।"

"বেশ হয়েছে।"

প্রতীক দেয়াসির হাত ধরে এবার সিরিয়াস গলায় বলল, "সত্যি মনটা ভাল নেই দেয়া।"

"কী হয়েছে?" প্রতীকের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করল দেয়াসি।

প্রতীক এবার চেয়ারে ঘুরিয়ে দেয়াসির মুখোমুখি হল।

"ক'দিন ধরে এমন একটা কাজ করলাম, যেটা মিথ্যে, বানানো। কাজটা করার সময় খেয়াল করিনি, করার উৎসাহে করে গিয়েছি। কিন্তু শেষ হওয়ার পর নিজেকে ছোট মনে হচ্ছে।"

দেয়াসি চেয়ারের গায়ে আলতো করে হেলান দিয়ে বলল, "তুমি জানতে না?"

"অবশ্যই জানতাম। বস যখন অ্যাসাইনমেন্টটা দেন, তখনই বলে দিয়েছিলেন, এটা একটা ফলস প্রোজেকশন রিপোর্ট হবে। কোম্পানির কোনও ইউনিট যদি হঠাৎ লোকসানে চলে যায়, তখন কী করা উচিত, সেটা আলোচনা করতেই এটা মডেল হিসেবে ইউজ করা হবে।"

দেয়াসি কখনও প্রতীকের কাজে কৌতূহল দেখায় না। আজ বলল, "প্রোজেকশনটা কী?"

"একটা রিপোর্ট। প্রবাবেল রিপোর্ট বলতে পার। সেই রিপোর্টে দেখা যাবে, আমাদের বজবজের কারখানা এক বছরের মধ্যে বিপুল লোকসান করবে। যদিও এটা একেবারেই সত্যি নয়। আমাকে সব ডেটা ব্যাক ক্যালকুলেশন করে তৈরি করতে হয়েছে। আমারই তৈরি প্রোগ্রামে সেগুলো ফিট করে প্রোজেকশন নিয়েছি।"

দেয়াসি বলল, "বাপরে, তোমার মুখ দেখে আমি ভেবেছিলাম, কী না কী। কোম্পানি বলেছে লোকসান দেখাতে, তুমি দেখিয়েছ। তুমি তো নিজে কিছু করনি। এত কান্নাকাটির কী হয়েছে।"

প্রতীক বলল, "ঠিকই বলেছ, তবু নিজে যে-প্রোগ্রামটা তৈরি করেছি, সেটার শুরুটাই মিথ্যে দিয়ে করলাম, তাই মনটা খারাপ। শুধু মিথ্যে নয়, একটা বাজে জিনিস। একটা কারখানার ভরাডুবি হচ্ছে। কত লোক ওখানে কাজ করে বল তো!"

দেয়াসি ঝুঁকে পড়ে প্রতীকের চুল ঘেঁটে দিয়ে বলল, "এই যে সত্যিবাবু, তোমাকে না জানিয়ে যদি ম্যানেজমেন্ট এমন একটা কিছু করত, তা হলে না হয় তোমার দুঃখ পাওয়ার কারণ ছিল। তারা জানিয়েছে। রিপোর্টটা তো তোমাদের কোম্পানির ভাল কাজেই লাগবে।"

"জানি, তবু...।"

দেয়াসি চোখ পাকিয়ে বলল, "আবার তবু? আমার কোয়েশ্চন ব্যাঙ্কটা আবার খুলব নাকি? ঠিক আছে বল তো..."

প্রতীক তাড়াতাড়ি হাত জোড় করে বলল, "প্লিজ, আর নয়। তোমার প্রশ্ন শুনে-শুনে আমি এবার পাগল হয়ে যাব।"

দেয়াসি আঙুল তুলে বলল, "ঠিক আছে, তা হলে আগে বল, মন ভাল হয়ে গিয়েছে। বল আগে।"

প্রতীক চেয়ার ছেড়ে উঠে দেয়াসির মুখোমুখি দাঁড়াল। কাঁধে হাত রেখে বলল, "দেয়া, আমি ঠিক করেছি, প্রোমোশনটা নেব না।"

"ওমা, সে কী! চেন্নাইতে গেলে কত চান্স তোমার সামনে ওপেন হবে বল তো!"

"তার জন্য নয়, আমার এদের সঙ্গে কাজ করতে ভাল লাগছে না।"

দেয়াসি প্রতীকের কাছে সরে এল। শরীর দিয়ে শরীরে স্পর্শ করে বলল, "দুর বোকা, আগে একটা নতুন কাজ পাও, তারপর না হয় ছাড়বে। বাইরে গেলে বড় কাজ পাওয়ার সুযোগও বেশি হবে।"

প্রতীক দেয়াসিকে জড়িয়ে ধরে বলল, "আমি এদের কাছ থেকে কোনও রকম সুবিধেই নিতে চাইছি না। আমার কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছে। মনে হচ্ছে, এই প্রোজেকশন রিপোর্ট নিয়ে আমার কোম্পানি খারাপ কিছু করতে পারে। যদিও সেটা কী, আমার জানা নেই। হতে পারে, ফিনান্সিয়াল কিছু, হতে পারে গভর্নমেন্টের কাছ থেকে কোনওরকম সাবসিডি চাইবে। আমি ঠিক জানি না। তবে এটা জানি, আমি কোনও রকম ডিজঅনেস্টির মধ্যে যাব না। মাকেও আজ বলে দেব। আই লিভ দিস জব। মাসটা কমপ্লিট হলে ছেড়ে দেব। অসুবিধে তো কিছু নেই, অন্য জায়গায় অ্যাপ্লাই করব। ইনফ্যাক্ট আজ সকাল থেকেই নেট ঘাঁটছিলাম। এই কোম্পানি তো আহামরি এমন কিছু নয়, যে এখানেই সারা জীবন পড়ে থাকতে হবে।"

দু'জনেই খাটের উপর এসে বসেছে। দেয়াসি প্রতীকের গালে হাত রেখে নরম গলায় বলল, "তুমি ছেলেমানুষি করছ। একটা প্রফেশনাল কাজের মধ্যে অনেস্টি, ডিজঅনেস্টি, এই সব নীতিকথা খুঁজছ। বড় কোম্পানিতে অবশ্যই জাম্প করবে, কিন্তু সেটা ঠান্ডা মাথায় করতে হবে।"

দেয়াসির চিবুকে আঙুল বোলাতে-বোলাতে প্রতীক বলল, "আমি ঠান্ডা মাথাতেই বলছি দেয়া। আমার মা অনেস্টির প্রশ্নে সংসার ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল, আমার তৈরি মিথ্যে রিপোর্ট দেখিয়ে, কেউ সুবিধে আদায় করবে, আমি মেনে নিতে পারব না। আমি অ্যাসাইনমেন্টটা খানিকটা না বুঝেই নিয়ে ফেলেছিলাম। সেটা নিয়ে হা-হুতাশ করে লাভ নেই। কাজ যখন নিয়েছি, করেও দিলাম। কিন্তু এখানেই শেষ।"

"একটা কথা বলব?"

"কী কথা?"

দেয়াসি প্রতীকের মুখের কাছে মুখ এনে বলল, "যদি কথাটা পছন্দ হয়, তাহলে প্রাইজ দেবে তো? আদর করবে?"

প্রতীক বলল, "এই তো করছি।"

দেয়াসি হেসে বলল, "না, আরও বেশি। তুমি একটা কাজ করো, মিথ্যের সঙ্গে একটা সত্যি রিপোর্টও বানিয়ে ফেল।"

"সত্যি রিপোর্ট। মানে?"

দেয়াসি প্রতীকের হাতটা নিজের বুকের ওপর রেখে বলল, "তোমার প্রোগ্রামে সত্যি ডেটাগুলো ঢুকিয়ে সত্যি রিপোর্ট বানাও। ভবিষ্যতে তোমাদের ফ্যাক্টরির অবস্থা ঠিক কী হবে, সেই রিপোর্ট। তারপর দুটোই তোমার বসকে দিয়ে দাও। সত্যি আর মিথ্যে। তাহলে দেখবে, তোমার মন খারাপ ভ্যানিশ। পারবে না? সত্যি ডেটা তো তোমাদের আছেই। কতটুকু আর সময় লাগবে?"

প্রতীক দেয়াসিকে সরিয়ে ধড়ফড় করে দাঁড়িয়ে উঠল।

"এটা তো দারুণ বলেছ দেয়া। আইডিয়া হিসেবে ফ্যান্টাস্টিক। আগেরটার মতো মাথা ঘামিয়ে ব্যাক ক্যালকুলেশন করতে হবে না। সব রেডিই আছে, শুধু প্রোগ্রামে ফেলে দিলেই হবে। ম্যাক্সিমাম একদিনের কাজ। তারপর দুটো রিপোর্ট বসের টেবিলে নামিয়ে দেব... আমি মনের দিক থেকে অনেকটা রিলিভড হব। থ্যাঙ্ক ইউ দেয়া..." চকচকে চোখে বলল প্রতীক। বলেই ঘুরে গিয়ে টেবিলের দিকে এগোতে গেল। দেয়াসি খপ করে পাঞ্জাবিটা খামচে ধরল।

"আই পাঞ্জাবিটা সোজা করে পরো তো। কী পাগল সেজে আছ!"

প্রতীক বিরক্ত গলায় বলল, "ও কিছু হবে না। কে দেখছে? আছ তো শুধু তুমি। এবার তুমিও কেটে পড়ো। কাজ করতে হবে। হাতে সময় নেই। ভাগ্যিস, তোমার কথায় নেচে সিনেমায় চলে যাইনি।"

দেয়াসি ঠোঁট উলটে বলল, "বাঃ, আমি তোমাকে প্ল্যান দিলাম, আর আমাকেই তাড়িয়ে দিচ্ছ?"

প্রতীক ঘুরে দাঁড়িয়ে দেয়াসির থুতনি ধরে বলল, "ইয়েস ম্যাম দিচ্ছি।"

"ঠিক আছে যাচ্ছি, আগে একটা চুমু খাও। রেমুনারেশন।"

প্রতীক মুখ নিচু করে চুমু খেতে গেলে, জড়িয়ে ধরল দেয়াসি। হেঁচকা টানে খাটে ফেলল। কিছু বোঝার আগেই প্রতীক দেখল, সে শুয়ে আছে চিৎ হয়ে। তার বুকের ওপর দেয়াসি।

জানা সত্ত্বেও, প্রতীক অবাক না হয়ে পারে না। দেয়াসিকে দেখে কে বলবে, শরীরের ভালবাসাতে মেয়েটা এত পটু! ওর আঁকা ছবির মতোই

সুন্দর! প্রতীককে প্রায় কোনও উদ্যোগই নিতে হয়নি কখনও। আজও হল না। কখন যে জোগাড় হয়ে গিয়েছে চাদর, কখন যে পোশাক খুলে ছুঁড়ে ফেলেছে দূরে, জানতেও পারেনি! একটা সময় তৃপ্ত দেয়াসি তার কাঁধের ওপর চিবুক রেখে বলল, "চলো বিয়ে করি।"

দেয়াসির পিঠে হাতে রেখে প্রতীক বলল, "তোমার ছবি আঁকা?"

"কেন বিয়ের পর আঁকতে দেবে না?"

"না, তখন শুধু..." চুপ করল প্রতীক।

দেয়াসি হেসে বলল, "তখন শুধু কী?" প্রতীক উত্তর দিল না। দেয়াসির মুখ টেনে নিল।

চেয়েছিল লাঞ্চের পর, বেলা একটায়, কিন্তু পরদিন বিকেল চারটের আগে জেনারেল ম্যানেজারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেল না প্রতীক।

দুটো খাম ওঁর দিকে এগিয়ে দিতে সুদর্শন জোয়ারদার সামান্য ভুরু কুঁচকে বললেন, "হয়ে গিয়েছে! ভেরি গুড, কিন্তু দুটো কেন?"

"স্যার, একটা বানানো, অন্যটা সত্যি। শুধু বানানোটা করতে আমার ভালো লাগছিল না। যতই হোক, একটা নতুন প্রোগ্রামের শুরু। ফলস ডেটা দিয়ে হবে, এটা মেনে নিতে পারছিলাম না। তাই আমি..."

সুদর্শন জোয়ারদার একটু ভাবলেন। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, "ব্রিলিয়ান্ট!"

প্রতীক বলল, "স্যার, কম্পিউটারে দুটোই রইল। তবে পাসওয়ার্ড ছাড়া খোলা যাবে না। আমি পাসওয়ার্ড রিপোর্টের তলায় লিখে দিয়েছি। যতই হোক। প্রোজেকশন রিপোর্ট...সিক্রেসি শুড বি মেনটেন্ড।"

সুদর্শন জোয়ারদার উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন। উজ্জ্বল মুখে বললেন, "চমৎকার। ইউ গেট রেডি প্রতীক। বড় দায়িত্বের জন্য তৈরি হও। রিয়েল প্রোজেকশন রিপোর্টটা বানিয়ে, তুমি কাজ এগিয়ে রাখলে। দু'দিন বাদেই এটা তোমাকে বানাতে হত। আমরা ভাবছি, বজবজের এই ইউনিটে নতুন করে ইনভেস্ট করব। তোমার রিপোর্ট নিয়ে আমি মুম্বই চললাম। ব্যাঙ্কে দেব। ফাইনান্সিয়াল ইনস্টিটিউটগুলোর সঙ্গে কথা বলব। থ্যাঙ্ক ইউ প্রতীক। ওয়েল ডান। বাবার সঙ্গে দেখা হলে, অবশ্যই আমার প্রণাম জানিও।"

জিএম-এর ঘর থেকে বেরিয়ে প্রতীকের মনে হল, অনেকটা হালকা লাগছে। মিথ্যে রিপোর্ট তৈরির ক্লান্তি আর নেই। বরং লজ্জাই হচ্ছে। অহেতুক অনেক হাবিজাবি ভেবেছিল। সে এই কোম্পানিতে থাকুক বা না-ই থাকুক, সুদর্শন জোয়ারদার মানুষটাকে মনে থাকবে। বস হিসেবে মানুষটা অবশ্যই দারুণ। খুব উৎসাহব্যঞ্জক।



শেষ পর্যন্ত মেশিনের কার্তিক মোদককে বেছেছেন সুদর্শন জোয়ারদার। দ্বৈপায়নের লিস্টে কার্তিকের পাশে যে নোট আছে তার মানে দাঁড়ায়, লোকটি রগচটা এবং বোকা। ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হলেও তেমন পাত্তা পায় না। এই জায়গাতেই থমকে যান সুদর্শন। কেন পাত্তা পায় না? যথারীতি প্রতীকের মতো, এই খবরটাও দিতে পারেনি দ্বৈপায়ন। আমতা-আমতা করে বলে, "স্যার, আমি তো মাথা গরম জেনে নাম লিখেছি। যদি গোলমাল করানোর কোনও প্ল্যান হয়, সেই কারণে মাথা গরমের লোক। বাকিটা তা হলে খোঁজ নিচ্ছি।"

জানা গেল, ইউনিয়নের কাছে কার্তিকের গুরুত্ব না পাবার কারণ দুটি। প্রথমটি সাধারণ। এই লোক 'সুবিধাবাদী'। ঘন-ঘন মত পালটায়। বাইরে ক্ষমতার বদল দেখে ফ্যাক্টরির ভিতরে ইউনিয়ন বদল করেছে। অনেকেই এই কাজ করেছে। কিন্তু করেছে চুপচাপ। কার্তিক চেঁচামেচি, লাফালাফি করেছিল বেশি। আড়ালে সবাই হেসেছিল। তবে দ্বিতীয় কারণটা অন্যরকম। বছর আট আগের ঘটনা। কার্তিক তখন অন্য জায়গায় কাজ করত। সেখানকার কোনও একটা ইসুতে সে নাকি ম্যানেজমেন্টের হয়ে সওয়াল করেছিল। তখনই গায়ে 'ম্যানেজমেন্টের দালাল' ছাপ পড়ে যায়। কোম্পানি বদলালেও, সেই ছাপ এখনও মোছেনি।

সব শোনার পর সুদর্শন ঠান্ডা গলায় বললেন, "এই লোকের সঙ্গে আমি কথা বলব।"

দ্বৈপায়ন বলল, "ফ্যাক্টরি সুপারভাইজারের কাছ থেকে এখনই জেনে বলছি, ওর কখন ডিউটি। এখন হলে তো সমস্যাই নেই। ডেকে পাঠাচ্ছি।" একটু থেমে বলল, "একটাই খটকা আছে স্যার। সামান্য একজন মেশিনম্যান। জিএম ডাকছেন শুনলে, খবরটা চাউর হয়ে যাবে।"

দ্বৈপায়নের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সুদর্শন।

"আমার মনে হয়, তোমার নার্ভাস ভাবটা কিছুতেই যাচ্ছে না দ্বৈপায়ন। আর সেই কারণেই নানা ধরনের এলোমেলো জিনিস ভেবে ফেলছ। কী করে ভাবলে, এই ঘরে বসে আমি কার্তিকের সঙ্গে কথা বলব। আমি তাকে ফোন করব। তুমি শুধু তার ফোন নম্বরটা আমাকে জোগাড় করে দেবে।"

দ্বৈপায়ন বুঝতে পারল, আবার ভুল করেছে। সত্যি সে নার্ভাস। নার্ভাস না হয়ে উপায় কী? এত বড় একটা ইউনিট, এত মানুষ কাজ করে, সেটা হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া কি সহজ কথা? কীভাবে সম্ভব? এই ক'দিনে বস তার সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে কোনও কথা বলেননি। শুধু লিস্টটা রেখে দিয়েছেন। যেটুকু কথাবার্তা হয়েছে, সবটাই অন্য কাজের। বেশিটাই চেন্নাইতে নতুন ইউনিট সংক্রান্ত। একদিন সে নিজেই প্রসঙ্গটা তুলতে যায়। বস এড়িয়ে যান। দু'দিন আগে দিল্লি থেকে কয়েকজন হোমরা-চোমরা টাইপের লোক এসেছিলেন। সুদর্শন জোয়ারদার তাঁদের নিয়ে ফ্যাক্টরি, অফিস ঘুরিয়ে দেখান। পরের খবর রটল, বজবজ ইউনিটের মডার্নাইজেশন হবে। নতুন করে টাকা ইনভেস্ট হবে। সুট-টাই পরে যেসব লোক ঘুরে গেলেন, তাঁরা সম্ভবত ব্যাঙ্ক থেকে ইন্সপেকশনে এসেছিলেন। খোকনের মুখে খবরটা শুনে খুব অবাক হয়েছিল দ্বৈপায়ন। কোম্পানির বিষয় নিজে থেকে কৌতূহল দেখানো উচিত নয় বলে জিএমকে জিজ্ঞেস করতে পারেনি। অন্যদের সঙ্গে শুধু আলোচনাই করেছে।

সুদর্শন জোয়ারদার খানিকটা আলগোছে বললেন, "আচ্ছা, ওই প্রতীক ছেলেটার খবর কী? প্রতীক পত্রনবিশ?"

"স্যার শুনেছি, ক'দিন ছুটিতে গিয়েছিল। জয়েন করেছে। ছেলেটি চেন্নাই যাওয়ার ব্যাপারে কনসেন্ট জানিয়েছে স্যার।"

সুদর্শন সোজা হয়ে বসে বললেন, "ভেরি গুড। কাজও যেমন করতে হবে, ছুটিও নিতে হবে। আমি চাই তুমিও ক'দিন ছুটি নিয়ে নাও দ্বৈপায়ন। ছুটি নিয়ে, ফ্যামিলি নিয়ে কোথাও বেড়িয়ে এসো। এর পর কিন্তু আর সময় পাবে না। নতুন রেসপনসিবিলিটি নিয়ে পাগল হয়ে যাবে। সায়নবাবু তখন যাবেন আমার ওপর খেপে। তাই তো? বলবে, বাবাকে আটকে রেখেছে। আমার মেয়েও এরকম করত। কাজে গেলে বলত, অফিসের সবাইকে মারবে।"

কথাটা বলে জোরে-জোরে হাসতে লাগলেন সুদর্শন। অবাক হল দ্বৈপায়ন। এই সময় ছুটি! আমতা-আমতা করে বলল, "স্যার ছুটি না হয় পরে নেব। অনেক কাজ পড়ে আছে।"

সুদর্শন মাথা নাড়িয়ে বললেন, "নো। আমি তোমাকে ছেলের জন্মদিনে আটকে দিচ্ছিলাম, আমিই কমপেনসেট করে দিচ্ছি। আমি কোনও কথা শুনতে চাই না। তুই আজই ছুটির অ্যাপ্লিকেশন জমা দেবে। নইলে, আমি কিন্তু তোমার ছেলেকে ফোন করব। বলব, আমার কোনও দোষ নেই বেটা।" আবার হাসতে লাগলেন সুদর্শন। বললেন, "দ্বৈপায়ন, তুমি মনে হয় খানিকটা স্ট্রেসের মধ্যে চলে গিয়েছ। হুইচ ইজ নর্মাল। দিন দশেকের একটা ছুটি তোমার দরকার। ইউ নিড ইট। ও আর একটা কথা। এই ইউনিট বন্ধ করার বিষয়ে তোমার পার্ট শেষ। বিষয়টা নিয়ে তোমাকে আর মাথা ঘামাতে হবে না। শুধু কার্তিকের মোবাইল নম্বরটা জোগাড় করে দিও। দেখো নম্বর যেন ভুল না হয়। এবার তুমি নিশ্চিন্তে চেন্নাইয়ের জন্য রেডি হও। মাঝখানে শুধু টেন ডেজ রেস্ট।"

দ্বৈপায়ন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। মাথা থেকে বিরাট বোঝা নেমে গিয়েছে। খুব সিরিয়াস এবং বিচ্ছিরি একটা বিষয়ের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। সেখান থেকে বেরোতে পেরেছে। এবার ছুটি নিয়ে পালাতে হবে। নিজের ঘরে এসেই উপাসনাকে মোবাইলে ধরল।

"ব্যাগ গোছাও।"

উপাসনা চমকে উঠল, "ট্রান্সফার?"

"নো ম্যাডাম। হলিডে টুর। দশ দিনের ছুটি পেয়েছি।"

টেলিফোনের ওপাশে উপাসনা লাফিয়ে উঠল, "রিয়্যালি!"

"ইয়েস। খোদ জিএম দিয়েছেন। বড় দায়িত্ব নেবার আগে রেস্ট। কেমন?"

উপাসনা আহ্লাদী গলায় বলল, "তোমার জিএম মানুষটা খুব সুইট। আই লাভ হিম। বুবাইকে কেমন বার্থ ডে গিফ্‌ট পাঠিয়েছিলেন বল! এখন না চাইতে ছুটি! ভাবা যায় না।"

দ্বৈপায়ন হেসে বলল, "ভাবতে হবে না। কোথায় আর কবে যাবে, তুমি সেটা ভাব। টেন্টেটিভ ডেট বসিয়ে আমি এখনই অ্যাপ্লিকেশন জমা করছি। বাই উপাসনা।"

উপাসনার ফোন ছেড়ে এইচ আর ডিপার্টমেন্টে ফোন করল দ্বৈপায়ন। কার্তিক মোদকের ফোন নম্বর চাই।

দ্বৈপায়ন কাগজের টুকরোয় লিখে নম্বরটা দিয়ে যাওয়ার দশ মিনিটের মধ্যে সুদর্শন জোয়ারদার মেয়ের ফোন পেলেন।

রিয়ার গলা থমথম করছে, "বাপি, তুমি অর্পণকে কী বলেছ?"

এই ফোনের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন সুদর্শন। চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, "কেমন আছিস মা?"

"আমি কিছু বলব না। আগে বলো তুমি অর্পণকে কী বলেছ?"

সুদর্শন মেয়ের প্রশ্ন গ্রাহ্য করলেন না। আগের দিনের ঝিমিয়ে পড়া গলার সঙ্গে আজ মেয়ের গলার আকাশ-পাতাল তফাত। যেন টগবগ করে ফুটছে। মনে-মনে হাসলেন সুদর্শন।

"চুপ করে আছ কেন? বলো।"

সুদর্শন সামান্য হেসে বললেন, "কী এমন ঘটল যে, আমার মা এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছে?"

"তুমি হাসছ!" রিয়ার গলায় ঝাঁঝ।

"মুম্বইতে তোমার ফ্লাইট পৌঁছতে রাত হবে রিয়া। এয়ারপোর্টে আমি থাকব। আর ক'দিনের মধ্যে আমি কলকাতা থেকে চলে যাচ্ছি।"

রিয়া একই রকম রাগ করা গলায় বলল, "আমি মুম্বইতে নামব না। আমি আগে কলকাতায় যাব।"

সুদর্শন সহজ গলায় বললেন, "সমস্যা নেই। আমার অফিসের কাউকে বলে দেব। তোমাকে রিসিভ করে নেবে।"

"কোনও দরকার নেই। অর্পণ আমাকে নিতে আসবে। অনেক কথা হয়েছে, আগে বলো, তুমি ওকে কী বলেছ?"

সুদর্শন হেসে বললেন, "ওকে বেশি করে খেতে বলেছি। ছেলেটা খুব কম খায়। তোর মা বেঁচে থাকলে তো তার খুবই অসুবিধে হত দেখছি।"

"ঠাট্টা কোরো না বাপি। অর্পণ খুবই অপমানিত হয়েছে। তোমার সঙ্গে লাঞ্চ সেরে বেরিয়েই সে আমাকে টেলিফোন করে। আমি সেদিনই তোমাকে ফোন করতাম। কিন্তু তা হলে অর্পণকে ছোট করা হত। তুমি ভাবতে, সে আমাকে নালিশ করেছে। তাই আমি ক'টা দিন অপেক্ষা করলাম।"

"অপেক্ষা করে কোনও লাভ হয়েছে?"

রিয়া জোরের সঙ্গে বলল, "অবশ্যই লাভ হয়েছে। আমি ভেবেছিলাম, তোমাকে না জানিয়ে আমরা রেজিস্ট্রি করব, কিন্তু ভাবনা-চিন্তার পর আই হ্যাভ চেঞ্জড মাই মাইন্ড। তোমাকে লুকিয়ে আমি কখনও কিছু করিনি, বিয়েটাও করব না। বাপি, তুমি জেনে রাখো, আমরা খুব শিগগিরই বিয়ে করছি। তুমি ওকে এমন কিছু নিশ্চয় বলেছ, যে সে বিয়ের জন্য খেপে উঠেছে।"

সুদর্শন চুপ করে রইলেন। তার যে কী ভাল লাগছে! এত সহজে তার ঝাঁকুনি কাজ করবে, তিনি কল্পনাও করতে পারেননি। আন্দাজে ঢিল ছুঁড়েছিলেন। ঢিলটা সামান্য মাটির ডেলা ছিল না, কঠিন পাথরের ছিল। ভুল জায়গায় আঘাত করলে, বড় ধরনের গোলমাল হয়ে যেতে পারত। সব চেয়ে খারাপ হত, যদি যার উদ্দেশ্যে ঢিল ছোঁড়া, সে পাশ কাটাত। যদিও অর্পণের মতো সেনসিটিভ ছেলেরা এই ধরনের কাজ করবে না বলেই মনে হয়েছিল। এই সময় দাঁড়িয়ে যে-'গাধা' বলতে পারে, বাপ-ঠাকুর্দার মতো আমিও গ্রামে গিয়ে পড়ে থাকব, তার অতি তুচ্ছ অপমানও গায়ে লাগার কথা। শুধু এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করেই এত বড় সিদ্ধান্তটা সুদর্শন নিয়েছিলেন। অর্পণকে অপমান করতে হবে। ছোটখাটো অপমান নয়, অপমান হবে এমন ,যা তার অবসাদ, সমস্যা, গোঁয়ার্তুমি মুছে দেবে।

"আমি খুব খুশি হয়েছি মা, খুব খুশি হয়েছি।"

রিয়া কাঁদছে। কাঁদতে-কাঁদতে বলল, "তাহলে তুমি অর্পণকে দুঃখ দিয়েছ কেন? তুমি নাকি বলেছ, আমি তাকে বিয়ে নাও করতে পারি! সত্যি বলেছ?"

"হ্যাঁ সত্যি বলেছি। আমি ছেলেটাকে একটা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে বিচার করতে চেয়েছিলাম। তার আগে আমি ওকে নিজের গল্প শোনাই। নিজের পরীক্ষার কথা বলি। সে পরীক্ষা ছিল ভয়ঙ্কর। আমি পরীক্ষায় হেরে, কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম। অর্পণ হারল না। আমি তাকে দুঃখ দিয়ে দেখতে চেয়েছিলাম, সে তোমাকে দুঃখ দেয় কিনা। এখন বুঝতে পারছি দেবে না। এক সময়ে অর্পণের মতো আমিও কাজ খুঁজেছি। আমার কোনও স্বপ্ন ছিল না। ওর স্বপ্ন আছে, মা। সেই স্বপ্নটা হয়তো বোকার স্বপ্ন এবং হাস্যকর। কিন্তু স্বপ্ন তো! আমি ইচ্ছে করলে, তার এই স্বপ্ন সত্যি করার কাজে কিছুটা সাহায্য করতে পারতাম। কলকাতার কাছাকাছি কোনও পাড়াগাঁয়ে স্কুলে মাস্টারের চাকরি জোটাতে আমাকে কি খুব পরিশ্রম করতে হত? মনে হয় না। কিন্তু ওই ছেলে কারওর সাহায্য নেবার ছেলে নয়। রিয়া, যে মানুষটি তোমার স্বামী হতে চলেছে, সে একটা বোকা মানুষ, বাট হি হ্যাজ আ স্পাইন। কঠিন একটা মেরুদণ্ড আছে।"

রিয়া ওপাশে চুপ করে রইল। সুদর্শন বললেন, "কী রে, এবার একটু হাসবি তো?"

ঋতজা জোয়ারদার কয়েক হাজার মাইল দূর থেকে কাঁদতে-কাঁদতে বলল, "আমি হাসছি তো বাবা, তুমি দেখতে পাচ্ছ না?"

সুদর্শন ফিসফিস করে বললেন, "পাচ্ছি। পাচ্ছি, ডার্লিং।"

বজবজ থেকে ফেরার সময় অ্যাকাউন্টস ম্যানেজার গাড়িতে উঠতে চেয়েছিলেন। তার জরুরি কথা আছে। সুদর্শন জোয়ারদার বললে, "না, আজ আমি একা যাব।"

গাড়ি ছাড়তেই অলকার স্মৃতিতে মানুষটা ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

যারা ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করে, তারা সাধারণত ওষুধ সংগ্রহ করে দীর্ঘদিন ধরে। অলকা ওষুধগুলো কিনেছিল একদিনে। দোকানে-দোকানে ঘুরেছিল। তার কাছে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছিল। একই প্রেসক্রিপশন নানা জায়গায় দেখিয়েছিল। পূর্ব-দক্ষিণ খোলা ফ্ল্যাটে একই ট্যাবলেটের আলাদা আলাদা বিল পাওয়া গেল। লোকাল থানা থেকে পুলিশ এসেছিল, সুইসাইড নোটের খোঁজে। তার বদলে একই তারিখের অতগুলো বিল দেখে প্রথমে খানিকটা হকচকিয়ে যায়। পরে ভাবনা-চিন্তা করে বলে, "প্ল্যান প্রোগ্রাম করে নয়, কাজটা উনি হঠাৎ করেছেন বোঝা যাচ্ছে। ভেবেচিন্তে করলে অনেকদিন ধরে ট্যাবলেটগুলো জোগাড় করতেন। মিস্টার জোয়ারদার, আপনি কি এই বিষয়ে কিছু বলতে পারেন? আগের দিন কিছু হয়েছিল?"

বিধ্বস্ত সুদর্শন বলেছিলেন, "কী ধরনের হওয়ার কথা বলছেন?"

পুলিশ অফিসার ভদ্রলোক মার্জিত ভঙ্গিতে কথা বলছিলেন। টাকা পয়সাওয়ালা মানুষের সামনে পুলিশ সবসময়েই মার্জিত। অফিসার চারপাশ দেখে নিচু গলায় বলেছিলেন, "এই ধরুন কোনও রকম অশান্তি? আগের দিন রাতে বা দু'একদিনের মধ্যে? মনে পড়ছে কিছু? সরি মিস্টার জোয়ারদার, এটা জাস্ট একটা রুটিন ইনভেস্টিগেশন। আমাদের একটা রিপোর্ট জমা দিতে হয়। অবশ্য আপনি যদি বলতে না চান থাক। আমরা ম্যানেজ করে নেব। রিপোর্টে লিখব হঠাৎ মানসিক অবসাদে...এরকম তো আকছার হয়।"

পুলিশ 'ম্যানেজ' করে নেবে বলছে মানে 'টাকা পয়সা' চাইছে। সুদর্শন অন্যমনস্ক ভাবে মাথা নেড়েছেন। বিড়বিড় করে বলেছেন, "না, মনে পড়ছে না। আপনারা বরং বিষয়টা দ্রুত মিটিয়ে ফেলুন। আমার অফিসের ম্যানেজার আপনাদের সঙ্গে কথা বলে নেবে। যদি অনুমতি দেন, আমি উঠতে পারি।"

কথা শেষ করে সুদর্শন ড্রইংরুম ছেড়ে উঠে যান। পুলিশ অফিসারও গদগদ ভাবে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। "ম্যানেজার আপনাদের সঙ্গে কথা বলে নেবে" মানে টাকা পয়সা নিয়ে চিন্তা নেই। সুদর্শন অবশ্য সেদিন শুধু পুলিশ নয়, কারও সামনেই বসতে চাননি। অলকার মৃত্যুর ঘটনায় তিনি নিজেকে দায়ী করেছিলেন। বিষয়টা যে এত দূর গড়াবে, ভাবতেও পারেননি। ধরতেই পারেননি, অলকা আসলে এক ধরনের মানসিক ব্যাধির মধ্যে ঢুকে পড়ছে। সেই ব্যাধি জটিল। তাঁর উচিত ছিল, স্ত্রীকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া। উচিত ছিল, রিয়াকে সব জানানো। সেরকম হলে, রিয়া মাকে নিয়ে আমেরিকায় চলে যেত। সেখানে চিকিৎসা হত। মাঝখানে একবার ভেবেছিলেন, রিয়াকে ফোন করে বলেন, "তোর মায়ের মনে হচ্ছে কোনও সমস্যা হচ্ছে। তুই একবার কথা বল।" কিন্তু সেই ফোনটা করতে গিয়েও তিনি থমকে গিয়েছেন। অলকা যে ধরনের আচরণ শুরু করছিল, সেটা মেয়েকে বলা কঠিন। ঘটনাটা ঘটে যাওয়ার পর মনে হয়েছিল, কঠিন হলেও, ফোনটা করা উচিত ছিল।

মুম্বই থেকে অলকা সেবার কলকাতায় একাই এসেছিল। অলকার কলকাতায় একা আসা নতুন নয়। এর আগে বহুবার এসেছে। আত্মীয়স্বজনদের বিয়ে-টিয়ে থাকলে, এসে টানা থেকে গেছে। কেউ অসুস্থ হলে তাকে দেখতেও এসেছে। বাবা-মা বেঁচে না থাকলেও অলকার বাপের বাড়ির দিকের আত্মীয়স্বজন বেশির ভাগই কলকাতা অথবা তার চারপাশে থাকে। রিয়া যতদিন যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে পড়েছে ততদিন কোনও সমস্যা ছিল না। মা-মেয়ে ফ্ল্যাটে থাকত। রিয়া অলকাকে বলেছিল, "তুমি মুম্বইতে বাবার কাছে গিয়ে থাক, আমি এখানে একা থাকব। ইচ্ছে করলে হস্টেলেও চলে যেতে পারি।" অলকা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল। অলকার এই কলকাতা আসক্তি নিয়ে রিয়া তার বাবার সঙ্গে কম হাসাহাসি করেনি। আসলে বাইরে বাইরে থাকলেও অলকা কলকাতার পাট চুকোতে চায়নি কখনও। বরং বেশি করে আঁকড়ে ধরেছে। রিয়া বিদেশ চলে যাবার পর সুদর্শন বলেছিলেন, "ফ্ল্যাট বিক্রি করে দাও।" অলকা রাজি হয়নি। উলটে বাঁশদ্রোণীর কাছে পাঁচ কাঠা জমি কিনিয়ে রেখেছে। সেখানে নাকি বাড়ি হবে। সুদর্শনের আপত্তি ছিল। বাড়িটাড়ি আবার কী! এসব হ্যাপা কে সামলাবে? তাছাড়া বাড়ি করার

যদি খুব শখ থাকে মুম্বই আছে, বেঙ্গালুরু আছে। সেখানেও জমি পাওয়া যায়। রেডিমেড বাংলো পাওয়া যায়। চমৎকার-চমৎকার সব বাংলো। এনআরআই-রা কেনে। অলকা রাজি হয়নি।

"ওসব নয়, আমি নিজের পছন্দ মতো বাড়ি বানাব। শুধু কাঁড়ি-কাঁড়ি পয়সা খরচ করে, অন্যকে দিয়ে সাজিয়ে-গুছিয়ে দিলেই, ঘর সুন্দর হয় না। মায়া-মমতা লাগে। একমাত্র নিজে বাড়ি করলেই সেটা সম্ভব।"

সুদর্শন হেসে ফেলেছিলেন। বলেছিলেন, "দূর, এসব সেন্টিমেন্টের কোনও মানে নেই। আজকাল বাড়ি-টাড়ির কনসেপ্ট উঠে গিয়েছে। তবু যদি চাও, আমি আপত্তি করব না। তবে অন্য জায়গার কথা ভাব। কলকাতা বাদ দাও।"

অলকা মুখ বেঁকিয়ে বলেছিল, "তুমি চাইলে, গিয়ে অন্য জায়গায় থেকো। আমি কলকাতাতেই ফিরব।"

সুদর্শন অবাক হয়ে বলেছিলেন, "ফিরব মানে! কলকাতা আমার দেশ নয়। ওই শহরের জন্য আমার ছিটেফোঁটা অ্যাট্রাকশন নেই, অলকা। অপমান ছাড়া কলকাতা আমাকে কিছু দেয়নি। মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে আমাকে কলকাতা ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছিল। রিয়া পড়াশোনার একটা পার্ট ওখানে শেষ করেছে, ব্যস ফিনিশ।"

অলকা তবু বলেছিল, "সে তুমি যাই বলো, একটা সময়ের পর আমি ওখানেই থাকব।"

"একা থাকবে? আমি তো যেতে পারব না।"

অলকা বলেছিল, "আমি তো মুম্বই, বরোদা, কানপুর সব জায়গাতেই একা থাকি। তুমি তো সারাদিনই কাজ করো। কলকাতাতেও তাই থাকব।"

বিষয়টা নিয়ে আর কথা বাড়াননি সুদর্শন। আবার সেই জমি ব্যাপারেই অলকা এবার কলকাতায় এসেছিল। এটা বারাসতের কাছে। সেখানে নাকি পঞ্চাশটার উপর আমগাছ আছে। মুম্বইতে বসে অলকা এই আমবাগানের খবর পায়। সুদর্শন অবাক হন,"আমবাগান কিনে কী করবে?"

অলকা শান্ত গলায় বলেছিল, "কিছু করব না, এমনি কিনে রাখব।"

সুদর্শন শান্তভাবে বলেছিলেন, "তা বলে বারাসতে! মুম্বইয়ের কাছে একটা বাগান-টাগান দেখলে হয় না? বা ফার্ম হাউজ়?"

"না, যদি পছন্দ হয়, ওটাই নেব। আমি কলকাতায় যাচ্ছি। মাসির ওখানে অনুষ্ঠান আছে। শুভর ছেলের অন্নপ্রাশন। একেবারে জায়গা দেখে আসব।"

"রিয়াকে বলেছ?"

অলকা কঠিন গলায় বলেছিল, "কেন? সে কি আমেরিকা থেকে এসে আমার সঙ্গে বারাসতে জমি দেখতে যাবে?"

সুদর্শন বুঝেছিলেন, এই বিষয়ে অলকা কোনও আলোচনা চাইছে না। তিনি বলেছেন, "আমি কি ওখানকার অফিসের কাউকে তোমার সঙ্গে যেতে বলব?"

থমকে গিয়েছিল অলকা। আশ্চর্যভাবে চোখ মুখের চেহারা বদলে যায় তার। কিছুক্ষণ চুপ করে তাকিয়েছিল স্বামীর দিকে। তার পর বলেছিল, "কেন? তোমাদের অফিসের লোক যাবে কেন? এটা তো অফিসের কোনও ব্যাপার নয়, ব্যক্তিগত জমি। নাকি অন্য কোনও কারণ আছে?"

সুদর্শন নার্ভাস হেসে বলেছিলেন, "অন্য আবার কী কারণ! তুমি একা যাবে, তাই বলছিলাম। জাস্ট একজন সঙ্গী।"

অলকা ভুরু কুঁচকে বলেছে, "তুমি আমার পিছনে লোক লাগাতে চাইছ?"

সুদর্শন মুখ দিয়ে আওয়াজ করে বলেছিলেন, "এসব কী বলছ অলকা! তোমার পিছনে লোক লাগাব কেন?"

অলকা বলল, "কেন লাগাবে তুমি জান। নিশ্চয় কোনও কারণ আছে।"

সুদর্শন গলায় জোর এনে বলেছেন, "ছি, ছি, ক'দিন ধরেই তুমি এসব উদ্ভট কথা বলছ। সেদিনও অফিস থেকে ফেরার পর বলেছিলে, আমি নাকি..."

অলকা চোখ মুখ কঠিন করে বলেছিল, "ঠিকই বলেছিলাম। তুমি তোমার পি এ মেয়েটার সঙ্গে ফস্টিনস্টি কর না?"

সুদর্শন ধমক দিয়ে উঠেছেন, "শাট আপ অলকা। ইউ আর ক্রসিং দ্য লিমিট। তুমি কি পাগল হয়ে গেলে!"

অলকা এক পা এগিয়ে এসে হিসহিসিয়ে উঠেছে, "ধমক কাকে দিচ্ছ? কানপুরেও তোমার কেউ আছে। সেখানে ঘন-ঘন যাও কেন?"

সুদর্শন আকাশ থেকে পড়ে বলেছেন, "কী বলছ অলকা! শুধু বলছ না, সেদিন তুমি হিতেশকে অফিসে ফোন করে জিজ্ঞেস করেছিলে, আমি কার সঙ্গে গুয়াহাটি গিয়েছি? করোনি?"

"বেশ করেছি। তুমিই বল না কার সঙ্গে গিয়েছিলে? না গেলেও, ওখানে নিশ্চয় কাউকে জুটিয়েছিলে। বুড়ো বয়েসে নোংরামি করতে লজ্জা করে না?"

সুদর্শন কী করবেন, কী বলবেন বুঝতে পারেননি। সপ্তাহখানেক আগে তিনি দেখেছেন, ওয়ার্ডরোব খুলে অলকা তার জামা প্যান্টের পকেট হাতড়াচ্ছে। যেন কিছু খুঁজছে! স্বামীকে দেখতে পেয়ে নার্ভাস হেসে বলেছিল, "ময়লা রুমাল আছে কিনা দেখছিলাম। কাচতে দেব।" বুঝতে পেরেছিলেন। রুমাল-টুমাল বাজে কথা। আসলে অলকা কিছু একটা সন্দেহ করছে। ক'দিন পরেই দেখেছিলেন, অলকা স্টাডিতে ঢুকে তাঁর টেবিল হাতড়াচ্ছে। কিছু খুঁজছে? কী খুঁজছে? অলকা থমথমে মুখে বলেছিল, "টেলরের বিলটা কোথায় রেখেছি, মনে করতে পারছি না।" সুদর্শন কিছু বলেননি, কিন্তু মনে একটা খটকা তৈরি হয়েছিল। অলকা তো কখনও এরকম করে না! খটকা বড় চেহারা নিল, যেদিন দরজার পাশ থেকে আড়ি পেতে ফোনের কথা শুনছিল অলকা। তাঁকে দেখতে পেয়ে দ্রুত সরে গিয়েছিল। সুদর্শন জিজ্ঞেস করেছিলেন, "কী ব্যাপার অলকা! কী করছিলে?"

অলকা স্বাভাবিক ভাবে বলেছিল, "কী আবার করব! দাঁড়িয়ে ছিলাম।"

"ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলে? দরজার আড়ালে?"

অলকা গলায় ঝাঁঝ এনে বলেছিল, "কেন, দরজার আড়ালে দাঁড়াতে বারণ? নাকি টেলিফোনে গোপন কিছু বলছিলে, শুনলে অসুবিধা হবে?"

চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন সুদর্শন। অলকা কি বানিয়ে-বানিয়ে এসব বলছে? নাকি অন্য কোনও সমস্যা? রিয়াকে বলা দরকার? কী বলবে? "তোর মা আমাকে সন্দেহ করছে।" একথা মেয়েকে বলা যায়? থাক, অতদূরে থাকা মেয়েটাকে চিন্তায় ফেলে লাভ হবে না। আগে মাথা ঠান্ডা করে ভাবতে হবে। অলকাকে বোঝাতে হবে। অলকার মেজাজটাও দিন-দিন খিটখিটে হয়ে যাচ্ছে। রাতে ঠিক মতো ঘুম হচ্ছে না বলে সমস্যা? সেদিনই হাউজ় ফিজিশিয়ানের কাছে অলকাকে নিয়ে যান সুদর্শন। তিনি হালকা ঘুমের ওষুধ দেন। মনে হয়েছিল, এতেই কাজ হবে। হয়নি যে, বোঝা গেল। সেদিন সুদর্শন ধমক না দিয়ে পারলেন না,"তুমি লিমিট ছাড়িয়ে যাচ্ছ অলকা। আমি তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি।"

অলকা চিৎকার করে বলেছিল, "ভয় দেখাচ্ছ? খুন করবে?"

সুদর্শন হতাশ হয়ে বলেছিলেন, "চুপ কর। প্লিজ় চুপ কর।"

অলকা কথা শোনেনি। চিৎকার করে বলেছিল, "আমি জানি, তুমি আমাকে লুকিয়ে ওষুধ খাওয়াও। বাইরে থেকে কিনে আন। আমি তোমার জামা-কাপড় সার্চ করে, একদিন ঠিক ওগুলো পেয়ে যাব। সেদিন ফোনেও তুমি ওষুধের কথা বলছিলে।"

হতবাক সুদর্শন বিড়বিড় করে বলেন, "কীসের ওষুধ!"

অলকা ঠোঁটের কোনায় হেসেছিল। সেই হাসি সুদর্শন চেনেন না।

"তুমি জান না কীসের ওষুধ? ওষুধ না বিষ? তুমি আমার ক্ষমতা নষ্ট করে দিতে চাও। তারপর বাইরের মেয়েদের সঙ্গে নোংরামি করবে। সব জানি আমি। যেদিন হাতেনাতে ধরব বুঝতে পারবে।"

সুদর্শন স্তম্ভিত হয়ে যান। এ ধরনের বিশ্রী কথা অলকার মতো মেয়ে অবলীলায় বলে যাচ্ছে! এসবের অর্থ কী! সেদিন কথা না বাড়িয়ে সুদর্শন কাজে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। এর পরই কলকাতায় চলে যায় অলকা। ঘটনা ঘটে তার চব্বিশ ঘণ্টা পর। অফিসে বসে দুপুরে ফোন পেয়েছিলেন সুদর্শন। রান্নার মেয়েটি প্রথম সন্দেহ করে। তিনবার ঘুরে গিয়েও দরজা খোলা পায়নি। সুদর্শন ফ্ল্যাটের সিকিউরিটিকে দরজা ভাঙতে বলে সেক্রেটারিকে ফোনে ধরেন।

"এখনই কলকাতার কোনও ফ্লাইট আছে কিনা দেখুন। টিকিট বুক করুন।"

নার্সিংহোমে টানা আড়াইদিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়েছিল অলকা। ঘটনার বেশ কিছুদিন পর, রিয়া আমেরিকায় ফিরে যাবার পর, সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে কথা বলেছিলেন সুদর্শন। ডক্টর বাচোয়াত। গুরুগম্ভীর মানুষ, কিন্তু সমস্যা বোঝান সহজ ভাবে।

"ডাক্তারবাবু আমার স্ত্রী কি কোনও মানসিক সমস্যার মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন?"

"পেশেন্ট না দেখে তো এভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে সুইসাইড সব সময়েই এক ধরনের মানসিক অসুখ। অনেক সময় সেটা তাৎক্ষণিক ভাবে আসে। যাকে আমরা বলি সাডেন ইন্স্যানিটি। হঠাৎ মনে হয়, বেঁচে থাকার কোনও কারণ নেই। আবার দীর্ঘদিনের ডিপ্রেশনের জন্যও হতে পারে। আপনার স্ত্রীর আচরণে কি আপনি কোনও অসঙ্গতি লক্ষ করেছিলেন?"

এরপর সুদর্শন জোয়ারদার ধীরে-ধীরে সব বলেন। কীভাবে হঠাৎ তাকে সন্দেহ করতে শুরু করেছিল অলকা, সন্দেহের কারণ ছিল কত বিশ্রী, কী ভাবে তার জামা-কাপড় সার্চ করত, টেবিল ঘাঁটত, আড়ি দিয়ে টেলিফোনের কথা শুনত, সব। এমনকী, বাইরে থেকে খাবার আনা হলে সেই খাবার খাওয়া পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিল। তবে গোটাটাই ঘটেছিল খুব অল্প দিনের

মধ্যে।

ডাক্তার বাচোয়াত শান্ত ভাবে সবটা শুনেছিলেন। জবাবও দিয়েছিলেন শান্তভাবে, "আমি যতটা বুঝতে পারছি, আপনার স্ত্রী একধরনের মানসিক ব্যাধির মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন। এই ব্যাধির একটা নাম আছে। ওথেলো সিনড্রোম। নামটা শুনে কি আপনি চমকে গেলেন? চমকানোটাই স্বাভাবিক। এই ব্যাধিতে একধরনের বিভ্রম থেকে দাম্পত্য অবিশ্বাস গড়ে ওঠে। একটা মত আছে, শেক্সপিয়রের নাটকে ওথেলো তাঁর স্ত্রী ডেসডিমোনাকে গলা টিপে হত্যা করেছিলেন এই বিভ্রমজনিত অবিশ্বাস থেকেই। সেখান থেকেই এই অসুখের নাম ওথেলো সিনড্রোম। কেউ-কেউ অবশ্য একে প্যাথলজিক্যাল বা ডিলিউশনাল জেলাসি বলে ব্যাখ্যা করেন। আবার বলছি, দাম্পত্য জীবনে মিথ্যা অবিশ্বাসই এই রোগের লক্ষণ। আসলে একধরনের মনোবিকার। বিকারের মূলে থাকে যৌন অবিশ্বাস। অনেক সময় পেশেন্ট বিশ্বাস করতে শুরু করে, তার যৌনক্ষমতা কমানোর জন্য তাকে বিষ বা ওই ধরনের কোনও ওষুধ খাওয়ানো হচ্ছে। তার স্বামী বা স্ত্রী গোপনে এই ওষুধ তাকে খাওয়াচ্ছে। যাতে সে শারীরিক ভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। পুরনো ব্যাধি বা স্কিজোফ্রেনিয়ার প্রাথমিক বহিঃপ্রকাশ হিসেবেও এই বিকার দেখা দিতে পারে। বিকারের মধ্যে সন্দেহের বীজ থাকে। সেই বীজ বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়ে, ভয়ঙ্কর ঘটনাও ঘটাতে পারে। আমার ধারণা আপনার স্ত্রীর ক্ষেত্রে সেটাই ঘটেছিল। উনি স্কিজোফ্রেনিয়ার প্রাথমিক স্তরে ঢুকে পড়েছিলেন। তবে একটাই প্রশ্ন, এত তাড়াতাড়ি অবস্থার অবনতি হল কেন? যদিও এই ধরনের ব্যাধি সবসময় নিয়ম মানে না। সম্ভবত আপনার স্ত্রীর বেলাতেও মানেনি। সরি মিস্টার জোয়ারদার।"

রিয়াকে এসব কিছুই বলেননি সুদর্শন জোয়ারদার। অলকার এই জটিল ব্যাধির কথা জেনে সে কী করবে? পুলিশের ডাক্তার রিপোর্টে লিখেছে 'হঠাৎ অবসাদ'। সেটাই সে রাখুক। রিয়া এখনও মাঝে-মধ্যে টেলিফোনে কাঁদতে কাঁদতে বলে, "বাবা, আজও বুঝতে পারলাম না!"

সুদর্শন কী বলবেন বুঝতে পারেন না। মিথ্যে সান্ত্বনা দেন, "আমি তো পাশে থেকেও পারিনি। তুই অত দূর থেকে কীভাবে বুঝবি? গোপন ডিপ্রেশন বোঝা খুব কঠিন রে মা। অনেক সময় ডাক্তারও ভুল করে। শুধু ঘুমের ওষুধ লিখে ছেড়ে দেয়।"

অনেক রাতে বিছানা ছেড়ে এসে ঘরে জানলায় এসে দাঁড়ালেন সুদর্শন। অনেক নিচে কলকাতা শহর নিজের বুকে অজস্র আলোর তারা জ্বেলে জেগে আছে। জেগে আছে? নাকি ঝিমিয়ে পড়েছে ক্লান্ত হয়ে?

সুদর্শন বিড়বিড় করে বললেন, "অলকা, আমার জন্য তোমার কি মন কেমন করে?"



জাহ্নবী পত্রনবিশ বসে আছেন চেয়ারে। দু'ঘণ্টারও বেশি সময় হতে চলল, তিনি একই রকম ভঙ্গিতে বসে আছেন। হঠাৎ দেখলে মনে হবে, মানুষ নয়, কোনও পাথরের মূর্তি। জানলার বাইরে অন্ধকার নেমেছে। জাহ্নবী সেই অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছেন। অন্ধকার বাড়ছে।

গণেশ ঘরে ঢুকে আলো জ্বালাল। জাহ্নবী হাত তুলে বারণ করলেন। গণেশ আলো নিভিয়ে বলল, "কিছু খাবেন? মুড়ি দেব?"

জাহ্নবী মাথা নাড়লেন। চাপা গলায় বললেন, "কী অবস্থা গণেশ?"

গণেশ চুপ করে রইল। 'অবস্থা' খুব খারাপ। কিন্তু সেটা কীভাবে বলবে? গণেশ বিড়বিড় করে বলল, "আমার খুব খারাপ লাগছে দাদা।"

জাহ্নবী শান্ত গলায় বলল, "তোমার খারাপ লাগার কিছু নেই।"

"আমি যদি মাধবদাকে আপনার কাছে না নিয়ে আসতাম, তা হলে এসব কিছু হত না।"

অন্ধকারেই সামান্য হাসলেন জাহ্নবী। হালকা শীত-শীত করছে। আবহাওয়ার জন্য? হতে পারে। মেঘ কেটে যাওয়ার পরও চোরাগোপ্তা একটা স্যাঁতস্যাঁতে ভাব রয়ে গিয়েছে। হয়তো সেই কারণেই শীত করছে। আবার জ্বরও আসতে পারে।

"এটা কোনও কথা নয় গণেশ। গোলমাল একটা সময় হতই। লক্ষ্মণের ব্যাপারটা হাতে পেয়ে গেল। ছেলেটো রাতারাতি বিট্রে করবে, বুঝতে পারিনি।"

গণেশ মাথা চুলকে বলল, "পার্টির আরও অনেকে ওদিকে চলে গিয়েছে। নিতাই, বাচ্চু, গুনিয়া সবাই। বিমলবাবুকে দেখলাম, তক্তার উপর বসে আছে।"

বিমলবাবু শুনে জাহ্নবী গণেশের দিকে মুখ ফেরালেন।

"স্টেজে ভাষণ দিচ্ছিল?"

"স্টেজ তো করেনি, বাজারে তক্তাপোশ পেতেছে। ঝাণ্ডা লাগিয়েছে ক'টা। ভাষণ দিতে দেখিনি, তবে ওদের সঙ্গে বসেছিল।"

একটু চুপ করে থেকে জাহ্নবী বললেন, "আলোটা জ্বালা গণেশ। দেখ তো, একটা গায়ের চাদর-টাদর কিছু পাস কিনা। শীত করছে।"

দিঘির পাড় আরও হাজারটা গ্রামের মতো, খুঁটি আছে, কিন্তু ইলেকট্রিসিটি নেই। গ্রামের মাঝখানে হরিনাথ জেনারেটর বসিয়েছে। বাড়িতে-বাড়িতে তার টেনে কারেন্ট দেয়। এই ব্যবস্থার নাম 'হরিনাথের আলো'। পয়েন্ট পিছু টাকা। বলা বাহুল্য যাদের টাকা-পয়সা আছে, তারাই কেবল 'হরিনাথের আলো' নিতে পারে। মথুরাগঞ্জে হরিনাথের ভিডিও হল আছে। বছর পাঁচেক হল খানদশেক গ্রামে হরিনাথ এই জেনারেটরের ব্যবসা খুলেছে। সন্ধে ছ'টা থেকে রাত ন'টা। তারপরেই সুইচ অফ্। এক মিনিট এদিক-ওদিক হওয়ার উপায় নেই। এই নিয়ে বছরকয়েক আগে বিরাট হুজ্জুতি হল। ন'টার সময় 'হরিনাথের আলো' গেল নিভে। এদিকে পার্টি অফিসে তখন মিটিং চলছে। পঞ্চায়েত ইলেকশন নিয়ে মিটিং। খোদ জাহ্নবী পত্রনবিশ সেখানে তখন বসে। অন্ধকার হতেই বিরক্ত জাহ্নবী বললেন, "এখনই গিয়ে হরিনাথকে আলোটা দিতে বলো। বলো, আরও একঘণ্টা মিটিং হবে।"

দু'জন সাইকেল নিয়ে ছুটল। হরিনাথ ছিল না, তার লোকজন বলল, আলো দেওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। একেই পার্টি অফিসে কানেকশন ফ্রি, তার উপর আবার বেশিক্ষণ আলো? অসম্ভব। রাতেই টিনের জেনারেটর রুমে তালা পড়ে গেল। দু' হাজার টাকা 'জরিমানা' দিয়ে তবে হরিনাথ সেই তালার চাবি পেল।

জরিমানার টাকা কখনও পার্টি তহবিলে জমা পড়ত না। পড়ত 'দিঘির পাড় উন্নয়ন সমিতি'র বাক্সে। গ্রামের উন্নতির জন্য 'মুক্ত হস্তে দান' হিসেবে। রসিদ দেওয়া হত। সমিতির টাকাপয়সার হিসেব নিয়ে গ্রামের কেউ প্রশ্ন তুললে পার্টির নেতারা বলতেন, "আমরা কি করে বলব? সমিতি কি আমাদের? সমিতি সবার। আমরা পার্টি থেকে কাউকে ওখানে ঢুকিয়েছি, এমন কথা কেউ বলতে পারবে না। তবে সমিতিতে ঢোকবার পর কেউ যদি আমাদের পার্টি করে আমরা কী করব? আমরা তো কাউকে রাজনীতি করতে বারণ করতে পারি না।" যদিও সমিতির সকলেই পার্টির মিটিং মিছিলে যেত। সেই সমিতি এখন আর নেই, তবে 'হরিনাথের আলো' আছে। 'একটা কিছু অদল বদল ঘটে যেতে পারে' আঁচ করে যারা এখন ক্ষমতায়, তাদের অফিসে আগেই 'পয়েন্ট' ঢুকিয়ে দিয়েছিল হরিনাথ। ক্ষমতায় আসার পর সেই 'পয়েন্ট' সংখ্যায় শুধু বাড়েনি, একটা টিউব আর টেবিল ফ্যান উপহার দিয়েছে। অফিসে যারা ছিল তারা 'উপহার' পেয়ে মোটেও হাত কচলায়নি। উলটে হরিনাথকে খিস্তি করে বলেছে, "শুধু ঘরের ভেতর আলো দিলেই হবে চাঁদু? এতদিন ওদের ধামা ধরে কামাই তো কম করোনি। আমাদের অফিস ঘরের বাইরেও একটা বাল্‌ব ঝুলিয়ে দিও দয়া করে। শুধু সামনে নয়, ঘরের পিছনেও আলো লাগবে। ওদিকটায় হিসু করতে যাই না? নইলে ক'দিন পরে দেখবে, তোমার পাছায় আলো জ্বলছে। অন্ধকারে খেতেখামারে পিছন ফিরে হাঁটতে হবে শালা। সবাই বলবে হরিনাথের টর্চ। হ্যা হ্যা।"

নোংরা কথা শুনেও হরিনাথ 'হে, হে' করেছিল। জাহ্নবী পত্রনবিশের পার্টির উপর তার বহুদিনের রাগ। দু'হাজার টাকার শোক চাপা ছিল। ইলেকশনে ক্ষমতা চলে যাওয়ার পর, সেই শোক উথলে উঠল। মনে-মনে ঠিক করে রেখেছিল, উলটো পার্টির অফিস যেদিন আলো দিয়ে সাজিয়ে আসবে, সেদিনই জাহ্নবীদের অফিসের সুইচ অফ। পরদিন তার কাটা। কিন্তু গাল শুনে সিদ্ধান্ত বদলেছে। থাকুক, যা ছিল।

জাহ্নবী পত্রনবিশ কিন্তু কখনওই নিজের বাড়িতে হরিনাথের আলো নেননি। কলকাতা থেকে নিজে মিনি জেনারেটর এনেছেন। বিদেশি জিনিস। আওয়াজ হয় না। মাঝে-মধ্যে চাপা গলায় গর-গর করে মাত্র। হেমলতা এই জেনারেটর নিয়েও ঝামেলা করেছিলেন। নিজের ঘরে কানেকশন নেননি। হ্যাজাক নিয়েই থাকতেন। ছেলে বলতে এলে দার্শনিক ধরনের কথা বলতেন, "রাখ তোর আলো। আলোতেই অন্ধকারের কীটপতঙ্গ বেশি থাকে। শহরে দেখিসনি? চারপাশে কত আলো, আর আলোর মধ্যেই কত নোংরা। দেখিসনি?"

ভিতর থেকে একটা চাদর নিয়ে এল গণেশ। জাহ্নবী গায়ে জড়িয়ে বললেন, "ওরা মিটিংয়ে আমাকে খুব গাল দিচ্ছিল, না?"

গণেশ ভয় পাওয়া গলায় বলল, "হ্যাঁ"

"হ্যাঁ" বললেও সভার পুরোটা শুনতে পারেনি গণেশ। খানিকটা দূরে গাছতলায় দাঁড়িয়েছিল। মিনিটপনেরো পরে উপেন এসে ফিসফিস করে

বলল, "এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়িও না।"

গণেশ রাগ দেখিয়ে বলে, "কেন? এটা কারও বাপের জায়গা?"

উপেন বলল, "বেশি গরম না দেখিয়ে কেটে পড়, গণেশদা। দেখছ না তোমার দাদার উপর সবাই কেমন খেপে আছে? টেম্পারেচার বাড়ছে।"

"আমার কী? আমি তো আর দাদার পলিটিক্স করি না।"

উপেন দাঁত বের করে হাসে, বলে, "ফালতু কথা বোলো না। গরম অবস্থায় দাদার চামচেকে হাতের কাছে পেলে খারাপ কিছু হয়ে যেতে পারে।"

"কী হবে? মারবে?"

উপেন হাত নাড়িয়ে অঙ্গভঙ্গি করে বলল, "না, কোলে বসে দুধভাত খাওয়াবে। যা ভাল বুঝেছি, বলে গেলাম। এবার তোমার ইচ্ছে।"

উপেন চলে যাওয়ার পর, গণেশ আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করেনি। বক্তাদের ভাষণে তখন জাহ্নবী পত্রনবিশের নামে আগুন ছুটছিল।

"কী বলছিল" জিজ্ঞেস করতে গিয়েও, চুপ করে গেলেন জাহ্নবী। গণেশের কাছে ডিটেলসে গালাগালি শুনতে চাওয়াটা ঠিক হবে না। গাল কম শুনতে হচ্ছে না। পার্টির ভিতরে-বাইরে সর্বত্রই নিন্দা হচ্ছে। তবে দিঘির পাড়ে এই প্রথম। সেই কারণেই চিন্তা। যেদিন জেনেছিলেন, পার্টি সঙ্গে নেই, উলটে আরও বড় বিপদে ফেলার পরিকল্পনা করছে, তখনই কলকাতা ছাড়ার পরিকল্পনা করেন। নলিনীকে ফোন করেছিলেন। ভোটে হেরে যাওয়ার দিনও নলিনী বাড়িতে এসেছিল। দুপুরে। জাহ্নবী পার্টি অফিসে বেরচ্ছিল। নলিনীকে দেখে হেসে বলেছিলেন, "ভাগ্যিস হেরেছি, তাই এলে।"

নলিনী বলেছিল, "কেন! আগেও তো এসেছি। ক'মাস আগে এসেও ঘরদোর দেখে গিয়েছি।"

পরাজয়ে পরিশ্রমে বিধ্বস্ত জাহ্নবী হেসেছেন, "ও কী আমার কাছে আসা? ও তো ঘর সংসার গুছিয়ে দিতে আসা।"

নলিনী একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, "আজ কিন্তু কোনও কাজ করতে আসিনি। তোমার সঙ্গে কথা বলতেই এসেছি।"

"সো কাইন্ড অফ ইউ।"

নলিনী সোফায় বসে বলেছিল, "থ্যাঙ্ক ইউ।"

সত্যি মাঝে-মধ্যে জাহ্নবীর বাড়িতে ঘুরে যায় নলিনী। প্রথম দিকে তিন মাস অন্তর আসত। পরে সেটা বাড়িয়ে পাঁচ-ছ'মাস করেছে। এসে সংসার গুছিয়ে দিয়ে যায়। কাজের লোক থেকে শুরু করে মালি, সুইপার, ড্রাইভার সবার সঙ্গে কথা বলে, কী করতে হবে, কী ভাবে চলতে হবে ডিরেকশন দেয়। রান্নাঘর, বাথরুম, সিঁড়ির তলা, বাড়ির বাইরের প্যাসেজ নোংরা দেখলে রাগারাগি করে। ছেড়ে চলে যাওয়ার পর, প্রথম থেকেই এই দায়িত্ব পালন করেছে নলিনী। এমনও হয়েছে, জাহ্নবী কলকাতার বাইরে, নলিনী সকালে এসে বিকেল পর্যন্ত থেকে গিয়েছে। লোক ডেকে জলের ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করিয়েছে, ছাদ ঝাঁট দিয়ে ধুলো ময়লা ফেলিয়েছে। জাহ্নবী কখনও জিজ্ঞেস করেননি, "কেন আস?" নলিনীও কখনও কৈফিয়ত দেয়নি। কেউই প্রসঙ্গটা তোলেনি। যেন এটাই স্বাভাবিক। মন্দার নলিনীকে বলেছিল, "এ আবার কী! তুই জাহ্নবীদার ওখানে যাস কেন?"

নলিনী হেসে বলেছিল, "সমস্যা কোথায়? অগোছালো সংসার গুছিয়ে দিয়ে আসি।"

"ওই ঘর গোছানোর তুই কে?" রেগে যায় মন্দার।

"কেউ নই বলেই তো যাই। মাঝে-মধ্যে আমি হানা না দিলে কাজের লোকগুলো খুব ফাঁকি মারে। ঝুল, কালি, ধুলো ময়লায় বাড়িতে পা রাখতে পারবি না। বাইরের লোকজন আসে বলে ড্রইংরুমটা তা-ও খানিকটা ঝাড়পোছ হয়, বাকিগুলো নরককুণ্ড করে রাখে। এখন কিছুটা বদলেছে। লোকজন জেনে গিয়েছে, আমি যে কোনও সময় সারপ্রাইজ় ভিজিটে যেতে পারি। ধুলো-ময়লা, নোংরা, অগোছালো দেখলে বিপদ আছে।"

মন্দার ধমক দেয়, "আদিখ্যেতা মার্কা কথাগুলো থামা দেখি। কখনও শুনেছিস, ডিভোর্স হয়ে যাওয়া পর এক্স বউ স্বামীর ঘর ঝাঁট দিতে গিয়েছে? এটা কি ঠাকুরমার আমলের বাংলা সিনেমা?"

নলিনী শান্ত গলায় বলেছিল, "মন্দার, তোদের আধুনিকতার সঙ্গে আমার আধুনিকতা সবটা মিলবে না। বেঁচে থাকার সঙ্কট, পারস্পরিক বিশ্বাসে চিড়, ইগো ক্ল্যাশ, স্পেস প্রবলেম, অন্য পুরুষ বা মহিলার সঙ্গে প্রেমই যে শুধু আধুনিক সমস্যা, এমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই। অন্যায়, দুর্নীতি, নিষ্ঠুরতাও সমস্যা। পৃথিবী যত আধুনিক হচ্ছে, এই সঙ্কটগুলো নতুন নতুন ফর্মে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। আমরা বেশি-বেশি শিখছি, জানছি, কিন্তু এ সবের প্রতিবাদ করার মতো আধুনিক হতে পারছি না। শুধু বিশ্বাসে চিড়, ইগো ক্ল্যাস, স্পেস প্রবলেম নিয়ে মাতামাতি করছি। কিছু মনে করিস না মন্দার, হয়তো আমি নিজের ঢাক নিজে পেটাচ্ছি, আমি কিন্তু সাহস দেখিয়েছি। ছোট ছেলের হাত ধরে সংসার ছেড়েছি। জাহ্নবী কি আমাকে মারধর করত? না। সে কি কখনও আমাকে অপমান করেছে? না। কোনও মহিলার সঙ্গে গোপন সম্পর্ক ছিল ওর? তাও না। এই দুর্নাম কেউ দিতে পারবে না। কিন্তু রাজনীতির নামে যে পথ ও নিয়েছে, সেটা আমার নয়। অথচ স্ত্রী হিসেবে থাকতে হলে, তার হাত ধরে আমাকে এবং আমার সন্তানকে ওই পথেই হাঁটতে হত। এই হাত ছাড়াটাও কম আধুনিক নয়!"

মন্দার চাপা ব্যঙ্গে হেসেছিল, "এসবের সঙ্গে ও বাড়ির ঘরদোর গোছাতে যাওয়ার কী সম্পর্ক?"

নলিনী হেসে বলেছিল, "ওটা বলতে পারিস আমার বোকামি।"

মন্দার চোখ তুলে বলল, "পুরনো ভালবাসা নয় তো?"

"না, কৃতজ্ঞতা। আমার ছেড়ে চলে আসাটা একেবারেই একতরফা সিদ্ধান্ত ছিল। জাহ্নবী মেনে নিয়েছে। এমনকী ছেলেকে রাখার বিষয়ে কোনও রকম কনফ্রন্টেশনে যায়নি। হয়তো ইচ্ছে করলেই ঝামেলা করতে পারত না। ও পাবলিক ফিগার। কনজুগাল লাইফ নিয়ে হট্টগোল হলে, পলিটিক্যাল কেরিয়ারে ছাপ পড়ে যেত। তবু যেটুকু পারত, সেটুকুও করেনি। যেমন এসব ক্ষেত্রে অন্য ভাবে চাপ আসতে পারত। আমার চাকরির জায়গা ওর পার্টি ইন্টারফেয়ার করতে পারত।"

মন্দার অবিশ্বাসের গলায় বলেছিল, "দুর, তা কী করে করবে?"

"তুই জানিস না, চাইলে এরা কতটা ফেরোসাস হতে পারে! একজন প্রফেসরকে চিনি, যাঁকে পার্টির লোকেরা যাচ্ছেতাই ভাবে নাস্তানাবুদ করেছিল। দোষের মধ্যে দোষ, ভদ্রলোক ওঁদের সব কথা শুনতেন না। শেষ পর্যন্ত কিছুতেই বশে আনতে না পেরে কলেজের এক ছাত্রীকে দিয়ে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের মিথ্যে কমপ্লেন আনল। কলেজ গেটে স্টুডেন্টস ইউনিয়নের ছেলেমেয়েদের দিয়ে হট্টগোল পাকাল। প্রফেসরের বাড়ির সামনে গিয়ে স্লোগান দিল। ভদ্রলোকের দিদি আমার পরিচিত। তিনি আমাকে ধরলেন। আমি জাহ্নবীকে বলে খানিকটা ম্যানেজ করেছিলাম। আমার নামেও তেমন কিছু করলে, আশ্চর্যের কিছু ছিল না। হয়তো বলত, ছাত্রীদের মেন্টালি টরচার করেছি। বলা যায় না, কোনও একটা মেয়েকে অসুস্থ সাজিয়ে দু'দিনের জন্য হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিতে পারত। কাগজে খবর বের করত, শিক্ষিকার নির্যাতনে ছাত্রী অসুস্থ। তোরাও ভয়ে চুপ করে থাকতিস।"

মন্দার বলেছিল, "যাঃ, এসব কখনও হয় নাকি!"

"হয়, কিন্তু আমার বেলায় হয়নি। বলতে পারিস নতুন কোনও গোলমালে পড়া থেকে আমি নিশ্চিন্ত হয়েছি। তার প্রতিদানেই আমি মাঝে-মধ্যে গিয়ে ওর এলোমেলো ঘর সংসার গুছিয়ে দিই। তবে গ্যাপ বাড়িয়ে দিয়েছি, এখন আর নিয়ম করে যাই না। কাজের লোকেরা শিখে নিচ্ছে। ও নিজেও একা থাকায় অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। একটা সময়ের পর আর যেতে হবে না। সত্যি যদি বিয়েটিয়ে কিছু করত, বা কোনও মহিলা এসে থাকত, তা হলে তো আর যাওয়ার দরকার হত না।"

এত কথা শোনার পরও মন্দার মেনে নিতে পারেনি। বলেছিল, "সে তুই যা-ই বল, আমি সমর্থন করি না। তোকে আমি বারণ করছি। ডোন্ট গো দেয়ার।"

নলিনী বন্ধুর কথা শোনেনি। টিভিতে ভোটের রেজ়াল্ট দেখে জাহ্নবীকে ফোন করবে ভেবেছিল। নিজেই চলে এল। প্রতীক বলেছিল, "আমিও তোমার সঙ্গে যাব।" শেষ পর্যন্ত কিছু ভেবে মত বদলায়। বলে, "না, তুমি যাও। আমি একা যাব।"

কলেজে ভর্তি হওয়ার পর, প্রতীক নিয়ম করে বাবার সঙ্গে দেখা করত। ছুটিছাটার দিন বাড়িতে যেত। কথা হত। কথা মানে বেশিরভাগই নিজের সম্পর্কে ইনফরমেশন। কেমন আছে? কী পড়ছে? ভবিষ্যতে কী করবার ইচ্ছে? এইসব। এই কথা বেশিক্ষণ চলার নয়। খানিক পরে দু'জনেই চুপ করে যেত। জাহ্নবী হয় বেরিয়ে যেতেন, নয় টেলিফোনে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। প্রতীক ম্যাগাজিন ওল্টাত, টিভি সার্ফ করত। রান্নার লোক যত্ন করে কিছু খেতে দিত। প্রতীক চুপচাপ খেয়ে নিত। চাকরিতে জয়েন করার পর আর যেতে পারে না। টেলিফোনে কথা হয়। রাজনীতি নিয়ে ছেলের কঙ্গে কখনও কথা বলেন না জাহ্নবী। সম্ভবত গোড়াতেই বুঝে গিয়েছিলেন, তার ছেলে হলেও প্রতীক রাজনীতি পছন্দ করে না। জাহ্নবী জানেন, এটা স্বাভাবিক। রাজনীতির কারণেই তার বাবা-মা আলাদা হয়েছে এটা জানার পর রাজনীতি পছন্দ করার কোনও কারণ নেই।

নলিনী যখন জাহ্নবীর কাছে পৌঁছয়, কলকাতায় তখন তুমুল হইচই হচ্ছে। বাজি ফাটছে, আবির উড়ছে।

জাহ্নবী নলিনীকে বলেছিলেন, "চা খাবে তো?"

নলিনী সোফায় বসে নিজের হাতের আঙুলগুলোর দিকে তাকিয়ে বলেছে, "কী করবে এবার?"

জাহ্নবী ভুরু কুঁচকে, মুখে হাসি এনে বলেছিলেন, "কী করব মানে! আমি

তো মিনিস্টার ছিলাম না যে গভর্নমেন্ট চলে গিয়েছে, বলে আমি বেকার হয়ে গেলাম।"

নলিনী নিচু গলায় বলল, "তাও এতদিন পাওয়ারের মধ্যে ছিলে, সেটা তো আর রইল না।"

কাঁধ ঝাঁকিয়েছিলেন জাহ্নবী। বলেছেন, "তাতে বয়ে গেল। আমি যেমন পার্টি করতাম, ট্রেড ইউনিয়ন করতাম, তেমনই করব। আমাদের মতো মানুষদের রেসপনসিবিলিটি আরও বাড়ল। আমার ধারণা, পার্টি এবার বড় কোনও জায়গায় আমাকে নিয়ে যাবে। কানাঘুষো শুনেছি। আমি তো ক্ষমতার জন্য পলিটিক্স করতে আসিনি।"

নলিনী চোখ তুলেই নামিয়ে নিয়েছিল। জাহ্নবীর কথাগুলো শুনতে অহঙ্কারের মতো লাগলেও আসলে নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার ছেলেমানুষি চেষ্টা। স্পষ্টতই সে নার্ভাস। 'বড় কথা' বলে সেই নার্ভাস ভাব আড়াল করতে চাইছে। গলায় যতই জোর আনার চেষ্টা করুক, দাপুটে মানুষটা কুঁকড়ে গিয়েছে। নলিনীর খারাপ লাগছিল। মাথা নিচু করা অবস্থাতেই সে বলেছে, "এটা তোমার আর তোমার পার্টির বিষয়। বাবার মুখেই শুনতাম, রাজনীতিতে হার-জিত আছে। এতে উতলা হলে চলে না।"

"তুমি কি আমাকে উতলা দেখছ?"

নলিনী মুখ তুলে বলেছে, "সেটাই তো স্বাভাবিক। এতদিন একভাবে চলেছ, এখন সেসব অভ্যেস বদলাতে হবে, তবে সেটাও নিশ্চয় এক সময়ে হ্যাবিচুয়েটেড হয়ে যাবে।"

জাহ্নবী কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে গম্ভীর গলায় বলেছিলেন, "তুমি কি বাড়ি বয়ে আমাকে জ্ঞান দিতে এসেছ? নাকি করুণা দেখাতে? যদি তাই হয়, তাহলে বলব, সরি নলিনী। আমাকে ছেড়ে দিতে হবে। আমার অনেক কাজ। আমি আবার পার্টি অফিসে যাব। নানা জায়গা থেকে গোলমালের খবর আসছে।"

নলিনী এই রাগের কথায় সেদিন গুরুত্ব দেয়নি। বরং উঠে যাওয়ার বদলে সোফায় হেলান দিয়েছিল, "দুটোর একটাও নয়। জ্ঞান বা করুণা বিতরণের জন্য অনেক লোক পাবে। আমি এসেছি চিন্তিত হয়ে। আমার মনে হয়, তোমার উচিত ক'দিনের জন্য বাইরে চলে যাওয়া।"

জাহ্নবী ঘাড় কাত করে ঠোঁটে ব্যঙ্গের হাসি নিয়ে বলেছিলেন, "পালিয়ে যেতে বলছ?"

"না পালিয়ে নয়, রেস্ট নিতে যাবে। এখানকার সিচুয়েশন শান্ত হলে ফিরবে। তোমাদের মতো লিডাররা এখন টার্গেট হবে। শুধু এইটুকু বলার জন্যই আমি এসেছি।"

"এটা গ্রাম নয় নলিনী।"

"গ্রাম, শহরের কথা নয়। টিভিতে দেখলাম, বিভিন্ন জায়গায় হামলা হচ্ছে।"

জাহ্নবী চিন্তিত গলায় বলেছিলেন, "তা তো হবেই...এতদিন পরে...অনেক বেশি হওয়ার কথা...কিন্তু তা বলে আমরা চলে যেতে পারব না।"

নলিনী এবার সোজা হয়ে বসে বলেছে "কলকাতা ছাড়তে না চাইলে, এই বাড়িটা ছেড়েও ক'দিন থাকতে পার কিনা, ভেবে দেখো। এখন কোনওরকম গোলমাল হলে কিন্তু বাঁচাতে পুলিশ ছুটে আসবে না। যদি মনে করো, আমার ওখানে গিয়ে থাকতে পার। জায়গা কম, কিন্তু থাকতে পারবে। প্রতীক না হয় আমার কাছে শোবে।"

জাহ্নবী থমকে তাকিয়েছিলেন,"গর্তে পড়েছি বলে লাথি মারছ না তো?"

নলিনী বড় করে শ্বাস ফেলেছিল, "নিজেকে হাতি ভেবেই ভুল করেছিলে। হাতি হলেও, সেটা ছিল বেলুনের। হাওয়া বেরোতেই চুপসে গেলে। যাক, আমার বলা উচিত মনে হল, তাই বললাম।"

জাহ্নবী সত্যিগুলো বুঝতে পারছিলেন, কিন্তু শুনতে চাইছিলেন না। তিনি উঠে পড়তে-পড়তে বিরক্ত গলায় বলেছিলেন, "এগুলো আমি জানি। তোমার আর কিছু বলার আছে নলিনী? একটা খারাপ সময়ে আমার কাছে যে ছুটে এসেছ তার জন্য ধন্যবাদ।"

নলিনী উঠে দাঁড়িয়ে সামান্য হেসেছিল, "চলে যেতে বলছ? সে তো যাবই। না বললেও যাব। তবে আর একটা জরুরি কথা বলে নিই।" একটু থেমে দরজার দিকে তাকিয়ে গলা আরও নামিয়ে নলিনী সেদিন বলেছিল, "তোমার কাছে যদি কোনও টাকা পয়সা থাকে সেগুলো নিশ্চয় সরিয়ে রেখেছ। আশা করি, আমি কী বলতে চাইছি, তুমি বুঝতে পেরেছ। লকারের চাবিটাও তোমার কাছে আছে। যদি সেখানে বাড়তি কিছু রেখে থাক..."

নলিনীর সঙ্গে কথা সেই শেষ। যোগাযোগও হয়নি আর। প্রতীক একদিন এসে দেখা করে গিয়েছিল। কলকাতা ছাড়ার আগে জাহ্নবী নিজেই নলিনীকে ফোন করেছেন, "ক'দিনের জন্য বাইরে যাচ্ছি। তবে দিঘির পাড়।"

নলিনী একটু অবাকই হয়েছে। জাহ্নবী পত্রনবিশ বাইরে যাবে, তাকে বলে যাওয়ার কারণ কী! জাহ্নবী বলেছেন, "তুমি কি খবরের কাগজ দেখেছ?"

নলিনী চিন্তিত গলায় জানতে চেয়েছে, "কেন? কী হয়েছে? রাজনীতির কিছু? রাজনীতির খবর বিশেষ পড়ি না।"

"তা হলে থাক। ঠিক করেছি দিঘির পাড়ে গিয়ে ক'দিন রেস্ট নেব। তুমি রেস্ট নেওয়ার কথা বলেছিলে না?" কথা শেষ করে একটু হাসলেন জাহ্নবী।

নলিনীর সন্দেহ হয়েছে, "কোনও সমস্যা?

"সমস্যার মধ্যেই তো আছি। যাক, তোমাকে যে-কারণে ফোন করলাম। বলছিলাম..." জাহ্নবী একটু থেমে চিন্তা করেছেন, তারপর শান্ত গলায় বলেছিলেন, "প্রতীক যদি চায়, এখানে এসে থাকতে পারে...বাড়িটা তো ফাঁকাই পড়ে থাকবে... ও থাকলে কারওর থাকাও হবে...।"

"তুমি প্রতীককে বলে দেখতে পার।"

"তোমার মত ছাড়া প্রতীক থাকতে রাজি হবে না।"

"আমার মতামতের কিছু এসে যায় না। প্রতীক তোমারও ছেলে। সে বড় হয়েছে। নিজে উপার্জন করছে, তার স্বাধীন মত রয়েছে।"

"আমি জানি। আবার এও জানি, তুমি না বোঝালে কিছুই করবে না।"

নলিনী খানিকটা জোর দিয়ে বলেছিল, "এটা আমার বোঝানোর বিষয় নয়।"

"বাঃ, জাহ্নবী পত্রনবিশ খারাপ মানুষ, রাজনীতির আড়ালে অনৈতিক, অন্যায় কাজ করে, ক্ষমতার দাপটে চলে, তার সঙ্গে থাকা উচিত নয়, এই ধারণা তো তোমার কাছ থেকেই সে পেয়েছে। এখন তো আর সে সব প্রশ্ন উঠবে না। সেটা ওকে বল। বাবার বাড়ি, সম্পত্তি দেখভালের দায়িত্ব তো তারও।"

নলিনীর গলা কঠিন হয়ে উঠেছিল, "তুমি ভুল করছ। একটা বয়স পর্যন্ত আমি প্রতীককে ভাল মন্দ বোঝানোর চেষ্টা করেছি। কতটা পেরেছি, জানি না। কিন্তু বড় হওয়ার পর, সে নিজেই চারপাশ চিনতে শিখেছে। এমনকী, তাকে কখনও তোমার কাছে যেতে বারণও করিনি। সত্যি যদি সেরকম হত তাহলে আমি আটকাতাম। চেষ্টা করতাম, যাতে সে এক মুহূর্তও তোমার সঙ্গে না মেশে।"

"পারতে না।"

"হয়তো পারতাম না। কিন্তু চেষ্টা করতাম। যাক, আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাইছি না। ইটস বেটার টু টক টু হিম।"

টেলিফোনের ওপাশে দীর্ঘশ্বাস ফেলে জাহ্নবী বলেছিলেন, "তাই বলব। শুধু আমার এখানে এসে থাকতে বলব না, আমি ছেলের সঙ্গে বিষয় সম্পত্তি নিয়েও কিছু কথা বলতে চাই এবং সেটা খুব দ্রুতই চাই। দিঘির পাড়ে চলে যাওয়ার আগেই। কারণ, আমি জানি না দিঘির পাড়ে আমাকে কতদিন থাকতে হবে। আমি এখনই সেটল করতে চাই। প্রতীকের প্রাপ্য তাকে বুঝিয়ে দেওয়ার দরকার।"

"তুমি কি দিঘির পাড়ে পাকাপাকি ভাবে চলে যাচ্ছ?"

জাহ্নবী খানিকটা যেন আপনমনেই বলেছেন, "না, ফিরে আসব। সময় হলেই ফিরে আসব।"

নলিনী জিজ্ঞেস করেছিল, "কী হয়েছে তোমার?"

জাহ্নবী হালকা হেসে উত্তর দিয়েছিল, "শুনে লাভ কী? যাক, আমি ছেলের সঙ্গে কথা বলে নেব।"

"কী হয়েছে" জাহ্নবী না বললেও, প্রতীক সেদিন রাতে খেতে বসে বলে দিয়েছে। অফিস থেকে ফিরতে দেরি হয়েছিল তার। বজবজ লাইনে ট্রেনের গোলমাল ছিল। প্রতীক বলেছিল, "এবার একটা বাইক কিনে নেব।"

নলিনী বলেছে, "তার চেয়ে কলকাতার কোনও অফিসে কাজ দেখো। সেক্টর ফাইভে তো অনেক আছে।"

"যাব। এখানে আগে খানিকটা রপ্ত হয়ে নিই। ডাইরেক্ট প্রোডাকশনের সঙ্গে বসে কাজ করার আলাদা একটা ভ্যালু আছে। মেশিন থেকে ডাইরেক্ট র' ডেটা নিয়ে অ্যানালিসিস করতে পারি। এই সুযোগ সব জায়গায় পাব না। বেশিরভাগ জায়গাতেই তো ডেটা পাঁচ হাত ঘুরে রিফাইন্ড হয়ে আসে। আর ক'টা দিন কাজ করে বড় কোথাও চলে যাব।"

নলিনী ছেলের প্লেটে এক চামচ ভাত তুলে দিয়ে বলেছিল, "তোর বাবা ফোন করেছিল?"

প্রতীক খাওয়া থামিয়ে মুখ তুলেছিল, "আজ? কই না তো?"

নলিনী সহজ ভাবে বলেছে, "তা হলে হয়তো পরে করবে।"

প্রতীক চুপ করে খানিকক্ষণ খাওয়ার পর বলেছে, "আজ কাগজে বাবার নামে একটা খবর দেখলাম। ছোট করে দিয়েছে।"

নলিনী নিজের প্লেটে খাবার নিতে নিতে বলল, "এ আর নতুন কী? নিশ্চয় বদনাম কিছু।"

প্রতীক মাথা নামিয়েছে, "তার চেয়েও একটু বেশি।"

নলিনী হাতে প্লেট নিয়ে থমকে গেছিল, "বেশি মানে!"

"বাবার পার্টি বাবার বিরুদ্ধে কমিশন করেছে। সেই কমিশন ইনভেস্টিগেশন করবে। শুধু একা বাবা নয়, আরও কয়েকজন লিডার আছে। সবার বিরুদ্ধেই কমপ্লেন আছে। যতদিন ইনভেস্টিগেশন চলবে, বাবারা পার্টি থেকে সাসপেন্ড হয়ে থাকবে। অন্তত কাগজে তো সেরকমই লিখেছে দেখলাম।"

নলিনী প্লেট টেবিলে নামিয়ে কিছুক্ষণ হাত গুটিয়ে চুপ করে বসেছিল। তারপর বিড়-বিড় করে বলেছে, "আমি জানতাম। আমি জানতাম, একটা বড় কোনও বিপদ হবে।"

প্রতীক মুখ তুলে শান্ত গলায় বলেছিল, "এখন আর এসব ভেবে কী লাভ? খেয়ে নাও।"

মা ছেলের এই কথোপকথন জানতেন না জাহ্নবী পত্রনবিশ। দিঘির পাড়ে চলে আসার দু'দিন আগে প্রতীক ফোনে বাড়িতে থাকার প্রস্তাব দিলে, সে বলল, "সরি, এটা ছাড়া অন্য কোনও বিষয় থাকলে আমাকে বল।" এরপর আর কথা বাড়াননি জাহ্নবী। বুঝেছিলেন, ভাবা ভুল হয়েছিল। প্রতীক পত্রনবিশ শুধু তার ছেলে নয়, ছেলে সে তার মায়েরও। সে তার বাবার টাকা-পয়সা ছোঁবে না। কলকাতার বাড়িতে কেয়ারটেকার বসিয়ে জাহ্নবী দিঘির পাড় রওনা হয়ে যান প্রায় গোপনেই। ভেবেছিলেন, নিজের গ্রাম, সেখানে রাজনৈতিক ভাবে ক্ষমতা না থাকুক, নিজের পরিচিতি আছে। চুপচাপ থাকলে মানসম্মান নিয়ে থাকতে অসুবিধে হবে না। রাজনীতি তো আর করছেন না, ফলে গোলমাল হওয়ার সম্ভাবনা কম। এখন মনে হচ্ছে, সেটাও ভুল ভাবা হয়েছিল। তিনি যতটুকু খবর পাচ্ছেন, তাতে আজকের মিটিংয়ে 'জাহ্নবী পত্রনবিশ'কে তুলোধোনা করা হয়েছে।

খবরটা পুরো পাননি জাহ্নবী। 'তুলোধোনা'র চেয়েও যদি বেশি কিছু থাকে, আজ তাই হয়েছে। বাজারের মোড়ে দুটো তক্তাপোশ এনে স্টেজ বানানো হয়েছিল। তবে মাইক ছিল না। নিশিকান্ত মাইতির গলায় জোর খুব। তার চিৎকারেই লোক জমে গেল। শুধু গলায় জোর নয়, দিঘির পাড় গ্রামে স্কুল মাস্টার নিশিকান্তর আলাদা মর্যাদা আছে। লোকে তাকে পছন্দ করে। পছন্দ করার পিছনে বিরাট কোনও আত্মত্যাগ, নীতি, আদর্শ আছে এমন নয়। মানুষটার কোনও দুর্নাম নেই। এখন পর্যন্ত কেউ বলতে পারবে না, রাজনীতি করতে গিয়ে একটা পয়সাও নিজের পকেটে রেখেছে। লোকটার বড় গুণ, সবার সঙ্গে হেসে কথা বলে। অনেকে তাকে বলে, 'পুরনো জাহ্নবী পত্রনবিশ'। অল্প বয়সে জাহ্নবী পত্রনবিশ নাকি এরকম ছিলেন। সবার সঙ্গে হেসে কথা বলতেন। গ্রামে এলে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াতেন। কথা জাহ্নবী পত্রনবীশেরও কানে গিয়েছিল। 'বিরোধী পার্টির নোংরা প্রচার' বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। তলায়-তলায় চেষ্টা করেছিলেন, নিশিকান্তর স্কুলের চাকরিটায় গোলমাল পাকিয়ে দিতে। অনেকটা এগিয়েও ছিলেন। জেলার নেতাদের ধরে ওই স্কুল অফিসে পার্টির লোক খুঁজে বের করেছিলেন। পরিকল্পনা ছিল নিশিকান্তর নামে একটা টাকাপয়সার কেলেঙ্কারি ঢুকিয়ে দেওয়ার। শেষ পর্যন্ত দিঘির পাড়ের পার্টির লোকেরাই বারণ করল। ইলেকশনের আগে এ ধরনের কিছু করতে গেলে, ফল খারাপ হতে পারে। নিশিকান্ত মানুষটার সাহসও আছে। স্কুলে তার বিরুদ্ধে প্যাঁচ কষবার চেষ্টা হচ্ছে জেনেও, সে ঘাবড়ায়নি। এমন একটা সময় সে সরকারি পার্টির বিরুদ্ধে লড়েছে, যখন তাদের বিরুদ্ধে তো দূরের কথা, পক্ষে কথা বলতে গেলেও, অনেক সময় অনুমতি লাগত। দুটো গ্রাম পরেই নাকি এমন ঘটনা ঘটেছিল। শোনা যায় আশু না বিশু নামের এক হিমঘরের মালিক মোটা চাঁদা দিয়ে পার্টির মিছিলে হেঁটেছিল। সব মিলিয়েই নিশিকান্তর ইমেজ তৈরি হয়েছে। আজ সভায় সে-ই বলেছে সব চেয়ে বেশি।

"...অনেক দিন সহ্য করেছি, আর মাতব্বরি নয়। লক্ষ্মণ পাড়ুইকে আপনারা সবাই চেনেন। সে একসময় জাহ্নবী পত্রনবিশের পার্টি করত, এখন ভুল বুঝে আমাদের সঙ্গে এসেছে। আমরা তাকে সাদরে গ্রহণ করেছি। মানুষ যেমন ভুল করে, তেমন ভুল সংশোধন করবার সুযোগও তাকে দিতে হয়। আমরা লক্ষ্মণকে সেই সুযোগ দিয়েছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তার পুরনো পার্টি এটা সহ্য করতে পারছে না। জাহ্নবী পত্রনবিশ তাকে ডেকে হুমকি দিয়েছে। হুমকি দেওয়ার জন্য তিনি বেছে নিয়েছিলেন, লক্ষ্মণের নিতান্ত ব্যক্তিগত, পারিবারিক একটি বিষয়। কত বড় সাহস আপনারা ভেবে দেখুন! স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্যে বাইরের মানুষ নাক গলাচ্ছে! আগেও ওরা এই কীর্তি করে বেড়াত। আর লক্ষ্মণকে ডেকে কে ধমক দিচ্ছে? না যিনি নিজেই স্ত্রীর সঙ্গে ঘর করতে পারেননি। এই সব ব্যক্তিগত কথা বলতে আমাদের লজ্জা করছে। কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি। আমরা জানতে চাই, কোন পাপে জাহ্নবীবাবুকে তার স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ করেছে? কেন তারা আলাদা থাকেন? আপনারা নিশ্চয় খবর পেয়েছেন, বড়-বড় কেলেঙ্কারির অভিযোগে জাহ্নবীবাবুকে তার পার্টি সাসপেন্ড করেছে। এবার আপনাদের কাছে মারাত্মক একটা ঘটনা তুলে ধরব। এই কথা বলতে আমার লজ্জা হচ্ছে। জাহ্নবী পত্রনবিশের মতো মানুষ যে এমন নোংরা কাজ করতে পারেন! আজ বুঝতে পারছি কেন, তার স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন।" এই পর্যন্ত বলে নিশিকান্ত মাইতি থামে। কেউ একজন ভাঁড় এগিয়ে দেয়। অল্প কয়েকটা চুমুকে সেই চা শেষ করে ফের বলতে শুরু করে, "লক্ষ্মণকে জাহ্নবীবাবু বলেছেন, সে যেন তার স্ত্রীকে তার কাছে পাঠিয়ে দেয়। তিনি কথা বলবেন। ছি, ছি, চিন্তা করুন কত বড় নির্লজ্জ। উনি দেশের বাড়িতে এসে নাকি বিশ্রাম করছেন... আমরা বিশ্রাম করতে দেব না। আমরা বিচার করব। বিচারে যদি দোষী প্রমাণ হয়, তাহলে দিঘির পাড়ের মানুষই তাকে সাজা দেবে... গ্রামের বউয়ের এই অপমান আমরা সহ্য করব না। এবার আপনাদের কাছে বক্তব্য রাখবে লক্ষ্মণ নিজে। তারপর বলবেন মাধববাবু। লক্ষ্মণের শ্বশুরমশাই। তিনি জানাবেন, তার মেয়ে কত ভাল আছে। আমরা লক্ষ্মণের স্ত্রীকেও বলার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। সে প্রথমে ভয় পাচ্ছিল। আমরা তাকে বলি, ভয়ের কিছু নেই মা। আমরা তোমার পাশে আছি। খুবই আনন্দের বিষয়, সে দু'কথা বলতে রাজি হয়েছে। স্বামীর নামে কোনও মিথ্যা অভিযোগ সে মুখ বুজে মেনে নিতে পারবে না। আসুন, আমরা সবাই মিলে তার উদ্দেশ্যে করতালি দিই।"

গণেশ আসার আগেই এই ভাষণের খানিকটা সতু মারফত জাহ্নবীর কানে এসেছে। সতু চুপি চুপি এসেছিল।

গণেশ দাঁড়িয়েছিল ঘরের কোনায়। মাথা চুলকে বলেছে, "দাদা, যদি রাগ না করেন, একটা কথা বলব?"

জাহ্নবী বুঝতে পারছেন, চাদর গায়ে দিয়েও শীতটা যায়নি। তার মানে, জ্বর আসছে। তিনি মুখ তুললেন। গণেশ নিচু গলায় বলল, "আপনি কলকাতায় চলে যান দাদা। দিঘির পাড়ের অবস্থা আমি ভাল বুঝছি না। কিছু ঘটে না যায়।"

সত্যি কিছু ঘটল। রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরার সময় মার খেল গণেশ। একটু-আধটু মার নয়, বেধড়ক মার। মারের সময় লোহার রডও ব্যবহার করা হল। সাইকেল ফেলে দেওয়া হল পাশের পুকুরে। সঙ্গে শালা ছিল। সে অন্ধকারে খেত ভেঙে দৌড় দিল। যারা মারছিল, তারা কোনও গালি না দিয়ে ঠান্ডা গলায় বলে গিয়েছে, "তোকে আজ মারলাম, এর পর মারব তোর দাদাকে। তবে তোর মতো বাঁচিয়ে রাখব না। আর যেন দিঘির পাড়ে কখনও না দেখি।"

গলা শুনে চেনা-চেনা লেগেছে গণেশের। দাদার সঙ্গে এরা পার্টি করত না! এখনও কি পার্টিতে আছে? নাকি দল বদলেছে?

গণেশ মার খেয়ে দিঘির ধারে পড়ে আছে, এই খবর পেয়ে জাহ্নবী পত্রনবিশ যখন বাড়ি থেকে বেরতে যাচ্ছেন, তখন মোবাইল বেজে উঠেছিল। কলকাতার পার্টি অফিস থেকে অবন্তীবাবু, "জাহ্নবী, একটা খারাপ খবর আছে।"

জাহ্নবী বললেন, "জানি।"

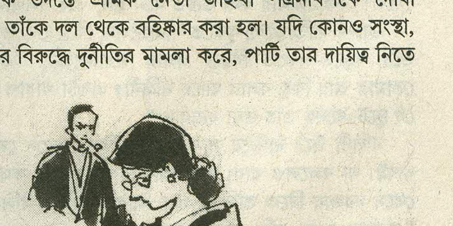
"এই মাত্র একটা প্রেস হ্যান্ড আউট সব কাগজ আর টিভি চ্যানেলের অফিসগুলোতে পাঠানো হল। মাত্র দুটো লাইন। পড়ি জাহ্নবীদা?"

জাহ্নবী পত্রনবিশ শান্তভাবে বলেছেন, "কাল সকালে পড়লে হত না?

অবন্তীবাবুর কাতর গলা, "আজই আপনাকে জানিয়ে দিতে হবে; অনেকক্ষণ থেকে চেষ্টা করেও লাইনটা পাচ্ছিলাম না।"

জাহ্নবী দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন, "আচ্ছা পড়ুন।"

"পার্টির প্রাথমিক তদন্তে শ্রমিক নেতা জাহ্নবী পত্রনবিশকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করা হল। যদি কোনও সংস্থা, সংগঠন বা ব্যক্তি তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা করে, পার্টি তার দায়িত্ব নিতে অপারগ।"



চশমাটা হাতে নিয়ে মেয়েটি বিড়বিড় করে কিছু একটা বলল। মনে হয়, ধন্যবাদ জাতীয় কিছু। কথাটা ঠিক বোঝা গেল না।

সুদর্শন জোয়ারদার চকোলেট রঙের একটা ড্রেসিং গাউন পরেছেন।

কোমরের প্যাঁচানো দড়িটা কালো। লম্বা হয়ে সেই দড়ি ঝুলছে। অনেকদিন পর ভদ্রলোক মুখে পাইপ নিয়েছেন। ঘরময় দামি তামাকের হালকা গন্ধ। টেনশনে থাকলে সুদর্শন জোয়ারদার পাইপ ধরান। পাইপের আগুন ঘন-ঘন নিভছে, তিনিও লাইটার দিয়ে যত্ন করে আগুন জ্বালাচ্ছেন। সম্ভবত এটাও টেনশন কমানোর একটা চেষ্টা।

টেনশনটা শুরু হয়েছিল সকাল আটটার কিছু পরে।

ঠিক আটটায় কনক ফোন করেছিল। ফোন করে জানালো প্রোজেকশন রিপোর্টের জেরক্স কপি কার্তিক মোদকের কাছে দিয়ে এসেছে। বেশি কাঠখড় পোড়াতে হয়নি। কাল রাতে ফোন করে ওর অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়েছিল। কার্তিক জিজ্ঞেস করেছিল, "আপনি কে?"

কনক বলেছিল, "আমি যে-ই হই না কেন, আপনার উপকারে লাগব। আমাকে সময় দিন। শিয়ালদা স্টেশনের বাস স্ট্যান্ডে কখন দাঁড়াবেন বলুন।"

"আমি আপনাকে চিনি না, জানি না, আপনার জন্য দাঁড়াব কেন।"

"না দাঁড়ালে, আমার কোনও সমস্যা নেই। আমি নেক্সট কাউকে ফোন করে নিচ্ছি। আপনাদের অনেকের ফোন নম্বর নিয়ে বসেছি। লোকসান আপনার, একটা বড় ক্রেডিট নেওয়ার সুযোগ আপনার হাত থেকে বেরিয়ে যাবে।"

কার্তিক বলেছিল, "কীসের ক্রেডিট?"

"শিয়ালদা ফ্লাইওভারের নীচে আসুন জানতে পারবেন। ওখান থেকে বজবজ চলে যাবেন। যেতে আপনাকে হবেই, আমি যে বোমা আপনার হাতে তুলে দেব, নিজে বেশিক্ষণ রাখতে পারবেন না।"

কার্তিক বলেছে, "আমি ট্রেনে বজবজ যাই না, বাসে যাই।"

"আজ ট্রেনেই যাবেন।"

কার্তিক রাজি হয়ে যায়। ফ্লাইভারের নিচে চায়ের দোকানে বসে কনক বলে, "আপনাদের ফ্যাক্টরি নিয়ে কন্সপিরেসি হচ্ছে। চক্রান্ত। আমার কাছে একটা মারাত্মক রিপোর্ট এসেছে। রিপোর্টটা কাজে লাগালে আপনাদের দফা গয়া। আমি আপনাকে এটা দিচ্ছি, আজই ফ্যাক্টরির সবাইকে দেখান। বিশ্বাস না হলে, লোকজনকে বলবেন পাসওয়ার্ড খুলে কম্পিউটারে দেখে নিতে। পাসওয়ার্ড নিচে লেখা আছে। এটাকে বলে প্রোজেকশন রিপোর্ট।"

কার্তিক হাঁ করে ছিল। প্রোজেকশন রিপোর্ট কী জিনিস!

কনক বলেছিল, "এটা একটা তৈরি জিনিস। এতে বলা আছে, আপনাদের কারখানার অবস্থা খুব খারাপ। আপনারা মাল ঠিক মতো তৈরি করেন না, তৈরি হলেও, বাজার বিক্রি নেই। এই কারখানা চালালে, কোম্পানির বিরাট লোকসান হয়ে যাবে। এর জন্য মিথ্যে সব ফিগার তৈরি করা হয়েছে। আপনারা যা তৈরি করেন, তার অর্ধেকও দেখানো হয়নি। সবই নাকি স্টকে পড়ে থাকে। বলা হয়েছে, যত দিন যাবে, বিক্রি না হওয়া মাল তত বেশি জমবে।"

কার্তিক মোদক চোখ কপালে তুলে বলল, "উরি শাল্লা, এতো পুরো উলটো। এটা কে করেছে? আপনি?"

কনক রেগে গেছিল, "বোকার মতো কথা বলবেন না। আপনাদের লোক না হয়ে, এই জিনিস করে কার বাপের সাধ্যি। যতদূর জানি, আপনাদের মালিক টাকাপয়সা ঢেলে কোম্পানিটাকে আরও বড় করতে চান। দু'একজন অফিসার এসব বদমাইশি করছে। মনে হয়, কারও টাকা খাচ্ছে। হতে পারে, অন্য কোনও কোম্পানির। এই রিপোর্ট দেখিয়ে চেষ্টা করছে, আপনাদের কারখানাটার পাকাপাকি সর্বনাশ করতে। যাকে কেউ আর টাকা না ঢালে, মালিকও ইন্টারেস্ট হারায়।"

"এ তো বড় হারামি ব্যাপার।"

"দ্বৈপায়ন মুখোপাধ্যায় নামে কে একজন আছে, সেই নাকি এসবের হোতা। বেটা আগেভাগে ক'দিনের ছুটি চেয়ে রেখেছে। গোলমাল করে ভেগে যাবে। খোঁজ নিয়ে দেখুন, ছুটির দরখাস্ত জমা হয়ে গিয়েছে।"

কার্তিকের চোখ আরও বড় হয়ে গিয়েছিল, "আপনি এত খবর জানলেন কোথা থেকে।"

কনক বলেছিল, "সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল, খবর সত্যি কিনা। প্রতীক নামে আপনাদের ওখানে কে আছে? কম্পিউটারে কাজ করে?"

"আছে। প্রতীক পত্রনবিশ। কমবয়সী ছেলে আছে। হিসেব-টিসেব নেয়; ছেলেটো ভাল।"

"খারাপ ভাল আপনারা জানেন। ছোকরা এই রিপোর্ট তৈরি করেছে। দেখবেন, রিপোর্টটার নীচে ওর সই আছে।"

এতখানি শোনার পর, সুদর্শন তাকে থামিয়েছিলেন। বলেছেন, "আর ওই মেশিনের বিষয়টা? ওটা বললে না?"

"বলেছি। আপনার কাছে যেমন যেমন ব্রিফ পেয়েছি, সব বলেছি। কাল রাতে বাড়িতে রিহার্সাল করে গিয়েছি। আমার অ্যাপ্রোচের মধ্যে একটা আপার হ্যান্ড নেওয়ার ব্যাপার ছিল। ধমক দিয়ে কথা বলছিলাম। বলেছি, 'ওই প্রতীক ছেলেটো আপনাদের মেশিনের মিটারে গোলমাল করে রেখেছিল না?' কার্তিক বলল, 'হ্যাঁ, একবার এরকম একটা গোলমাল হয়েছিল ঠিকই। আমিই বললাম, গোলমাল বলছেন কেন? ইচ্ছে করে করা। মিথ্যে ডেটা তৈরি করতে হলে, মিটারে গোলমাল করতে হয়।' কার্তিক তখন জানতে চাইল, 'আপনি আমার ফোন নম্বর পেলেন কোথা থেকে?' আমি বললাম, 'সেটা বড় কথা নয়, নম্বরটা ঠিক কিনা সেটা দেখুন। আমি এতক্ষণ যা বললাম সেটাও ঠিক। ফালতু কথা বাড়াবেন না, আপনি এখনই গিয়ে সবাইকে ঘটনা জানান। ইউনিয়নে আপনার দাম বাড়বে। ম্যানেজমেন্টের দালাল বলে, আপনার পিছনে যে স্ট্যাম্পটা আছে, সেটা মুছবে। বলা যায় না, এই চান্সে লিডার হয়ে যেতে পারেন।' কার্তিক তখন বিরাট চমকাল। বলল, 'এটাও শুনেছেন।' আমি উত্তর না দিয়ে বললাম, 'যা করার আজই করুন। নইলে বিপদে পড়ে যাবেন।' লোকটা বোকা বলে আসল প্রশ্নটাই করল না। ব্যাপারটা নিয়ে আমার এত উৎসাহের কারণ কী, সেটাই জানতে চাইল না। দাদা, এখন ছাড়ছি। পরে কোনও খবর পেলে জানাব।"

সুদর্শন জোয়ারদার ভেবেছিলেন, অফিস যাবেন। সেই পরিকল্পনা বাতিল করলেন। দ্বৈপায়নকে ফোন করে বলেছেন, "আজ আমি যাচ্ছি না। তুমি কি অফিসে থাকছ, নাকি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাওয়ার প্ল্যান আছে?"

"কেন স্যার?"

"একটু বেশি সময় পর্যন্ত থাকলে, ভাল হয়, আমার হয়তো দু'একটা ইনফর্মেশন লাগবে। তুমি প্রোডাকশনের অর্চিষ্মানকেও থাকতে বলো।"

"অবশ্যই বলব।"

দুপুরে টেনশনটা বাড়ল। কনক যেমন পরামর্শ দিয়েছে, সেই মতো ওরা কি আজই কিছু করবে? করলে, সেটা কী পর্যায়ে করবে? বড় কিছু? নাকি ছোটখাটো? যদি মিটিং ধরনের কিছু করে থেমে যায়, তা হলে আজকের অপারেশনটা ফেলিওর বলে ধরে নিতে হবে। তখন আবার নতুন করে ভাবতে হবে। আবার আজ কিছু না করে ওরা কাল-পরশু ম্যানেজমেন্টের কাছে গিয়ে ডেপুটেশন দিয়ে এনকোয়ারি চাইতে পারে। তখন টাকা ঢেলে লেবার খেপানো ছাড়া অন্য কোনও পথ থাকবে না। তবে একটা আশা আছে। কর্মচারীরা যদি মনে করে, চক্রান্তটা কোম্পানির নয়, বিচ্ছিন্ন ভাবে দু'জন কর্মীর কাজ, তা হলে একটা হট্টগোল হওয়ার পথ আছে। যেভাবে সাজানো হয়েছে, তাতে এমন হওয়ার সুযোগই বেশি। বিশেষ করে, সেদিন দিল্লি থেকে আসা ডেভলপারের টিমটাকে দেখে, অনেকেই ভুল বুঝেছিল। কাকপক্ষীও বুঝতে পারেনি, ওরা টাউনশিপের জায়গা দেখতে এসেছে। ওদেরও চুপ করে থাকতে বলা হয়েছিল। শুধু জায়গা জমি দেখে চলে যাবে। মডার্নাইজেশনের গুজবটা ছড়িয়ে কাজ হয়েছে। কনক আজ বুঝিয়েছেও ভাল। রাজনীতি করা লোক। কাজটা করে দিতে হবে বলায়, এক কথায় রাজি হয়ে গেল। সব চেয়ে বড় কথা, কোনও প্রশ্ন করেনি। শুধু বলেছিল, "কোনও একটা পাজি ম্যানেজারকে টাইট দিতে চাইছেন তো? নিশ্চিন্তে থাকুন। কাকে লাগাতে হবে, সেই লোকটার ফোন নম্বর দিন।" এত পরিকল্পনার পরও কি "অপারেশন সিংহদুয়ার" ফেল করবে?

মেয়েকে দুপুরে ফোনে ধরবার কথা ভেবেও পিছিয়ে যান সুদর্শন। রিয়া নিশ্চয় এখন ঘুমোচ্ছে। ঘুমোক। অর্পণকে ফোন করলে কেমন হয়? থাকুক। ওরা নিজেরা যেভাবে এগোতে চাইছে এগোক। অন্তত ছেলেটো এখনই যেন না বোঝে আসলে তাকে একটা 'জোর ধাক্কা' দেওয়ার জন্য ডাকা হয়েছিল। পরে রিয়ার কাছে শুনবে। বিয়ের পর 'স্বপ্ন' নিয়ে বসে থাকতে পারবে না। উপার্জনের জন্য কিছু একটা করতে হবে। হয় স্কুল মাস্টারের জন্য উদ্যোগ বাড়াতে হবে, নয়তো অন্য কোনও ভাবে কেরিয়ার শুরু করতে হবে। ঋতজা জোয়ারদার তখন আর শুধু তার প্রেমিকা নয়, স্ত্রীও। সুদর্শন নিশ্চিত, ছেলেটো পারবে।

দুপুরে সামান্য বিশ্রাম নিতে গিয়ে বুঝতে পারলেন, টেনশন বাড়ছে। বজবজের অবস্থা কী? কার্তিক কি বাকিদের বোঝাতে পারল? তারা কি রিপোর্টটার গুরুত্ব ধরতে পেরেছে? নাকি ফালতু বলে সরিয়ে রেখেছে? সোফায় হেলান দেওয়া অবস্থাতেই চোখ বুজলেন সুদর্শন। এই অপারেশন যদি ফেল করে তাহলে? যারা টাউনশিপ বানাচ্ছে, তারা তাগাদা দিয়েছে। হাতে বেশি সময় নেই। ফ্যাক্টরি শুধু বন্ধ করলেই তো হবে না, সবটা সেটল করতে সময় লাগবে। যেভাবেই হোক, জায়গাটা তাদের চাই। শহর প্রবেশের মূল ফটক ছাড়া তারা এগোতে পারছে না। খোদ এমডি কাল ফোন করে জানতে চেয়েছেন, অবস্থা কী? বলেছেন, "জোয়ারদার, ফার্স্ট ক্লোজ ইট। বাকিটা ওরা বুঝে নেবে। এমপ্লয়িদের কমপেনসেশন থেকে রিহ্যাবিলিটেশনের সব, ওরা দেখবে।"

একটা সময়ের পর সুদর্শন মোটামুটি ধরেই নিলেন, "অপারেশন

সিংহদুয়ার” ফেল করতে চলেছে। অন্যভাবে ভাবতে হবে। চেনা কোনও পথ। বাইরে এবং ভিতরে টাকা খরচ করতে হবে। ‘জাহ্নবী টিম’ ধরনের কিছু কি আজ আছে? যারা বাইরে থেকে গিয়ে হামলা করে আসবে? মনে হয় না। যারা নতুন ক্ষমতায় এসেছে, তারা চট করে কলকারখানা, অফিস-কাছারি বন্ধ করতে চাইবে না। ইমেজ নষ্ট হয়ে যাবে। তবে এরাই বা কতদিন কন্ট্রোলে রাখবে? পয়সা খরচ করলে, হামলা করার লোক ভাড়া পাওয়া যাবে। কাল থেকেই খোঁজ নিতে হবে।

সিকিউরিটি কিছুক্ষণ আগে ফোন করে জানাল, মেয়েটি এসে গিয়েছে। সুদর্শন জোয়ারদার দাঁতে কামড়ানো পাইপ থেকে ধোঁয়া ছাড়লেন। বললেন, “চশমাটা তোমারই তো?”

মেয়েটি প্রথমদিনের মতোই জড়সড়। সোফায় বসে আছে কোনরকমে। দুটো হাত কোলের উপর জড়ো করে রাখা। চোখ মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, সে বিস্মিত। সঙ্গে একটা অপরাধী ভাবও রয়েছে। যেমন এরকম একটা মানুষের কাছে চশমা ফেলে গিয়ে, সে নিজেই অন্যায় করেছে।

“হ্যাঁ, স্যার আমারই, কিন্তু আপনি এটা মনে করে রেখে দিয়েছেন?”

সুদর্শন সামান্য হেসে বললেন, “কী করা উচিত ছিল? ফেলে দেওয়া?”

সেন্টার টেবিলে রাখা ঢাকা দেওয়া গ্লাসটা দেখিয়ে মেয়েটি বলল, “আমি কি এই জলটা খেতে পারি?”

সুদর্শন হাত বাড়িয়ে বললেন, “অবশ্যই। ঠান্ডা সফট ড্রিঙ্ক দিতে বলব?”

মেয়েটি দু’পাশে মাথা নাড়িয়ে গ্লাসটা সাবধানে তুলে নেয়। সে আজও সাদামাটা সেজেছে। সস্তা ধরনের শাড়ি, জামা। গলার কাছে পাউডার খাবলা হয়ে আছে। তবে চশমাটা আলাদা। কালোর বদলে লাল। তাও পুরো লাল নয়, অনেকটা সর্ষের তেলের মতো রঙ। আরও একটা পার্থক্য আছে। যতই পাউডার লাগাক, মেয়েটির চোখমুখ বলছে, আজ সে ক্লান্ত। চোখের তলায় কালি। হয়তো সকাল থেকে কোথাও কাজ করছিল। ননা এরকম একটা কথা বলেছিল না? পুরো জলটা খেয়ে গ্লাসটা নামাল মেয়েটা। আঁচল তুলে মুখ মুছে নার্ভাস হাসল।

সুদর্শন পাইপ দাঁতে কামড়ে বললেন, “এটা নতুন চশমা? যেটা পরে আছ?”

মেয়েটি মুখ নামিয়ে বলল, “না স্যার, পাওয়ার বেশি বলে দুটো রাখি।”

“তুমি সেদিন বুঝতে পারনি, চশমাটা ফেলে গিয়েছ?”

চশমা বিষয়ে এত প্রশ্নে মেয়েটির অস্বস্তি বাড়ছে। সে ঢোঁক গিলে বলল, “পেরেছি স্যার...হোটেল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর...।”

সুদর্শন মুখ থেকে পাইপ বের করে হাতে নিলেন। বললেন, “সে কী! ফিরে এলে না কেন? এসে নিয়ে যাবে তো। চশমা খুব এসেন্সিয়াল জিনিস, বিশেষ করে পাওয়ার বেশি হলে তো বটেই।”

মেয়েটি মুখ তুলে নামিয়ে নিল। সুদর্শন বুঝতে পারলেন, কথাটা বোকার মতো হল। সেই রাতে মেয়েটি ফিরতে চাইলেই, ফিরতে পারত না। হোটেলের সিকিউরিটি অ্যালাউ করত না। একবার বের করে দিয়েছে, ব্যস। এই ধরনের বড় হোটেলে সামান্য বাজারের মেয়েকে ঘরে পৌঁছতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। টাকার পরিমাণ বেশি বলেই, সেই অসুবিধে এরা মেনে নিয়েছে। ঝলমলে, চকচকে হলে সমস্যা কম হত। গাড়ির গেট খুলে সিকিউরিটি সেলাম ঠুকলে ‘বাজারের মেয়েছেলে’ বলে কেউ বুঝতে পারত না। মাথা তুলে করিডর দিয়ে হেঁটে যেত।

সুদর্শন নরম গলায় বললেন, “আমার একটা কথা তুমি কি শুনবে?”

মেয়েটি দ্রুত পিঠ সোজা করে বলল, “স্যার, ভিতরে যাব?”

“না, না, ওসব নয়, তুমি বোসো। নাও। এই চশমাটা পরে বস। সেদিন তোমাকে বেশ লাগছিল।” সুদর্শন সামান্য হাসলেন।

এই ধরনের মেয়েদের ‘লজ্জা’ পাওয়া মানায় না। তারা পায়ও না। যেটুকু দেখাতে হয়, তা বানানো। যাকে দেখানো হয়, সেই পুরুষও বোঝে, বানানো। তবু পছন্দ করে। সম্ভবত বানানো লজ্জা দেখলে, নির্লজ্জ হতে বেশি ভাল লাগে। বহুদিন পর আজ “তোমাকে বেশ লাগছিল” শুনে এই মেয়েটি সত্যি সত্যি লজ্জা পেল। নড়বড়ে ফ্রেমের অতি তুচ্ছ একটা চশমার কারণে তাকে যে কেউ “বেশ লাগছে” বলতে পারে, সে কল্পনাও করতে পারেনি। কেউ কেউ কাপড় খোলার পর প্রশংসা করে। বাঁধা গতের মতো বলে, “বাঃ, বুক দুটো খুব সুন্দর তো!” গা গুলিয়ে ওঠে। তবু হাসতে হয়। লজ্জার অভিনয় করে, পায়ের কাছে পড়ে থাকা চাদর টেনে ঢাকতে হয় শরীর। এসব অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই মানুষটার কথা অন্যরকম। শুধু কথা নয়, মানুষটাই অন্যরকম। আগের দিনই বুঝে গিয়েছে। লোকটা কিছুই করেনি। শুধু গায়ে হাত রেখে শুয়েছিল। প্রথমে মনে হয়েছিল, ক্ষমতা নেই। মনে-মনে সতর্কও হয়েছিল সে। ক্ষমতাহীন পুরুষ সমস্যা করে। আঁচড়ায়, কামড়ায়। এমনকী, বেশি টাকা দিয়ে মারধরও করতে চায়। নিজের শরীরের অসুখ, অপমান ঝেড়ে ফেলতে চায়, ভাড়া করা মেয়েমানুষের ওপর। এই মানুষটি কিছুই করেনি। চুপচাপ শুয়ে থেকেছে অবাক করে! একসময় সে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করেছিল, “আপনার কী খারাপ লাগছে?” মানুষটা উত্তর দেয়নি। খুব কাছে সরতে গিয়েও ভরসা পায়নি। আবার জিজ্ঞেস করে, “স্যার, আপনার শরীর কি খারাপ লাগছে? মাথা ধরেছে? মাথা টিপে দেব?” কাস্টমারের ‘শরীর জাগানো’র কমন কায়দা। শরীর জাগলে, দ্রুত ছুটি পাওয়া যায়। মানুষটা চাপা গলায় গরগর করে ওঠেছিল, “শাট আপ।” একটা সময়ের পর উঠে পড়ে বলেছিল “পোশাক পরে নাও। আমি বলে দিচ্ছি, তোমাকে গেট পর্যন্ত পৌঁছে দেবে।” এই মানুষ অন্যরকম নয়? তবে সে খুব বেশি মাথা ঘামায়নি। ‘বড়লোক’দের এক-একদিন এক-একরকম খেয়াল হয়। সেদিন হয়তো শুধু শুয়ে থাকার শখ ছিল। আজ এই চশমা-কাণ্ডের পর মনে হচ্ছে, মানুষটা সত্যি অদ্ভুত। প্রথম দিন কাজ দেবার সময় ননাও সেরকম বলেছিল,“পার্টি পাগলাটে আছে। রঙচঙ ভেঙে চকচকে সেজে যাবে না। দামি সাজপোশাক, কসমেটিক্স সহ্য করতে পারে না। পরে ঝামেলা করে।”

“কাউকে একটা ছেঁড়া জামা পরে পাঠালেই তো হয়।”

ননা বলেছিল, “পাঠিয়েছিলাম, ধরে ফেলেছে। অদ্ভুত, বুড়ো মনে হয় গন্ধ পায়। এতদিন লাইনে আছি, এমন খদ্দের কখনও পাইনি। গরিব ছাড়া বিছানায় নেয় না। মেয়ে পাঠিয়ে, চিন্তায় থাকি, পার্টি ফসকে না যায়।”

“আমাকেও কি কালি-ঝুলি মাখতে হবে?”

ননা তাড়াতাড়ি বলেছিল, “খবরদার ওসব করতে যাবে না। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে যাবে, কিন্তু চেহারায় অভাবের ব্যাপারটা যেন থাকে। তুমি যা তাই থাকলেই চলবে।”

“একাজ সকলে অভাবেই করে।”

ননা বিশ্রী ভাবে হেসেছিল, “কিন্তু ভান করতে হয়, যেন সেজেগুজে প্রেম করতে এসেছে। পুরুষমানুষ প্রেমের জন্য ছুঁকছুঁক করে। ভাগ্যিস করে, নইলে আমরা শালা যেতাম কোথায়?”

মেয়েটি মুখ নামিয়ে চশমা বদলালো। নড়বড়ে ডাঁটিদুটো দু’হাতে ধরে সাবধানে কানের ওপর রাখল। সুদর্শন জোয়ারদার বললেন, “থ্যাঙ্ক ইউ। চা খাবে তো?”

কাল সকালে শিলিগুড়ি থেকে ফিরে সোজা বজবজ চলে গিয়েছিলেন সুদর্শন। ইচ্ছে করেই প্লেনে না ফিরে ট্রেনে এসেছেন। সকালটা কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। দ্বৈপায়ন আর অর্চিষ্মান দুজনেই গাড়ি নিয়ে শিয়ালদা স্টেশনে অপেক্ষা করছিল। পথে কথা বলতে বলতে গেছেন। বিষয় ছিল ‘জাতীয় অর্থনীতি’। রাতে কলকাতায় ফিরে ননাকে ফোন করলেন, “হ্যালো ননা।”

“স্যার আপনি কোথায়?”

সুদর্শন বললেন, “কলকাতায়।”

ননা খুশি হয়ে বলেছে, “বাঃ, এবার তো বেশি কিছুদিন থেকে গেলেন।”

“হ্যাঁ, একটা জরুরি কাজ আছে সেরে ফিরব।”

ননা একটু চুপ করে থেকে জানতে চেয়েছিল, “স্যার, আজ কাউকে পাঠাব?”

“সেই জন্যই ধরলাম। আগের বারের ওই মেয়েটিকে বলা যাবে? আজ নয়, কাল।”

“অবশ্যই যাবে স্যার। কখন? আগের দিন যেমন গিয়েছিল? ন’টা?”

সুদর্শন বলেছেন, “না, তার আগে। বিকেল।”

“বিকেলে।” ননা অবাক হয়েছে।

“হ্যাঁ, কোনও সমস্যা আছে?”

ননা আমতা-আমতা করে বলেছে, “না তা নয়, বিকেলের দিকে ওকে পাব কিনা ভাবছি। আসলে এই ধরনের মেয়েরা তো ফুল টাইম কাজ করে না। ছোটখাটো অন্য কাজও করে। তাতে চলে না বলেই...”

সুদর্শন জোয়ারদার এই কথায় গুরুত্ব দেননি। বলেছেন, “আমি কাল বিকেলের আগেই কলকাতায় ফিরে আসব। তুমি যদি মেয়েটিকে বিকেলেই আসতে বল, আমার পক্ষে সুবিধে হয়। অড টাইম? চিন্তা কোরো না, আই শ্যাল পে ফর দ্যাট।”

টাকার কথায় ননা গদগদ হয়ে গিয়েছিল,“ছি, ছি, আপনি বেশি পেমেন্টের কথা বলছেন কেন স্যার? আপনার সঙ্গে কি আজ নতুন কাজ করছি? ওকে আমি এখনই খবর দিচ্ছি। দরকার হলে, চাপ দেব। আপনার মতো মানুষের যে ওকে পছন্দ হয়েছে, এটাই ওর পক্ষে অনেক। কাজ পেতে এদের স্যার অসুবিধে হয়। তেমন চটক নেই তো।”

সুদর্শন কথা থামিয়ে বলেছিলেন, “ঠিক আছে, তুমি দ্যাখো।”

চাপ বা টাকা যেটাই কাজ করুক, মেয়েটি চারটের একটু পরে পরেই এসে গিয়েছিল। পিছনের গেটের সিকিউরিটি ইন্টারকমে চাপা গলায় জানতে

চেয়েছে, "স্যার, এখনই আপনার রুমে পৌঁছে দেব? নাকি ঘুরে আসতে বলব কিছুক্ষণ?"

সুদর্শন পৌঁছে দিতে বলেছিলেন।

নিভে যাওয়া পাইপ টেবিলে রেখে সুদর্শন বললেন, "তুমি কাজকর্ম কিছু কর?"

মেয়েটির খানিকটা সহজ লাগছে। সে অস্ফুটে বলল, "করি স্যার, একটা এসটিডি বুথে মর্নিং ডিউটি। খুব সকালে যেতে হয়।"

"কোথায়? তোমার পাড়ায়?"

"না, স্যার। পোস্তার কাছে, ওখানে সারারাত বুথে কাজ হয়। বাইরে থেকে লরি আসে।" মেয়েটি একটু চুপ করে থেকে বলল, "যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা বলব স্যার?"

সুদর্শন পাইপটা হাতে তুলে কিছু একটা বলতে গেলেন, তখনই টেবিলে রাখা মোবাইলটা বেজে উঠল। ফোনটা হাতে নিয়ে নম্বর দেখলেন সুদর্শন। কনক। প্রায় লাফ দিয়ে উঠলেন সুদর্শন। ইঙ্গিতে মেয়েটিকে বসতে বলে, পাশের ঘরে ঢুকে গেলেন।

"বলো কনক।"

"মনে হচ্ছে, আজ থেকেই ঝামেলা শুরু হয়ে যাবে।"

"কী করে জানলে? কার্তিক ফোন করেছিল?"

"হ্যাঁ, তবে নিজে কথা বলেনি। ইউনিয়নের কোনও লিডারকে ধরিয়ে দিল। লোকটা ধন্যবাদ দিয়ে বলল, ওরা কম্পিউটারে রিপোর্টটা দেখেছে। প্রতীকের মতো ছেলে যে এরকম একটা নোংরা কাজ করতে পারে, ভাবতেও পারছে না। এতগুলো মানুষের ভাত মারার প্ল্যান। ওদের ধারণা আপনাদের ওই লোকটাই নাটের গুরু। কী যেন নাম? ওই যে ম্যানেজার..."

সুদর্শন বললেন, "দ্বৈপায়ন।"

"হ্যাঁ, ওই দ্বৈপায়ন। আজ বিকেলেই নিজেরা বসছে। মনে হয় লোকটার শাস্তি দাবি করে, গেট মিটিং করবে।"

সুদর্শন খানিকটা হতাশ হয়ে বলল, "শুধু মিটিং?"

কনক উৎসাহ নিয়ে বলল, "তাই হোক না। আস্তে-আস্তে বাড়বে। কাল পরশু নিশ্চয় ওরা ম্যানেজমেন্টের কাছে যাবে। ব্যস, সঙ্গে-সঙ্গে ওই লোককে সাসপেন্ড করে তদন্ত ডিক্লেয়ার করে দেবেন। কম্পিউটারের ছোকরাকেও জড়িয়ে নেবেন। কেসটা জোরদার হবে। আপনি কলকাতায় আছেন কতদিন?"

দ্বৈপায়ন আর প্রতীককে সাসপেন্ড করে লাভ কী? বলতে গিয়েও চুপ করে গেলেন সুদর্শন জোয়ারদার। কনক "অপারেশন সিংহদুয়ার"-এর আসল কারণটাই জানে না। সুদর্শন অন্যমনস্ক ভাবে বললেন, "আমি কাল-পরশু চলে যাব ভেবেছিলাম, এখন দেখা যাক। তোমাক ধন্যবাদ কনক। কাজটা জটিল ছিল। ঘরের লোক দিয়ে করানো যেত না। দেখলেই তো, প্রতীক ছেলেটার একটা পপুলারিটি আছে। ওই ম্যানেজারের কাজ সম্পর্কেও এমপ্লয়িরা খুশি। আমরা যদি হুট করে কিছু করতে চাইতাম, ভাবত কোম্পানির কোনও রাগ আছে। যাই হোক, এখন ওরাই শাস্তি ডিমান্ড করুক। ধন্যবাদ, তুমি বড় ঝক্কি সামলে দিলে। তোমার ছেলের সিভিটা পরশুই আমাকে মেল করে দিও।"

বাইরের ড্রইং স্পেসে ফিরে এলেন সুদর্শন। বসলেন না। গাউনের পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করলেন দুটো পাঁচশো টাকার নোট এগিয়ে বললেন "নাও ধরো।"

মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়েছে। আমতা-আমতা করে বলল, "স্যার, আমি তো কিছুই করলাম না!"

সুদর্শন বললেন, "আমি তোমাকে চশমাটা ফেরত দিতেই ডেকেছিলাম। ননার কাছে পাঠিয়ে দিলেও হত, তবু মনে হয়েছিল...যাক, নাও ধরো।"

মেয়েটি হাত বাড়াল না। মাথা নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সুদর্শন চাপা ধমকের গলায় বললেন, "কী হল! আমি কী টাকা হাতে দাঁড়িয়ে থাকব? আমি তোমার সময় নিয়েছি, তার দাম দিচ্ছি। তোমার সঙ্কোচ কীসের?"

শাড়ির ভেতর থেকে শীর্ণ হাত বাড়িয়ে দিল মেয়েটি। টাকা দিয়ে সুদর্শন নিচু গলায় বললেন, "আমি গেটে বলে দিচ্ছি। তুমি কিছু একটা বলতে চাইছিলে না? আমি জানি কী বলতে চাইছিলে। সরি, আমি কাউকে সাহায্য করি না। তবু তুমি তোমার প্রয়োজন বলতে পার।"

ফ্যাকাসে মেয়েটি মুখ তুলে আবার নামিয়ে নিল। দু'পাশে মাথা নেড়ে বলল, "সাহায্য নয় স্যার, কোনও কারণে আপনাকে আজ খুব অশান্ত লাগছে, তাই বলছিলাম..." মেয়েটি চুপ করল।

সুদর্শন অবাক হয়ে ভুরু কোঁচকালেন। বললেন, "কী বলছিলে?"

মেয়েটি ঠোঁটের কোণায় মৃদু হেসে বলল, "থাক। আমার মতো মেয়ের পক্ষে আপনাকে বিশ্রাম নিতে বলা অপরাধ। আপনি আমার প্রণাম জানবেন। ভাল থাকবেন স্যার।"

মেয়েটি চলে যাওয়ার পর অনেক সময় সোফায় বসে রইলেন সুদর্শন। একটু যেন তন্দ্রা মতো এলো। তারই মাঝে কেন জানি মনে হল, ফ্যাকাসে মেয়েটির নাম জানতে ইচ্ছে করছে। জানাটা কোনও সমস্যার নয়। ননাকে জিগ্যেস করলেই হবে। কিন্তু সেভাবে নয়, ইচ্ছে করছে, মেয়েটির মুখ থেকে শুনতে। আচ্ছা, আজ রাতে যদি মেয়েটার বাড়িতে চলে যান? মেয়েটি কি ভীষণ আশ্চর্য হবে না? নিশ্চয় হবে। বলবে, "আপনি!"

"হ্যাঁ আমি। তুমি আমাকে বিশ্রাম নিতে বলে চমকে দিয়েছিলে, এবার আমি তোমাকে কেমন অবাক করলাম। তোমার নাম জানতে এসেছি।"

"সে কী! এত রাতে আপনি শুধু আমার নাম জানতে এসেছেন? আপনি কি স্যার পাগল?"

"হ্যাঁ আমি পাগল। পাগল না হলে কেউ কখনও ফেলে আসা 'দারিদ্র্য'র সঙ্গে রাত কাটাতে বাজারের মেয়েছেলে ভাড়া করে? তার অভাবের গন্ধে শরীরে ঘোর লাগে? এই যে মেয়ে, আমার স্ত্রীও মানসিক ভাবে অসুস্থ ছিলেন। তিনি ছিলেন সন্দেহ রোগী। কিন্তু তিনি খারাপ ছিলেন না। আমি কাউকে সন্দেহ করি না। তবু আমি খারাপ। সিংহদুয়ার পেরিয়ে রাজপ্রাসাদে ঢুকতে গেলে, খারাপ না হয়ে উপায় আছে? হয় সিংহদুয়ার বানাতে হবে, নয় তো ভাঙতে হবে। যদি না পার, সারা জীবন দুয়ারের বাইরে দাঁড়িয়ে থাক, ভিক্ষাপাত্র হাতে।"

মেয়েটি কি তখন খিলখিল আওয়াজে হেসে উঠবে? নিশ্চয় উঠবে। বলবে, "স্যার, আপনি কি বলছেন? মাথামুণ্ডু কিছুই তো বুঝতে পারছি না।"

তন্দ্রা কেটে ধড়ফড় করে উঠে বসলেন সুদর্শন জোয়ারদার। ঘরে আলো জ্বালানো হয়নি। বাইরে অন্ধকার নেমেছে। তিনি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন? তাই হবে। নইলে হাবিজাবি এসব কেন ভাববেন? মনে-মনে হাসলেন সুদর্শন জোয়ারদার। রুম সার্ভিসে ডায়াল করে কফি পাঠাতে বললেন। পাইপটা কোথায় গেল?

সন্ধে সাতটার অল্প কিছু পর থেকে সুদর্শন জোয়ারদারের মোবাইলে ধাপে-ধাপে 'খবর' আসতে শুরু করল।

প্রথমে আসে গোলমাল শুরুর খবর। গোলমাল প্রথমে শুরু হয়েছে ফ্যাক্টরি গেটে। অফিসের কিছু স্টাফ এবং মেশিনরুমের কয়েকজন জমা হয়ে চিৎকার চেঁচামিচি করছে। উত্তেজনা বাড়ছে। ভিড় বাড়ছে। পরের পর্যায়ের খবর এলো আরও পনেরো-কুড়ি মিনিট বাদে। গোলমাল ফ্যাক্টরি গেট থেকে অফিস পর্যন্ত ছড়িয়েছে। ভিড় বাড়ছে। এমন সময় কফি এল। বেয়ারা ট্রে নামিয়ে কফি বানিয়ে দিতে চাইছিল। সুদর্শন তাকে চলে যেতে বললেন। নিজেই দুধ চিনি ছাড়া কফি তৈরি করলেন। সেই কফি খেতে-খেতেই বড় খবর এল। কম্পিউটার ডিভিশনে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই আগুনে ডিভিশনের ইনচার্জ প্রতীক পত্রনবিশ আহত হয়েছে। এরপর বেশি কিছুটা সময় চুপচাপ কাটল। পরের অংশ জানতে বেশ খানিকটা সময় লেগে গেল সুদর্শন জোয়ারদারের। প্রতীক সিক্সটি পার্সেন্টের ওপর পুড়ে গিয়েছে। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও, বাঁচবে কিনা সন্দেহ। এর মাঝখানে পালাতে গিয়ে মার্কেটিং ম্যানেজার দ্বৈপায়ন মুখোপাধ্যায় কর্মীদের হাতে ধরা পড়েছে। তাকেও মারধর করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। কফি শেষ হয়ে যাবার বেশ খানিকটা পর সুদর্শন জানালেন পুলিশ ফোর্স পৌঁছে গিয়েছে। গোলমালের কারণ এখনও পুরোটা জানা যায়নি। কোনও একটা মিথ্যে রিপোর্ট নিয়ে ঘটনার সূচনা বলে প্রাথমিক ভাবে সন্দেহ করা হচ্ছে। শ্রমিক কর্মচারীরা শান্ত ভাবে বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়ে।

সুদর্শন জোয়ারদার বেরোনোর জন্য সোফা ছেড়ে উঠে পড়লেন। তিনি খুশি। বজবজ ইউনিটের কর্মীদের দায়িত্ববোধ দেখে তিনি খুশি। তারা জেনারেল ম্যানেজারকে দফায়–দফায় গোলমালের খবর জানিয়েছে।

গাড়িতে যেতে যেতে সুদর্শন মুম্বইতে ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে ফোনে ধরলেন।

"স্যার, অপারেশন সিংহদরজা সাকসেসফুল।"

"ওয়েলডান জোয়ারদার।"

সুদর্শন বিনয়ের সঙ্গে বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। আপনি এখনই বজবজ ইউনিট বন্ধের নোটিশটা ফ্যাক্সে পাঠিয়ে দিন। এটা হেড অফিস থেকে আসাই ভাল।"

জেলা হাসপাতালে গণেশের ভর্তির ব্যবস্থা করতে গিয়ে অনেকটা সময় লেগে গেল জাহ্নবী পত্রনবিশের। ক'দিন আগেও ফোনে-ফোনে এইসব কাজ করেছেন। একটা, দুটো নয় অজস্র করেছেন। আজ বিস্তর ছোটাছুটি করতে হল। চেনা মানুষগুলো চিনতে পারল না। ক্ষমতা না থাকলে, মানুষকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে এত কষ্ট!

বিধ্বস্ত হয়ে বেরোবার মুখে ফোন করল নলিনী। এত রাতে নলিনী!

নলিনী কাঁদতে-কাঁদতে যা বলল তার পুরোটা বোঝা গেল না। শুধু বোঝা গেল, এখুনি কলকাতায় যেতে হবে। প্রতীকের একটা কিছু হয়েছে। সেটা ভয়ঙ্কর কিছু। এত ভয়ঙ্কর যে মুখে বলতে পারছে না নলিনী। সে চিৎকার করে কাঁদছে।

অন্ধকারে থমকে দাঁড়ালেন জাহ্নবী। এই কান্না কি তিনি চিনতে পারছেন? প্রিয়জন মারা গেলে, মানুষ এ ভাবে কাঁদে না?



সুদর্শন জোয়ারদার তাঁর কালো গদির চেয়ারে বসে অল্প-অল্প করে দোল খাচ্ছেন। মাথা এলানো। চোখ বোজা। হাতে একটা কালো আগুনহীন পাইপ। তিনি সেই পাইপটা মাঝেমধ্যে টেবিলে আলতো করে ঠুকছেন।

গোটা অফিস এবং কারখানা চত্বর পুলিশ খালি করে দিয়েছে। এখন পর্যন্ত বাইশজনের মতো অ্যারেস্ট হয়েছে। সম্ভবত রাতের মধ্যে সংখ্যা আরও বাড়বে। পুলিশ চেষ্টা করছে, কম্পিউটার ডিভিশনে আগুন কে লাগিয়েছিল তাকে খুঁজে বের করতে। কানাঘুষোয় শোনা যাচ্ছে, ঘটনায় বাইরে থেকে ইন্ধন এসেছে। সকাল থেকেই নাকি চাপা উত্তেজনা ছিল। গেটের বাইরে গুজব ছড়াচ্ছে বেশি। পুলিশ গেটের বাইরের জটলাও সরিয়ে দিয়েছে।

খানিক আগে ম্যানেজারদের নিয়ে মিটিংয়ে বসেন সুদর্শন জোয়ারদার। আলোচনার বিশেষ কিছু ছিল না। শুধু তিনিই বলেছেন, "এমডি চাইছেন না, এই অবস্থায় আর একদিনের জন্যও বজবজের এই ইউনিট খোলা থাকুক। এতজন শ্রমিক কর্মচারীর জীবনের ঝুঁকি তিনি নিতে চান না। সুতরাং মুম্বই থেকে যে ক্লোজার নোটিশটা তিনি পাঠিয়েছেন, সেটা আমরা লাগিয়ে দিচ্ছি। কিছুদিন কেটে গেলে, সিচুয়েশন রিভিউ করা যাবে। দ্যাটস্ অল।"

ম্যানেজাররা বেরিয়ে গেলে লোকাল থানার ওসি এলেন।

"একটা খারাপ খবর আছে। প্রতীক পত্রনবিশ নার্সিংহোমে মারা গিয়েছেন।"

চেয়ারের হাতল ধরে নিজেকে কোনওরকমে সামলালেন সুদর্শন জোয়ারদার। বললেন, "কী! প্রতীক মারা গিয়েছে?"

ওসি থমথমে গলায় বলল, "সরি মিস্টার জোয়ারদার। এইমাত্র ওয়ারলেসে খবর পেয়েছি। পেয়েই আপনাকে জানাতে এলাম। এসপি সাহেব আলিপুর থেকে আরও ফোর্স পাঠাচ্ছেন।"

সুদর্শন অস্ফুটে বললেন, "আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।"

ওসি বললেন, "ডাক্তাররা বলেছেন, পেট আর বুকের কাছটা বেশি পুড়েছে বলে সময় পাওয়া গেল না।"

ওসি ঝুঁকে পড়ে গলা নামিয়ে বললেন, "মিস্টার জোয়ারদার, ওই ছেলে, মানে ওই পত্রনবিশ কি কোনও ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত ছিল? কোনও পলিটিক্যাল ইনভলভমেন্ট? পার্টিবাজি করত?"

দাঁতে-দাঁত চেপে নিজেকে অনেক কষ্টে ঠিক রেখেছেন সুদর্শন। কোনওরকমে বললেন, "আমি যতদুর জানি, ছেলেটি রাজনীতি থেকে দূরে থাকত।"

ওসি সোজা হয়ে বসে একগাল হাসলেন। বললেন, "বাঁচা গেল। পলিটিক্যাল কানেকশন থাকলে, কাল তুলকালাম হয়ে যেত। বনধ, অবরোধ। ঘাম ছুটিয়ে ছাড়ত শালারা। অবশ্য ম্যানেজমেন্টের লোক মারা গিয়েছে, এটাও একটা বাঁচোয়া।"

ওসি চলে যাওয়ার পর থেকেই চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে আছেন সুদর্শন জোয়ারদার। এখন কী করবেন? কী করা উচিত? যা করা উচিত, তা কি তিনি করবেন? সে সাহস কি তার আছে? হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে মোবাইলটা তুলে মেয়েকে ধরলেন।

"কেমন আছিস মা?"

"ভাল। তুমি কেমন আছ বাপি?"

"খুব ভাল। তোদের বিয়ের ব্যাপারটা ফাইনাল তো?"

"বলব না। অর্পণ বলেছে, আগে রেজিস্ট্রি খাতায় সই করে তারপর তোমার সঙ্গে দেখা করবে। তার আগে বলা বারণ।" রিয়া হাসল।

"গুড। আমি রাজি। এই বিয়ে তোমরা তোমাদের মতো লুকিয়ে করে নাও, কিন্তু ঢাকঢোল পেটানোর বিয়ে খুব বড় করে হবে, তখন না বলা যাবে না।" সুদর্শন চাপা গলায় হাসলেন।

রিয়া আহ্লাদী গলায় বলল, "জানি না, যাও।"

"তিন জায়গায় ধুমধাম হবে। কলকাতা, মুম্বই আর তোর বর যে গ্রামে গিয়ে পড়াবে, সেখানে। গ্রামে আবার একদিনে বিয়ে হয় না, সাতদিন ধরে হইচই লাগে। নাচ, গান, যাত্রা, সব হয়। ভাবছি, এখনই একটা যাত্রা বায়না করে রাখব।"

রিয়া বলল, "ভাল হবে না কিন্তু।"

"ভাল থাকিস মা। দু'জনে মিলে সুখে থাকিস।"

পরের ফোনটা অনুজকে। পার্সোনাল সেক্রেটারি। অনুজই একমাত্র জানে, সাহেবের টাকাপয়সা কোথায়, কীভাবে রাখা আছে। ফ্ল্যাট, জমির কাগজপত্রও তার জিম্মায়। সমস্যা কোথাও নেই। অলকার মৃত্যুর পর, প্রায় সবই মেয়ের নামে লিখে দেওয়া আছে। তাছাড়া অনুজকে আরও একটা কথা বলতে হবে। কনকের ছেলের নাম যতদুর মনে পড়ছে ঋত্বিক। পদবিটা মনে পড়ছে না। কলকাতা থেকে এই নামে কেউ মেলে সিভি পাঠালে, তার কাজের একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

ক্লান্ত পায়ে শূন্য করিডর ধরে হাঁটতে লাগলেন সুদর্শন জোয়ারদার। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এখান থেকে বেরিয়ে প্রথমে হাসপাতালে যাবেন। জাহ্নবী পত্রনবিশের মুখোমুখি হবেন। বলবেন, "আমি আপনাকে ক্ষমা করিনি, আপনিও আমাকে ক্ষমা করবেন না। আমার চরম শাস্তি পর্যন্ত আইনি লড়াই লড়বেন। আপনার মনে আছে কিনা জানি না, একদিন পুলিশ যাতে ধরতে না পারে, ভয় পেয়ে আপনার কথায় পালিয়ে গিয়েছিলাম। আজ পালাব না। আমি এখান থেকে থানায় যাচ্ছি। সারেন্ডার করব।"

শুনশান গাড়ি বারান্দা। ইতস্তত ভাঙা কাচ, পাথর, বাঁশের টুকরো ছড়িয়ে আছে। পোড়া একটা গন্ধ আসছে কি? হতে পারে। কোথায় যেন শুনছিলেন, যে আগুনে মানুষ পোড়ে, তার গন্ধ থেকে যায় দীর্ঘক্ষণ। ড্রাইভার এসে স্যালুট দিয়ে দরজা খুলে দাঁড়াল। সুদর্শন জোয়ারদার গাড়িতে উঠতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। মাথা তুলে তাকালেন একবার।

অদৃশ্য এক আকাশচুম্বী সিংহদুয়ার ক্লান্ত মানুষটার দিকে তাকিয়ে হাসছে।





নায়িকা সংবাদ

মীনাকুমারী, সুচিত্রা সেন, শর্মিলা ঠাকুর, অপর্ণা সেন, রেখা, শ্রীদেবী...

হিন্দি-বাংলার অতীতের ছয় সুন্দরী নায়িকার রূপে দেখা দিলেন একালের সুন্দরী কোয়েল মল্লিক।

কখনও তিনি ‘ইন্দ্রাণী’, কখনও ‘ছোটি বহু’। কখনও ‘মিস ক্যালকাটা’ কখনও আবার ‘উমরাও জান’! সঙ্গে এঁদের সম্বন্ধে কোয়েলের বিশ্লেষণ।

নূতন-পুরাতন যেন মিলেমিশে একাকার এই ফোটোশুটে!



ফোটো: সোমনাথ রায়
মেকআপ: জিতু
স্টাইলিং: স্যান্ডি

মহানায়িকা

‘সপ্তপদী’র রিনা ব্রাউন কিংবা ‘হারানো সুর’-এর রমা...সুচিত্রা সেনকে বাঙালি ভালবেসেছে সব রূপেই। সাধারণ খোলের তাঁতের শাড়ি-ব্লাউজ় পরে, দু’টি বিনুনি বেঁধে পাশের বাড়ির মিষ্টি মেয়েটি থেকে শুরু করে শার্ট-স্কার্ট পরিহিতা খাঁটি মেমসাহেব, যে-কোনও সাজেই তিনি ছিলেন সমান সুন্দরী!



“ ‘বর্ন স্টার। প্রচণ্ড স্ট্রং পার্সোনালিটি অন স্ক্রিন, যে ফ্রেমে আসছেন, শি ইজ় জাস্ট বার্নিং ইট উইথ ফায়ার! প্রতিটা ছবিতে ওঁর আলাদা চরিত্র ছাপিয়ে ওঁর সুপারডুপার অ্যাটিটিউড, উফ, সত্যি, হিংসে হয়! তা ছাড়াও ওঁর মধ্যে একটা ‘এক্স ফ্যাক্টর’ ছিল, যেটা উনি নিয়েই জন্মেছিলেন। ওটা বাইরে থেকে আসে না! আর ওটা না থাকলে ওই অসামান্য উচ্চতায় পৌঁছনো যায় না! ”



“‘সাহিব, বিবি অউর গুলাম’-এ ঘরের বউয়ের ওই ট্রান্সফর্মেশন উনি যতটা বিশ্বাসযোগ্যভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন, সেটাই প্রমাণ করে, মীনাকুমারী কতটা পাওয়ারফুল অভিনেত্রী!”

ফোটো: সোমনাথ রায়
মেকআপ: নবীন দাস
অলঙ্কার সৌজন্য:
শ্যামসুন্দর কোম্পানি জুয়েলারি
স্টাইলিং: স্যান্ডি

ট্র্যাজেডি কুইন

না জাও সইয়াঁ ছুড়াকে বইয়াঁ, কসম তুমহারি, ম্যায় রো পড়ুঙ্গি, ম্যায় রো পড়ুঙ্গি...‘সাহিব, বিবি অউর গুলাম’-এর বিমর্ষ, বঞ্চিতা, ভাগ্যচক্রে অবসাদগ্রস্তা ‘ছোটি বহু’ হিসেবে মীনাকুমারী ভারতীয় দর্শকের মনের মণিকোঠায় চিরস্থায়ী আসন নিয়েছেন!

ফোটো: সোমনাথ রায়
মেকআপ: জিতু
স্টাইলিং: স্যান্ডি



আমি মিস ক্যালকাটা, চাই না দিতে টিপ্‌স, এখনও তো কেউ জানে না আমার স্ট্যাটিস্টিক্স, আমি মিস ক্যালকাটা নাইন্টিন সেভেন্টি সিক্স...এই একটি গান দিয়েই 'মিস ক্যালকাটা' শিরোপাটিকে এক ধাক্কায় জনপ্রিয় করে দিয়েছিলেন অপর্ণা সেন! পর্দায় তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত উপস্থিতি নজর কাড়ত সকলেরই।

আধুনিকা



"অপর্ণা সেন একজন অসম্ভব ডায়নামিক, ইন্টেলেকচুয়াল মহিলা। আ পারফেক্ট কম্বিনেশন অফ বিউটি উইথ ব্রেন। 'সমাপ্তি' থেকে শুরু করে 'ইতি মৃণালিনী' অভিনেত্রী হিসেবে উনি নিজের প্রতিভার পরিচয় দিয়েই চলেছেন!"



রহস্যময়ী

ফোটো: সোমনাথ রায়
মেকআপ: নবীন দাস
পোশাক: সৌমিত্র মণ্ডল
অলঙ্কার সৌজন্য:
শ্যামসুন্দর কোম্পানি জুয়েলারি
স্টাইলিং: স্যান্ডি

এক তুম হি নহি তনহা, উলফত মেঁ মেরি রুসওয়া, ইন শহর মেঁ তুম জ্যায়সে দিওয়ানে হাজ়ারোঁ হ্যায়... উমরাও জান নয়, এ যেন রেখারই কথা! তাঁর অভিনয় নিয়ে বিশেষ কিছু বলার প্রয়োজন নেই। স্রেফ 'উমরাও জান'ই তাঁকে অমর করে রাখার জন্য যথেষ্ট!

“কেন জানি না, আমার মনে হয়, 'রেখা' আর 'উমরাও জান' নামদু'টি সমার্থক! সময় এগিয়েছে, কিন্তু রেখার সৌন্দর্যের উপর তা যেন কোনও রেখাপাত করতে পারেনি! উনি অসম্ভব ব্যক্তিত্বময়ী মহিলা। জাগতিক কোনও সুখ-দুঃখ যেন ওঁকে স্পর্শ করতে পারে না!”



অনুপমা



“সাহসিনী! শর্মিলা ঠাকুর বলতেই আমার প্রথমেই এই বিশেষণটিই মনে আসে। তখনকার দিনে ঠাকুরবাড়ির মতো অভিজাত পরিবারের সদস্যা হয়েও ফিল্মে বিকিনি ক্যারি করা... অথচ সেটাও উনি কত এফর্টলেসলি করেছিলেন!”

ফোটো: সোমনাথ রায়
মেকআপ: নবীন দাস
শাড়ি: সৌমিত্র মণ্ডল
অলঙ্কার সৌজন্য: শ্যামসুন্দর কোম্পানি জুয়েলারি
স্টাইলিং: স্যান্ডি

বাংলা থেকে হিন্দি, শর্মিলা ঠাকুর রাজত্ব করেছেন সর্বত্র। ‘অপুর সংসার’ থেকে শুরু করে ‘অমর প্রেম’, ‘দেবী’ থেকে ‘অ্যান ইভনিং ইন প্যারিস’, খোলা চুল, বড় লাল টিপের বাঙালি বধূ কিংবা সুইমসুট শোভিতা ফ্যাশনিস্তা, শর্মিলা যে চরিত্রে অভিনয় করতেন, তাঁকে যেন মানাত তাতেই!

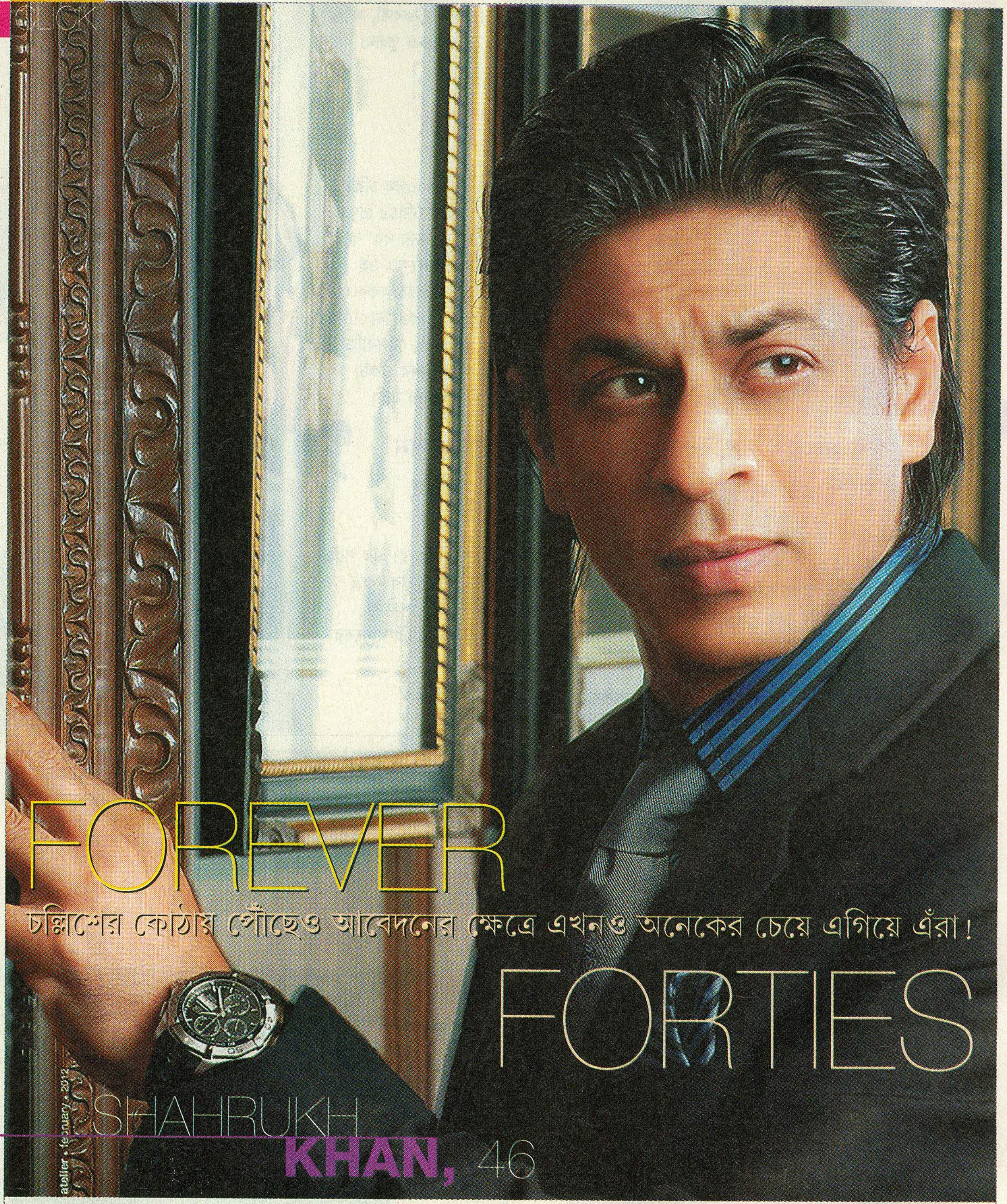


ফোটো: সোমনাথ রায়
মেকআপ: নবীন দাস
স্টাইলিং: স্যান্ডি

“অসম্ভব ভার্সেটাইল অভিনেত্রী। ‘সদমা’ থেকে শুরু করে ‘চালবাজ়’ কিংবা ‘মিঃ ইন্ডিয়া’, পর্দায় যত বার শ্রীদেবীকে দেখেছি, তত বারই অবাক হয়েছি! ছোটবেলা থেকেই অভিনয় করছেন তো, তাই ব্যাপারটা ওঁর কাছে যেন জল-ভাত ছিল!”

স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয়ের পাশাপাশি তাঁর সিজ়লিং ডান্স পারফরম্যান্স সত্যিই অতুলনীয়! তিনি যে বড্ড আগেই নিজের অভিনয়ের প্রথম ইনিংস ডিক্লেয়ার করে দিয়েছিলেন, সে বিষয়ে প্রায় একমত সকলেই। শ্রীদেবী নিজেও বোধ হয় সেকথা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই হয়তো কামব্যাক করছেন তিনি!

চাঁদনি



FOREVER FORTIES

চল্লিশের কোঠায় পৌঁছেও আবেদনের ক্ষেত্রে এখনও অনেকের চেয়ে এগিয়ে এঁরা!

SHAHRUKH KHAN, 46

40's
প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর,
কিং অফ কেকেআর,
বলিউডের 'ডন'

৪৬ বছর বয়স হল বলিউডের বাদশাহের! কিন্তু 'ক্লান্তি' শব্দটা যেন এই ভদ্রলোকের অভিধানেই নেই! ব্যস্ত শুটিং শেডিউল সামলেও দিনের পর দিন ইনি পড়ে থাকেন কেকেআর-এর সবক'টি ম্যাচে! পাশাপাশি মেয়েকে নিয়ে সাইকেল ড্রাইভে যেতে কিংবা ছেলেকে ফুটবল শেখাতেও সমান উৎসাহ তাঁর...